প্রমোদকুমার

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

শৈশবে এবং বাল্যে যাঁহার মুখে পুরাণ ও ইতিহাসের কত কথা শুনিয়া আত্মহারা হইতাম,—যাঁহার মিষ্ট বর্ণনাভঙ্গী আমার ভবিষ্যৎ জীবনে পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম সাহিত্যের পানে আকৃষ্ট করিয়াছিল—আমার স্রষ্টা জীবন-দেবতা স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে এই **অতীত স্বপন** উৎসর্গ করিলাম

এক

আজকাল, বোধ হয় দেশীয় শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ভারতের পুরাণো দিনের কথা কোন না কোন ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নন্দবংশ উচ্ছেদের পর মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা,—এদেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা লইয়া আলোচনা এখনও যেমন চলে, সেকালেও তেমনি চলিত। সেকাল অর্থাৎ মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয় কালের কথাই বলিতেছি।

তখনকার দিনে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রণদুর্ম্মদ মৌর্য্যবাহিনীর রণনৈপুণ্য ও সেনাপতিগণেব শৌর্য্যবীর্য্যের কথা,—মহারাজ চন্দ্রের পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য, রুদ্র প্রকৃতি, দুর্দ্দমনীয় রণ-উন্মাদনার কথা ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় ছিল। তারপর কেন্দ্রে রাজশক্তির কর্ণধার মহামাত্য বিষ্ণুগুপ্তের কুটিল রাজনীতি, তার সঙ্গে বিচক্ষণ কাত্যায়ন—রাক্ষসের বিষয় আলোচনাও কম হইত না। যবনরাজ সেলুকাসের পরাজয়, ভারতের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত-বিস্তার, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়, বিরাট ভাবেই তাহার ঘোষণা;—তারপর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমা হেলেন—গ্রীক রাজদুহিতার রাজধানীতে আগমন, মগধের কনিষ্ঠা রাজমহিষী হইয়া প্রজামণ্ডলী এবং বিশেষভাবে রাজ-সংসারের আনন্দবর্দ্ধন। সেই উপলক্ষে উৎসব-আনন্দের যে তুফান উঠিয়াছিল তাহার তরঙ্গ অনেক দিন ছিল। এভাবের দীর্ঘকালব্যাপী মহানন্দময়, বিপুল উৎসবের কথা প্রজা সাধারণ সহজে ভোলে না;—তার আলোচনাও কিছুদিন চলে। তারপর অষ্টম বৎসরে ক্ষত্রিয় রাজকুমারের চূড়োপনয়নের বিরাট উৎসব গিয়াছে, তার জেরও দীর্ঘদিন চলিয়াছিল। তারপর—রাজমাতা মুরাদেবীর কাত্যায়ন-যজ্ঞ

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তারও পর দীর্ঘ কাল গত হইয়াছে আরও একটা বিরাট মহোৎসব, মহারাজের পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উৎসব,—সেটাও দুই বৎসরের উপর হইল মহা সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের বারো মাসে যে তেরো পর্ব্ব, তাহাতো বৈচিত্র্যহীন, অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহও আর তেমন জোর নাই, প্রায় চারিদিকেই—দুই তিনটি প্রদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই শান্তি স্থাপিত হইযাছে,—আনন্দময় উত্তেজনা একটা বিশেষ দরকার, সবাই যেন একটা কিছু চাহিতেছে।

রাজ্যের সর্ব্বাবস্থা যাঁর করামলকবৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ছিল, আর্য্য মহামাত্য বলিযা যিনি সর্ব্বত্রই পরিচিত, সেই বিষ্ণুগুপ্ত, যাঁহার অপর নাম চাণক্য, সাধারণতঃ কৌটিল্য যাঁর বংশগত পরিচয় এবং সর্ব্বত্রই যাঁর অপ্রতিহত দৃষ্টি ;—এখন রাজধানীর প্রজা সাধারণের এই ভাব, নির্জ্জনতাপ্রিয়, মহা বিচক্ষণ এই মানুষটির লক্ষ্য এড়াইল না। অচিরেই রাজসভা হইতে এক ঘোষণা বাহির হইল, মহারাজের নগর প্রদক্ষিণের কাল আগতপ্রায়, গ্রহাচার্য্য দিন স্থির করিয়া দিলেই শুভলগ্ন ঘোষিত হইবে।

এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী কুসুমপুরের চতুর্দ্দিকেই আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে এক নব উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। স্বাধীন ভারতে রাজদর্শনের নামে যে কি বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইত এখনকার দিনে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—কল্পনাও অসম্ভব। বিশেষতঃ সেই প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানগর, মহান ঐশ্বয্যমণ্ডিত, উদার পাটলীপুত্রের কথা কি আর বলিব, সে কি একমুখে বলিবার? এত বড় শিল্পসমৃদ্ধ বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত মহানগর, ভারতের মধ্যে তো নয়ই, প্রাচ্য এসিয়া-খণ্ডের মধ্যে আর কোথাও ছিল কি না সন্দেহ।

গঙ্গা ও শোনভদ্র—, বিশাল এই দুই নদীর বিশালতম সঙ্গমের উপর তখনকার এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত এবং গঙ্গার তীরে তীরেই ইহার বিস্তৃতি প্রায় সার্দ্ধ চারি ক্রোশ।

* * * *

নগর-প্রাচীরের বাহিরে গঙ্গাতীর হইতে প্রশস্ত যে একটী রাজপথ সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই একদিকে সুরম্য উদ্যানশ্রেণী, নগর-সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর প্রসারিত দেখা যাইত। প্রত্যেক উদ্যান মধ্যে এক একখানি প্রাসাদোপম অট্টালিকা, তাহাদের কোনখানি দ্বিতল, কোনখানি

ত্রিতল। আরও দেখা যাইত, প্রত্যেক উদ্যানস্থ অট্টালিকা হইতে কিছুদূরে অবস্থিত কতকগুলি শিবির। শিবির সন্নিবিষ্ট উদ্যানের জন্যই বোধ হয় ঐ অঞ্চল শিবিরোদ্যান নামেই পরিচিত ছিল। স্নিগ্ধ শ্যামল, ক্বচিৎ গাঢ় হরিৎ আভাতেই চারিদিকে একটা মাদকতা ছড়াইয়া দিত। কিন্তু শিবিরোদ্যানের এই দিব্য, শ্যামল-মধুর দৃশ্যের পিছনে একটা বিরাট শত্রু ছিল,—তাহা ঐ অঞ্চলস্থ রাজপথের ধূলা।

চারিদিকেই ফলবান বৃক্ষ সকল, মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষবেষ্টিত শিলাসন। ঘন তৃণ-বিস্তৃত ভূমির উপর এই সকল মনোরম অট্টালিকা বাহির হইতেও সুসজ্জিত, বিশেষ সুরক্ষিত এবং প্রহরীবেষ্টিত দেখা যাইত। এ সকল কাহাদের জন্য ? পরদেশী পথিকের মনে এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক।

পররাষ্ট্রীয় দূত, মহামান্য রাজ-অতিথি, রাজ-বান্ধব, সান্ধিবিগ্রহিক অথবা উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ, প্রবাসী রাজপ্রতিনিধি অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, রাজকার্য্যে যাঁহারা রাজধানীতে আসিতেন তাঁহাদের জন্যই এই শিবিরোদ্যানস্থ প্রাসাদ-সমূহ। তখনকার দিনে এপ্রকার অতিথিগণের ঘন যাতায়াত ছিল। কাজেই, এই শিবিরোদ্যান অঞ্চলটাই সারাদিন উট, হাতি, গো, অশ্ব ও অশ্বচালিত রথ শকটাদির ঘন যাতায়াতে, চক্রের ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত এবং বায়ুমণ্ডল ধূলি-ধূমে আচ্ছন্ন থাকিত।

যাহা হউক, এখন মহাকোশলের রাজপ্রতিনিধি বীরভদ্র কৌন্দক, বিশেষ গোপনীয়, রাজকার্য্যের অনুরোধে প্রতিষ্ঠানপুর হইতে আসিয়া আজ অষ্টাহকাল এখানে একটী উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার সহচর এবং পরামর্শদাতা কোশলরাজবংশীয় এক পরম সুন্দর যুবা আসিয়াছিল ; তাহার নাম অদ্রীহরি। তখনকার দিনে, সম্ভ্রান্ত বংশীয় অধীত-শাস্ত্র, লিপিকুশল এবং যুদ্ধনিপুণ না হইলে কেহ কোন রাজা বা রাজপ্রতিনিধির পার্শ্বরক্ষক বা সহচর হইবার অধিকারী হইত না। কারণ, আজ যাহাকে রাজপ্রতিনিধির পার্শ্বে দেখা যাইতেছে, কর্ম্মদক্ষতার পরিচয়ে পরিণামে তাহাকেই হয়তো একদিন রাজা, মহারাজা এমন কি সম্রাটের পার্শ্বে অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত, মহাদায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত দেখা যাইত। তখনকার দিনে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় যুবারাই রাজানুগ্রহে প্রথমে এই সকল কর্ম্মে শিক্ষিত এবং দক্ষতা লাভ করিয়া উপযুক্ত হইলে যথাকালে রাজ্যের বিধি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা অথবা মন্ত্রিত্ব পদের অধিকারী বিবেচিত হইত।

এই অদ্রীকে দেখিতে পরম সুন্দর বলিয়াছি। বাল্যেই পিতৃহীন, সম্পর্কে সে কোশল নরপতির ভ্রাতুষ্পুত্র। মহারাজের পরম স্নেহের পাত্র এবং মল্ল বলিয়াও তাহার একটী খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনে মল্লবীর আবার লিপিকুশল—এই দুই গুণ একাধারে বিরল ছিল। এখনও আছে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে অনেক কিছু বৈষম্য দেখা যায়; প্রকৃতির রহস্য দুর্জ্জেয়। কেন এমন হয়, কি ভাবে সম্ভব হয়, এ যেন সাধারণ বুদ্ধির অগম্য; কিন্তু তাহা সত্বেও যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটিয়াও যায়, সেইরূপ অদ্রীর মধ্যেও ঘটিয়াছিল এই দুই বিপরীত গুণের অপরূপ সমাবেশ। সে ছিল একাধারে মল্লবীর এবং লিপিকুশল,—অধীত- শাস্ত্র, তীক্ষ্ণধী; এবং সেই কারণেই সে কোশল রাজ্যের মহারাজ হইতে সবারই বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহাই তাহার আত্মোন্নতির পক্ষে প্রথম সোপানের কাজ করিয়াছিল। অনেকেই তাহার ঈর্ষা করিত। এমন কি যুবরাজ বিক্রমজিৎ তাহার গুণমুগ্ধ হইলেও মনে মনে যেন একটু ঈর্ষার ভাব পোষণ করিত।

এখন এই অদ্রীহরির একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিদ্রাদেবীর এইখানেই বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামীর নাম প্রবীর বর্ম্মা। তিনি এই রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহাবল বিভাগের একজন পঞ্চ-সাহস্রী মহারথ।

রথে যাহারা যুদ্ধ করে তাহারই রথী। তখনকার দিনে রথে চড়িয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ সমধিক প্রচলিত ছিল। কোন রথে এক, কোন রথে দুইজন দুই দিকে শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ করিত। এইরূপ পাঁচশত রথ-সৈন্যের অধিপতি;—তার সঙ্গে সহস্র অশ্বারোহী, দুই শত হস্তী, তিন সহস্র পদাতি, তার মধ্যে সহস্র শূল এবং সহস্র খড়্গধারী, সব মিলিয়া পাঁচ সহস্র যোদ্ধার স্বামী,—তাঁকে চলিত কথায় পাঞ্চি, আর ভাষায় পঞ্চ-সাহস্রী বলিত। কাজেই, অদ্রীর যিনি ভগিনীপতি তিনি তো সাধারণ নন,—আর সেই জন্যই অদ্রীর এখানে সম্মানলাভও স্বাভাবিক।

যাহা হউক পাটলীপুত্রে আসিয়া সে নিজ ভগিনীর বাড়ীতে গেল না, সেথা উঠিলও না। মনে করিলে সেথা থাকিতেও পারিত কিন্তু সে তাহা করিল না। কেন ?

এই যে ক্ষত্রিয় জাতিটি, আত্মীয় কুটুম্ব স্থলে ব্যবহার সম্বন্ধে এমন উপেক্ষাপ্রবণ আত্মাভিমানী, তেমনটি আর কোন জাতি নয়। তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়গণ যথার্থই আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, বলবীর্য্যশালীই ছিল। সেইজন্য তাহাদের বীরত্বের গরিমাও ছিল বড় বেশী। কোশল রাজদূতের মন্ত্রণাদাতা সহচর হইয়া অদ্রী আসিয়াছে; নগর বাহিরে রাজ-অতিথি রূপে শিবিরোদ্যানে বাস করিতেছে, এ সংবাদ জানিয়াও ভগিনীপতি প্রবীর বর্ম্মা তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া আগে আনিতে যান নাই, এই ছিল কারণ। ক্ষত্রিয়দের আত্মসম্মান সকলের বড়; অন্য ভাই ভগিনী তো দূরের কথা, নিজের সহোদর জ্যেষ্ঠ হইলেও বড় নয়, এমন কি সময় সময় পিতৃত্ব ইহাদের আত্মসম্মানের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। একে ক্ষত্রিয়; তাহাতে অপরিণত যুবা, এই সেদিন তাহার চতুর্বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষেত্রে তাহার ভাবিয়া চিন্তিয়া, অতটা তলাইয়া দেখিবার প্রধান অন্তরায় হইল তাহার উৎকট আত্মঅভিমান। তার সঙ্গে উপেক্ষাও ছিল কিছু, নচেৎ সেথায় উপস্থিতির কথা জানিয়াও তাহার ভগিনীপতি মাননীয় প্রবীর বর্ম্মা কেন যে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া আনিতে যান নাই,—এটা নিশ্চয়ই তাহার একটু ভাবিয়া দেখিবার কথা ছিল বটে।

আসলে হইয়াছিল কি ?

কয়েক দিন পূর্ব্বে মহামাত্য আর্য্য চাণক্য, গোপনে তাঁহাকে কলহনগড়ি প্রান্ত বিদ্রোহ দমনে পাঠাইয়াছিলেন। অতি গুহ্য এ সমাচার অদ্রীর জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। শুধু অদ্রী কেন, সেতো পরদেশীয়, মহামাত্য বিষ্ণুগুপ্তের মহিমা, তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি মৌর্য্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্তেরও অগোচর ছিল। সময় সময় তিনিও তাঁহার কর্ম্মপন্থা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। বিদ্রোহের সংবাদটা অতি বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের মুখে গোপনেই আসিয়াছিল। যাহারা বিদ্রোহ বাধাইয়াছে, তাহারা হয়তো সম্পূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধও হয় নাই,—ইতিমধ্যে মহামাত্যের নিকট সংবাদটী আসিল—তৎক্ষণাৎ দমনের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ঐস্থানে বিদ্রোহীরা উঠিতে না উঠিতে মগধের সুশিক্ষিত বাহিনী যাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহের উচ্ছেদ করিয়া আসিল।

এমনই ছিল মহামাত্যের কর্ম্মপন্থা,—আরও, তাঁর মন্ত্রগুপ্তির কথা তো ভুবন-

বিদিত। মন্ত্রগুপ্তির সঙ্গে কর্ম্মকুশলতাই তাঁহাকে অজেয় করিয়াছিল। উপযুক্ত কর্ম্মী, যাহাকে তিনি নির্ব্বাচন এবং নিযুক্ত :করিলেন কেবল সেইমাত্র জানিল কর্ম্মের কথা, তাহাও সবটা নয়। কর্ম্মক্ষেত্রে, তাহার অগোচরে, তদপেক্ষা উপযুক্ত অপরজন সে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিল। অপর কেহ জানিল না, কে কোথায় কি করিতে যাইতেছে।

এই জন্যই মৌর্য্য সাম্রাজ্যে, মহামাত্যের নামে কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ থরহরি কাঁপিত। সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, সর্ব্বত্রই তাঁহার চর ঘুরিত। এমনই কুটিল ছিল তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি। শক্তি বা বলক্ষয় না করিয়া, অথবা বিপক্ষকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া, কখনও বা তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া, কৌশলে কর্ম্ম উদ্ধার কেমন করিয়া করিতে হয়, তাঁহার মত আর কেহই জানিত না। সেইজন্য রাজ্যময় তিনি কৌটীল্য নামেই তখনকার দিনে পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার নিজ প্রয়োজন ব্যতীত অর্থাৎ যাহাকে স্মরণ করিতেন সে ব্যতীত রাজ্যের অপর কেহ, এমন কি মহারাজ পর্য্যন্ত, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। তিনি লোক-চক্ষুর অগোচরেই থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার নামের প্রভাব ছিল অসীম। রাজপুরীর উদ্যানপ্রান্তে মনোহর এক অপর উদ্যান-মধ্যে, একতল কএকখানি অতি পরিচ্ছন্ন, প্রায়ান্ধকার গৃহে এবং বাহিরের চত্বরে কয়েকটি প্রহরী বা আজ্ঞাবাহী লইয়া তিনি থাকিতেন আপন আসনে। প্রয়োজন ব্যতীত আসন তিনি ছাড়িতেন না। নিশীথ রাত্রে উদ্যানে পাদচারণা করিতেন। নচেৎ, দিবারাত্র নির্ব্বিচারে আপন আসনে বসিয়া বসিয়া সারা সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ রাখিতেন এবং প্রয়োজন মত পরিচালনা করিতেন।

নানা বিভাগে নিযুক্ত সুশিক্ষিত চরেরা দিবারাত্র, প্রায় সর্ব্বক্ষণই, নানাদিক হইতে রাজ্যের সঠিক সংবাদ লইয়া আসিত। মিথ্যা সংবাদবাহী দণ্ডিত হইত।

এই যে কোশল রাজ-প্রতিনিধি অনাহূত মগধে আসিয়াছেন, এ সংবাদ তিনি জানিতেন আর তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই জানিতেন। তাঁর সঙ্গে কে বা কাহারা আসিতেছে তাহাও জানিতেন, কিজন্য তিনি আসিতেছেন তাহাও জানিতেন। অদ্রীহরি তাঁর সঙ্গে আছে তাহাও জানিতেন। প্রবীর বর্ম্মা যে অদ্রীর ভগিনী-পতি তাহাও জানিতেন। এমন কি প্রবীর বর্ম্মা তাহার সম্ভাষণে উপস্থিত না হওয়ার অভিমানবশে সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে যায় নাই, তাহাও জানিতেন। অদ্রী একজন মল্লবীর তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল না।

এমন যে অসাধারণ কৌটীল্য, বাহিরের জনসাধারণ তাঁহাকে সহজে দেখিতে পাইত না বলিয়া তাঁহার রূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনাও করিত। কেহ কেহ ভাবিত, অসাধারণ জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বটে তবে কুশ্রী, একখানা গম্ভীর মুখ যাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর, নৃশংস, কঠিন, বিকৃতভঙ্গী, অপ্রসন্ন মুখে সকল সময়ে যেন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। প্রসন্নতা বা হাসিমুখ তাঁর কেহ কখনও দেখে নাই। আনন্দের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই; কারণ, তিনি কুটিল ও দণ্ডদাতা,—ইত্যাকার ধারণাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু যথার্থই কি তিনি তাই ছিলেন? মূলেই তা নয়;—বরং তিনি অতীব প্রিয়দর্শন এবং রসিক পুরুষ ছিলেন। শুধু তাই নয়, গভীর রহস্যপ্রিয়ই ছিলেন, সাধারণে না জানিলেও যাহারা জানিত কেবল তাহারাই বুঝিত কি গভীর উদ্দেশ্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং অপূর্ব্ব গূঢ়কৌশলোদ্ভাবিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙ্গরসপ্রিয়তার পরিচয় তাহাতে থাকিত। তাহার মধ্যে কখনও নৈতিক, প্রায়ই রাজনৈতিক, ক্বচিৎ সামাজিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিত; পরে যখন প্রকাশ পাইত তখন অন্তরঙ্গ যাহারা, সবাই চমৎকৃত এবং স্তম্ভিত হইয়া যাইত। সে কাজে যাহাদের তিনি যন্ত্রবৎ ব্যবহার করিতেন, তাহারাও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিত না, কেবল একান্ত নিষ্ঠার সহিত আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াই তাহাদের কর্ম্মশেষ। এখন কোশলাগত এই অর্দ্রীহরিকে লইয়াই বোধ হয় তাঁহার একটু রঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল। তবে ইহার মধ্যে তাঁহার যে একটা প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল যাহার জন্যই এই রঙ্গের অবতারণা, এখন সে কথা উহ্য রহিল।

উচ্চপদস্থ, গূঢ় রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোন গৃহী রাজকর্ম্মচারী, রাজাজ্ঞায় রাজধানী হইতে দূরান্তরে গেলে, গৃহে যদি তাহার উপযুক্ত আপনজন না থাকে তাহার গৃহরক্ষার ভার রাজার। সেইজন্য প্রবীর বর্ম্মাকে যখন কলহনপুরে প্রেরণ করেন মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহরক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছ—অর্থাৎ গৃহেতে অভিভাবক কাহাকে রাখিয়া যাইতেছ?

প্রবীরের এক জ্ঞাতি ভাই,—সেও এখানে রাজসৈন্য বিভাগেই কাজ করিত, তাহার নাম খণ্ডী; নিজ গৃহ তত্ত্বাবধানের ভার তাহাকেই দিয়া যাইতেছে প্রবীর জানাইল। কাজেই খণ্ডী যে প্রবীর বর্ম্মার এখনকার গৃহরক্ষক এ কথাও মহামাত্যের অগোচর ছিল না। এখন তিনি একবার খণ্ডীকে স্মরণ করিলেন।

এদিকে মহারাজার শোভাযাত্রা ও নগর প্রদক্ষিণের দিন স্থির হইয়াছে। একপক্ষ পূর্ব্বে এ সংবাদ দামামা দ্বারা রাজধানীতে ঘোষিত হইল। পরদিন হইতে উপযুক্ত আয়োজনও আরম্ভ হইয়া গেল। পাটলীপুত্রের প্রান্ত এমন কি গ্রামসকল হইতে বহুতর ভদ্র ও ইতর জন নগর মধ্যে স্থান করিয়া লইতে ব্যস্ত হইল। অনেকেই কুটুম্ব-সুহৃদ স্থলে গাঢ় প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ দিবারাত্র নগরেব উৎসব আয়োজন দেখিতে ব্যস্ত রহিল।

তখনকার দিনে রথ অথবা অশ্ব-ধাবন এবং মল্লক্রীড়াব উপব অপামর সাধারণের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ ঐ খেলাটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা নিজেরাও যোগ দিতেন ঐ মল্লক্রীড়ায়।

মল্লক্রীড়া আর কিছুই নয়—কুস্তী। কোন অস্ত্র না লইয়া শরীরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোরে আক্রমণকারীকে বশীভূত করা। সেটা যখন মিত্রভাবে অনুষ্ঠিত হয় তখন তাহা ক্রীড়া আর যখন হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া শক্রভাবে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে পর্য্যবসিত হয় তখন তাহা মল্লযুদ্ধ; তাহাতে একজনের মৃত্যু অনিবার্য্য। এখন প্রত্যহ দুই একটা মল্লক্রীড়া থাকিতই, কখনও প্রাতে কখনও বৈকালে।
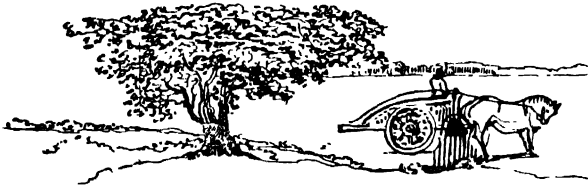
দুই

এইভাবে চারিদিন কাটিয়া গেল।

ঘোষণার পঞ্চম দিনে দুইজন প্রতিষ্ঠাবান মল্লের ক্রীড়া। সংবাদ পাইয়া অদ্রী যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হইল। সে নিজে মল্ল, মল্লক্রীড়ায় তাহার ছিল অসাধারণ আকর্ষণ, যাহা তাহার পক্ষে অতীব প্রীতিকর এবং স্বাভাবিকও বটে।

দুই জনেই প্রায় প্রৌঢ় এবং মল্লনীতিতে প্রবীণ এবং সুকৌশলী। তাহাদের ক্রীড়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এখানে হিংসা-দ্বেষ ছিল না, দুজনেই অনুকূল ও বিপরীত, অঙ্গ সঙ্কোচ ও প্রসারের সঙ্গে মার ও প্যাঁচের অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইতেছিল। চারিদিকে নগরবাসীরা মোহিত হইয়া দেখিতেছিল। অদ্রীও তদ্গত চিত্তে দেখিতেছে এবং উপভোগ করিতেছে। এমন উপভোগ বুঝি এই কয়দিনের মধ্যে একদিনও সে করে নাই।

এদিকে অনেকক্ষণ হইয়া গেল,—দুজনের দমও এবার যেন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্রী ভাবিতেছিল, এইবার শেষ করা উচিত। সেও মল্ল, কাজেই সে ঠিকই বুঝিয়াছিল। আর, যাহারা লড়িতেছিল তাহারাও যে ভালভাবেই উহা বুঝিয়াছিল তাহার পরিচয় সে তখনই পাইল যখন, একজন,—পাদচালনার অপূর্ব্ব কৌশলে অপর জনকে ভূপাতিত করিল—তারপর, ধরাশায়ী মল্লের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া অল্পক্ষণেই বিজয়ী হইয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া পড়িল,—কোন প্রকারেই আর তাহাকে নড়ানো গেল না। তারপর উভয়ে উঠিয়া গভীর আত্মীয় ভাবেই কোলাকুলি করিল। এইভাবে ক্রীড়া শেষ হইল।

দর্শকগণ সমস্বরে জয়ানন্দের রোল তুলিল ;—খেলাটি দেখিয়া তাহারা আনন্দ পাইয়াছে প্রচুর। অদ্রীও স্থির থাকিতে না পারিয়া, বোধ হয় সকলের উপর যায় এমনই উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার যৌবনদীপ্ত রূপ লাবণ্য এবং সম্ভ্রান্ত বেশভূষা, তার সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি আশেপাশে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ;—সে বুঝিল, এক্ষেত্রে এতটা ভাবোচ্ছ্বাস দেখানো তাহার ভাল হয় নাই। সে সসঙ্কোচে চলিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কএকপদ অগ্রসর হইয়াছে,—তখনই এই কয়টি কথা তাহার কাণে গেল,—

আরে! কোশলের নবীন মল্লটা এখানে এসে জয়ধ্বনিতে এমনভাবে গলা ফাটায় কেন? সেথায় বুঝি মল্ল সমাজের দৈন্যদশা উপস্থিত?

শুনিয়া অদ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা অপমানসূচক ;—অদ্রী বুঝিল, এটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই, জনসাধারণের মাঝে মনুষ্যত্বহীন প্রতিপন্ন এবং অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই অন্যায় উক্তি। এ অপমান সহ্য করা তাহার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব নয়—তবুও ক্ষেত্র বুঝিয়া যথেষ্ট সংযত ভাবেই সে বলিল,—

আপনি হয়তো ভদ্রবংশীয় এবং সভ্য নাগরিক,—পরদেশীয় ক্ষত্রিয়, মল্ল সমাজের প্রতি এমন অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন কোন্ অধিকারে ?

যে লোকটিকে একথা বলা হইল, সে যুবা বটে, মনে হয় যেন বয়সে অদ্রী অপেক্ষা কিছু বড়ই হইবে। নাতি স্থূল, বেশ দীর্ঘ শরীর, বেশভূষা তার দেখিতে অনেকটা বিদূষক শ্রেণীর, গোঁফ আর গালপাট্টাতে মিলিয়া এক কৃত্রিম ভয়ঙ্কর ভাবের অভিব্যক্তি তাহার মুখে, তবুও তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উপস্থিত ব্যবহারে তিলমাত্র ক্ষত্রিয় সম্ভ্রম যে তাহার আছে, মনে হয় না। সে ব্যক্তি অদ্রীর কথা শুনিয়া, মধুপানে উন্মত্তের ন্যায় মুখভঙ্গি করিয়া বিকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিল, ওহো,—কোশলের মল্ল ?—তারা তো ভাঙের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খায়, শুধু ভাঙেও তাদের নেশা হয় না, শুধু মদেও তাদের কিছু হয় না। এদেশীয় প্রসিদ্ধ সুরা মাগধী যাহার নাম সেই মদ,—আর মেয়ে মানুষ,—এই দুটি ম'কার ছাড়া তারা আর কি বোঝে, বা জানে, বা মানে, বা গণে ? হা, হা, হা, হা,—তাদেরই একজনের মুখে আজ এমন সুসভ্য কথা কেন।

তাহার এই কথা শুনিয়া অদ্রীর সকল রক্ত বুঝিবা মাথায় চড়িয়া গেল। তবুও সে জ্ঞান হারাইল না,—একটু সংযত হইয়া বলিল, বন্ধু! তীব্র মাগধী সুরার জন্যই এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ, অন্য স্থানে উহা উৎপন্ন হবার নয়। এতেও কি প্রমাণ হয় না যে কারা যথার্থই তীব্র সুরাপায়ী ?

লোকটা তৎক্ষণাৎ পাল্টা উত্তর দিল,—কোশলের নরনারীর জন্যই এখানে ঐ মদ উৎপন্ন হয়ে থাকে গো,—কোশলের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর ব্যতীত কুত্রাপি তার চাহিদা নেই। অবশ্য তাতে মগধের শৌণ্ডিকদের কিছু ধন আসে তা অস্বীকার করিনে।

এবার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল ; অদ্রী উহাকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। কিন্তু বিচক্ষণ অদ্রী আবার ভাবিল,—ছুঁচো মারিয়া লাভ কি,—অস্থি ও মাংসের পিণ্ডমাত্র। এর মুখটাই সর্ব্বস্ব দেখিতেছি। হয় তো উৎসব উপলক্ষে অধিক মাত্রায় মধু পান করিয়াছে—মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে

নাই। তারপরও আবার ভাবিল, এখন সে তাহার রাজ্য ছাড়িয়া পররাজ্যে আসিয়াছে—সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে, যেখানে তাহার প্রভুর প্রভুই সর্ব্বনিয়ন্তা। মনে পড়িল, গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে সে বিচারপ্রার্থী, অনাহূত প্রতিনিধির সঙ্গে তাহার সহচর হইয়া আসিয়াছে ;—মগধের রাজধানীতে আসিয়া তাহার এ চাঞ্চল্য

শোভা পায় না। তাহা ছাড়া সে আরও ভাবিয়াছিল যে,—তাহার ভগিনীপতি এখানকার পাঞ্চি এবং প্রসিদ্ধ একজন মহারথ,—সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এইসব ভাবিয়া সে নিরস্ত হইল বটে কিন্তু মুখ বুজিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, সে কেবলমাত্র এই কয়টি কথা বলিয়া ফেলিল,—আপনার এই অভদ্র আচরণ আমি ক্ষমা করিলাম, যদিও এ ক্ষেত্রে ক্ষমাটা ক্ষত্রিয় আচার বিরুদ্ধ।

শুনিবামাত্র লোকটা স্ফূর্ত্তিতে যেন আকুল হইয়া উঠিল ; তাহার সেই স্ফূর্ত্তি যথার্থ দেখিবার মত ব্যাপার একটা। গোঁফে চাড়া দিয়া ডগাটাকে পাকাইয়া পাকাইয়া তাহার প্রান্তদেশ সূচাগ্র করিয়া, একেবারে চক্ষের কোলে তুলিয়া দিল, —তারপর হর্ষোৎফুল্ল নয়নে, নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া চারিদিকে মুখ ঘুরাইয়া যেন, কে কোথায় আছ শ্রবণ করো—এইরূপ অভিনয়ের ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল,—

এই দুগ্ধপোষ্য কোশল শিশুটা আমায় ক্ষমা কোরেছে,—ও হো হো হো হো, হা হা হা, কালে কালে হল কি ? মেষ হয়ে কিনা মৃগেন্দ্রকে ক্ষমা ? অহো, এই অর্ব্বাচীন, মূর্খ, কোশল-মণ্ডুকের স্পর্দ্ধা দেখে হাস্য সম্বরণ করা দায় হল যে গো,—অনাহূত রাজপ্রতিনিধির ভৃত্য কিনা এই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাগরিককে ক্ষমা করে ! বন্ধুগণ তোমরা শ্রবণ করো, এই গণ্ডজন্মটিও শুনুক,—বরং আমিই তৃণগুচ্ছটাকে ক্ষমা করছি।

এবার অদ্রী অবাকবিস্ময়ে স্তম্ভিত, এরূপ অযথা পাগলের প্রলাপ লইয়া মন খারাপ করা চলে না। তাহার বিস্ময় কাটিবার পূর্ব্বেই ভীড় ঠেলিয়া কয়েকজন রাজপুরুষ প্রবেশ করিল এবং অদ্রীহরি ও সেই ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া বলিল, নগরে শান্তিভঙ্গের অপরাধে আপনারা উভয়েই অভিযুক্ত ; আমাদের সঙ্গে আসতে হবে,—আসুন—।

ঠিক ঐ স্থানেই সাধারণ নাগরিক বেশে দুইজন মহামাত্যের গুপ্তচর ছিল ; তাহারাও দ্রুতপদসঞ্চারে জনতার বাহিরে আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মহামাত্যের আশ্রমের পথে ছুটাইয়া দিল।

অদ্রীও বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল,—অপমানে, দুঃখে এবং মর্ম্মান্তিক ক্রোধে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। অপমানকারী ঐ স্থূলবুদ্ধি লোকটাও বেশ স্বচ্ছন্দে এবং প্রসন্নবদনে যাইতে লাগিল। পথে যুগলাশ্বযুক্ত রথ ছিল, দুই জনকে রথমধ্যে আসনে উপবেশন করিতে বলিয়া রাজপুরুষদ্বয় বাহিরে চালকের নিকট বসিল, তারপর রথ ছুটিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা এক দণ্ডের মধ্যেই মহাকাল মন্দিরের নিকট নগরপাল সকাশে উপস্থিত হইল।

একটি সুবৃহৎ উদ্যানবেষ্টিত চত্বর, দারুময় উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ তাহার চারিদিকে, উপরে উচ্চ মন্দিরের মত চূড়া, তাহার নীচে ঢালু ছাদ। স্তম্ভগুলি সর্ব্বত্রই নানাবর্ণে চিত্রিত, উপরে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ, তাহাও চিত্রিত। স্তম্ভের কোলে কোলে এবং মধ্যে মধ্যে সারি সারি আসন। এক পার্শ্বে নাতি উচ্চ মঞ্চ, তাহার

উপর বিস্তৃত আসনে নগরপাল। তখন তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল তিনি উঠিবেন, এমনই সময় অদ্রী ও অপর ব্যক্তিকে লইয়া রাজপুরুষদ্বয় প্রবেশ করিল। প্রণামান্তর নিকটে গিয়া বক্তব্য নিবেদন করিয়া তাহারা সরিয়া একদিকে দাঁড়াইল। প্রথমে, নগরপাল অদ্রীহরিকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া আপন পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন এবং অপর ব্যক্তিকেও একটি পৃথকাসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ওখানে আর বড কেহ ছিল না।

নগরপাল পৌঢ় বয়স্ক, গৌরবর্ণ, শিখা সূত্র এবং শুভ্র-পীত কষায় বস্ত্র এবং উত্তরীয় পরিহিত। উত্তরীয়খানি বক্ষ ও বামস্কন্ধে বেড়িয়া কোমরে জড়ানো এবং বাঁধা। তাহাতে যতটা অঙ্গ দেখা যাইতেছে তাহা রক্তাভ গৌরবর্ণ। হাতে বলয়, বাহুতে কবচ যাহা স্বর্বর্ণনির্ম্মিত এবং রত্নমণ্ডিত। গলায় রত্নহার।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অদ্রীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আমাদের অতি প্রিয় এবং মাননীয় অতিথি, প্রথমেই আপনার অভিযোগ শুনতে বাধ্য আছি। বলুন আমি আপনার কি করতে পারি ?

অদ্রী অন্তরে যে বিষম ক্ষুব্ধ হইয়াছিল একথা না বলিলেও চলে। রাজধানীতে আসিয়া,— এভাবে অভিযুক্ত হইয়া তাহাকে রাজদ্বারে বিচারার্থ আসিতে হইবে,—এ স্বপনেরও অগোচর। অপমানে, ক্রোধে এবং স্তব্ধ আক্রোশে ছটফট করিতেছিল। কোনরূপে তাহার প্রকৃতিগত সংযম অটুট রাখিয়া নত মুখে সে বলিল,—কাহারও বিরুদ্ধে আমার তো কোন অভিযোগ নেই ; আপনারই অধীন শান্তিরক্ষকেরা শান্তিভঙ্গের অপরাধে এখন এখানে এনেছে আমাকে।

আপনি কি শান্তি ভঙ্গের কোন উদ্যমই করেন নি ?

অসহ্য অপমানে অভিভূত হয়ে হয়ত কোরতাম, কিন্তু করিনি, সংযতই ছিলাম ; যা হবার তা যথেষ্ঠ হয়েছে এখন যদি মুক্তি দেন তো চলে যাই।

নগরপাল তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সস্নেহে অদ্রীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিলেন, ভদ্র ! আপনি মুক্ত, অভিযোগের কথা যদি মিথ্যা হয়, কেউ এর বাষ্পও জানতে পারবে না। ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনি যথেচ্ছা যেতে পারেন। কিন্তু সংযমের পুরস্কার ?

ক্ষমা করুন, রাজদ্বারে এসে আমি জন্মভূমির অপমান করেছি, পুরস্কারের কাজ করিনি।

শান্তিভঙ্গ করলে যখন দণ্ডের অধিকারী হতেন, সংযমের বলে যখন তা

এড়িয়েছেন তখন তার পুরস্কার নিতেই হবে। না হলে রাজ্যের নীতি, শান্তি রক্ষার নিয়ম ভঙ্গ হবে !

আপনার যথা অভিরুচি। বলিয়া অর্দ্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিল না বটে, কিন্তু চলিয়াও গেলনা। তখন অপর ব্যক্তির দিকে ফিরিয়া নগরপাল বলিলেন—আপনি ভদ্র রাজ-অতিথিকে অযথা হীন দোষারূপ এবং অকারণ বাক্যবাণে অপমানিত করেছেন। তিনি আপনাকে ক্ষমা করে অভিযুক্ত না করতে পারেন কিন্তু আমি নগরের শান্তিরক্ষক হয়ে ক্ষমা করতে পারব না। শুনিয়া, সে ব্যক্তি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া করজোড়ে, দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—

নিরপরাধ,—আর্য্য নগরপাল, আমি যে অপরাধী নই, এটা তো সহজ কথা।

নগরপাল বলিলেন,—শব্দগত অর্থ তো বুঝলাম এখন ব্যক্তিগত ভাবে ভবান, কিরূপ নিরপরাধ সেইটি বিশদভাবে বললেই কৃতার্থ হই। অতএব অবিলম্বেই আজ্ঞা করুন,—এদিকে সন্ধ্যা বন্দনার কাল আগতপ্রায় ;—ত্বরা করুন, হে ভদ্র !

সে ব্যক্তি জিহ্বা কাটিয়া, সাধু সাধু, ভদ্র ভদ্র, অহো, ক্ষমা করুন, আমার কোন দোষ নেই, বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিল। তারপরে বলিল, অব্যাহতি দিন আর্য্য নগরপাল !

নগরপাল তাহার দিকে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—সে দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ। তাহাতেও সে ব্যক্তি টলিল না, নিঃসঙ্কোচে বিদুষকের ভঙ্গীতে করজোড়ে কহিল,—অবধান, আর্য্য নগরপাল—বিচার করুন, আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না, আমি আবার বলি, আমি নিরপরাধ।

নগরপাল একটু কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলেন,—বটে ?—বলুন তো দেখি আপনি কি রকম নিরপরাধ ?

তেমনি ভঙ্গীতে সে বলিল, না শুনলে যদি একান্তই অব্যাহতি না দেন তবে শুনুন, হে আর্য্য !—আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম। একথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল,—পরমাশ্চর্য্য হইয়াই নগরপাল বলিলেন,—আদিষ্ট হয়েছিলেন, কে আপনাকে এমন আদেশ দিয়েছিল ?

তখন সে গম্ভীরভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল ;—আর্য্য মহামাত্য, গত পরশ্ব দিন সকালে নিভৃতে আমাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আর্যরথী প্রবীর বর্মার অতি আদরের শ্যালক মল্লবীর অর্দ্রীহরি, কোশল হতে রাজ প্রতিনিধির সহচর হয়ে রাজধানীতে এসেছেন, তিনি আমাদের মাননীয় রাজ-অতিথি।

প্রবীর বর্মার অবর্ত্তমানে তাঁকে সমাদর ও সম্মানভূষিত করবার ভার আমাদেরই। কিন্তু তার আগে একটু রসিকতার ভিতর দিয়েই তাঁর সংযমের কিঞ্চিৎ পরিচয় নিতে হবে। এখন, কিভাবে সে পরিচয়টা নিতে হবে সেটা স্থির করবার ভার আমারি ওপর ছিল। তাই আমি, ঐ ভাবেই তাঁর সংযমের পরিচয় নিতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাঁর সংযমের মধ্যেও অসংযমের পরিচয় পেয়েছি, তিনি ঠিকমত উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

নগরপাল বলিলেন,—এখন সেটুকু বিস্তারিত বলে এ নাটকাভিনয়ের শেষ যবনিকা পাত করুন।

তখন সেই বিদূষক বলিল, এ হেন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মধ্যে,—একজন সভ্য নাগরিকের মুখে এরূপ অসম্ভব কথা শুনে ইনি প্রথমে রুষ্ট হয়ে দণ্ড দিতে আসছিলেন। পররাষ্ট্র আগত, সম্ভ্রান্ত এবং মাননীয় রাজ-অতিথির প্রতি এত বড় অসঙ্গত কথা শুনেই প্রথমে উনি বুঝতে পারেননি—সভ্য নাগরিকের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব নয়; নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি মধু মত্ত, পাগল অথবা ইহার মূলে নিশ্চিৎ কোনও উদ্দেশ্য আছে।

অদ্রীর অন্তরক্ষেত্র সহজ হইল,—এইবার যেন তাহারই ক্ষমা চাহিবার পালা—এমন ভাবে সে চাহিল তাহার দিকে। তাহা দেখিয়া খণ্ডী বলিল, আমি তো আগেই ক্ষমা করেছি,—কেন, বলিনি?

সকলে এবার হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, আমি প্রবীর বর্মার জ্ঞাতি ভাই, খণ্ডী নামেই এ রাজ্যে পরিচিত। শুধু মহামাত্য নয়, আপনার দিদির অনুরোধেও বটে, আপনাকে তাঁর গৃহেই আনতে গিয়েছিলাম। অতিমাত্রায় অভিমান বশতঃ আপনি স্নেহাকুল আপন জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তত্ত্ব নিতে বিমুখ হয়েছিলেন।

নগরপাল অদ্রীর মুখের দিকে চাহিতেই সে সকল ব্যাপার বুঝিয়া করজোড়ে বলিল, আমি সত্যই অপরাধী, তাঁর সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারিনি। আমি এখনই তাঁর চরণ দর্শনে যাব। তারপর খণ্ডীর দিকে চাহিয়া বলিল, আর্য্য! আমায় ক্ষমা করুন। বোধ হয় যেন আমি আপনার বয়ঃকনিষ্ঠ।

এমন সময় এক বার্ত্তাবহ আসিয়া ভূর্জ্জপত্রে একখণ্ড আদেশলিপি নগর পালের হাতে দিল, তিনি মহামাত্যের সেই আদেশলিপি পাঠ করিলেন। তাহাতে এই ছিল,—বিচার শেষ হইলেই পুরস্কারের জন্য কোশলাগত মাননীয় এবং পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান অদ্রীহরিকে সযত্নে মৎসকাশে প্রেরণ

করিবেন—রথ পাঠাইলাম। আমাদের সাক্ষাতের পর তিনি তাঁর দিদির কাছে যাইবেন।

অদ্রী নতশিরে মহামাত্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল, এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া রথে বসিল।

মহামাত্যের সঙ্গে মিলিবে, আজ তার এই সৌভাগ্য কল্পনাতীত।

মহামাত্যের রঙ্গ এই প্রকারই ছিল।
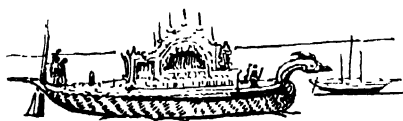
তিন

যতটা এই-সাম্রাজ্যের ততটাই আবার মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তেরও বন্ধু ছিলেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান-রাজ শত্রুজিৎ কোশল; সেই বন্ধুত্বসূত্রের কথাই এখন বলিতেছিলাম।

মগধের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইহাও জানেন যে, তন্মধ্যে কোশলই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়তন, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তি এবং সমৃদ্ধিশালী। উত্তর ভারতে প্রায় দুই শতাব্দী ছিল ইহার প্রভাব। তারপর ধীরে ধীরে মগধের অভ্যুদয়। ফলে কোশল রাজ্য এবং প্রাচীন রাজবংশ খণ্ডে খণ্ডে, উত্তরে অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তি, তারপর দক্ষিণে কৌশাম্বী, বৎস প্রতিষ্ঠান-গড়, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। দক্ষিণ কোশলের কতকটা লইয়া এই যে খণ্ড রাজ্যটি,—প্রতিষ্ঠান-গড়ই ছিল ইহার রাজধানী এবং কোশল শত্রুজিৎ ছিলেন রাজা। এখনকার প্রয়াগ অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের উপরেই যে ঝুসির কেল্লা, উহাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান-দুর্গ। ইহা বহু প্রাচীন।

এখনকার তুলনায় যেমন তখনকার ঐ প্রতিষ্ঠান-দুর্গটি প্রাচীন বলিতেছি, তখনকার দিনেও অর্থাৎ মগধের অভ্যুদয় কালেও ইহার প্রাচীনতম পরিচয় ছিল। সেকালের অধিবাসিগণ ইহাকে পুরুরবার দুর্গ বলিয়াই জানিত। ভরতবংশের পূর্ব্ব পুরুষ বিখ্যাত মহারাজ পুরুরবা, উর্ব্বশীর সহিত তাঁহার প্রেমের কাহিনী কাব্যে ও পুরাণে অমর হইয়া আছে।

মগধের নন্দবংশের শেষ ধননন্দ যখন বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতায় অবসন্ন, যখন তাঁহার রাজদণ্ড আর চলে না, মুষ্টি শিথিল, তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত এবং অবাধ্য পুত্রগণের অত্যাচারে পাটলীপুত্র জর্জ্জরিত, পরিত্রাণের জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়া একটা কিছু অঘটন আশা করিতেছিল। ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্ত পলাতক। কারাগার হইতে জননী মুরার কৌশলে বাহির হইয়া সোজা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তক্ষশীলায় উপস্থিত হইলেন। সেইখানে অবস্থান কালেই চাণক্যের সঙ্গে পরিচয়। গুণগ্রাহিতার ফলে উভয়ের মধ্যে একটি অখণ্ড বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঐখানেই। চাণক্য, সেকেন্দরের শিবিরে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিতে চন্দ্রগুপ্তকে পাঠাইয়া স্বয়ং মগধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাটলীপুত্রে আসেন। কথা ছিল,

যথাকালে চাণক্য সংবাদ পাঠাইবেন ;—উহা পাইবামাত্রই যেন চন্দ্রগুপ্ত চলিয়া আসেন।

মগধের রাজধানীতে আসিবার অল্পদিন পরেই চাণক্য রাজপুরীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ট পরিচয়সূত্রেই সেই যোগাযোগ। তখনই রাজপ্রাসাদে অবমানিত চাণক্যের শিখা উন্মোচন ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্যান্য মিত্র, তথা প্রচ্ছন্ন শক্ররাজ্যে ভ্রমণ এবং অভিশপ্ত নন্দবংশ উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিতেছিলেন ; তখনই চন্দ্রগুপ্তকে দ্রুতগতি প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ পাঠাইয়া মিলনের অপেক্ষায় রহিলেন। তারপর তিনি আসিলে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ইহা এখনকার দিনে প্রায় সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষভাবে চন্দ্রগুপ্ত যাঁহাদেব সহায়রূপে পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের এই শক্রজিৎ কোশলই প্রথম এবং প্রধান। তাই পরবর্ত্তীকালে,— মৌর্য্যরাজ মগধে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন এই শক্রজিতের রাজ্যসীমা চণ্ডালগড়ি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া, বিবিধ মহামূল্য উপঢৌকনে তাঁহাকে তুষ্ট এবং মহারাজ নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য করিলেন। তাই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বন্ধু,—ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিযাই তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছি।

এখন সেই রাজ্যে তাঁহারই একমাত্র পুত্র বিক্রমজিতের নেতৃত্বে বিষম বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে। সেই জন্য তিনি পুত্রকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রতিনিধি বীরভদ্র কৌন্দককে সম্রাট এবং মহামাত্যের গোচরে সকল ব্যাপার বিবৃত করিতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতেই রাজধানীতে পাঠাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে যুবরাজের সংশোধনের ভার মহামাত্য আর্য্য চাণক্যের উপরেই অর্পণ করিয়াছেন।

মহারাজ শক্রজিৎ এখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়, শান্তিপ্রয়াসী হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনে শেষ জীবন কাটাইবেন এবং এই সঙ্কল্পেই যুবরাজ বিক্রমজিতের উপরেই বেশী নির্ভর করিতেছিলেন, রাজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। এমন সময় এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইযা তাঁহাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়া তাঁহার সকল শান্তিই নষ্ট করিয়াছে। তিনি জানেন, যদি এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্যটুকু অবাধে গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অতি সহজেই পারেন ; কারণ, নন্দরাজগণের সময় এই ভাবেই তাঁহাদের রাজ্যবিস্তার চলিয়াছিল, একথা সবাই জানে। সত্যসত্যই সাম্রাজ্যের

বিদ্রোহী পুত্র যেখানে, পিতা মিত্র হইলেও সেখানে কোন্ সম্রাট সেই মিত্র রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ নিরাপদ মনে করিতে পারেন ?

তবে ইহার মধ্যে একটু ভরসা এই ছিল যে, আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যথার্থ ই দুর্দ্দিনের বন্ধু বলিয়া জানেন, এবং আর্য্য চাণক্য থাকিতে তাঁহার রাজ্যের প্রতি অবিচার কখনও হইতে পারিবে না। তাছাড়া মহারাজ কখনও নন্দরাজগণের মত দুর্ব্বলচিত্ত নহেন পরন্তু উচ্চমনা এবং মহাশক্তিমান। তুচ্ছ এই ব্যাপারটি তিনি কখনই গুরুতরভাবে লইবেন না। তিনি তাঁহার ঐ একমাত্র অবাধ্য পিতৃদ্রোহী, দুষ্ট পুত্রের আচবণে শুধু লজ্জিতই নয় নিজেকে নিতান্ত বিপন্নই মনে করিতেছিলেন। আরও, তাঁহার ঐ অবাধ্য পুত্রকে বশীভূত করিতে নিজ অক্ষমতা জানাইয়া তাহাকে শাসনার্থে সম্রাটের করে সমর্পণ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বার্ত্তা লইয়াই বীরভদ্র আসিয়াছেন।

এই সঙ্গে অদ্রীহরিকে পাঠাইবার কারণ, সে কুমারের বন্ধু, সমবয়স্ক সখা এবং সহপাঠী, একত্র বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত, একই গুরুর নিকট অস্ত্রশস্ত্র, মল্লক্রীড়াদি শিক্ষা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নাদি করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য হেতু অদ্রী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুণগ্রাহী ভক্ত আর কুমার মহাশত্রু হইয়া উঠিয়াছে। অদ্রী নিজগুণে কোশলরাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, সেই হেতু প্রতিষ্ঠানপুরের রাজ্যশাসন বিভাগে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত।

অদ্রীর কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াই যেন মহামাত্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন ; শত্রুজিৎ প্রতিনিধি দ্বারা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। অবশ্য অদ্রীকে পাঠাইবার অন্য কারণও আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

কি মনে করিয়া তাহা আমরা জানি না একদিন সংবাদবাহী অনুচর মারফতে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথমে প্রতিনিধিকেই সাক্ষাতের অবসর দিলেন। মহামাত্য শিবিরোদ্যানে বীরভদ্রকে জানাইলেন যে, তিনি প্রতিষ্ঠানের এই বিদ্রোহ-ঘটিত ব্যাপারটি দু'জনের মুখে পৃথকভাবেই শুনিবেন এবং প্রতিনিধি বীরভদ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রথমেই করিবেন। পরে সুবিধামত অদ্রীহরিকে আহ্বান করিবেন। ইহাতে বীরভদ্র বিশেষ ক্ষুন্ন হইল। সে অদ্রীর ভরসাতেই এই প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ সে তেমন বাক্যপটু ছিল না, কেবল সৎ এবং বিশ্বস্ততাই ছিল তাহার গুণ। কোন একটি জটিল ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিবার শক্তিও তাহার ছিল না,—সে প্রতিভা ছিল অদ্রীর, আর সেইজন্যই সে সঙ্গে আসিয়াছে। কাজেই এখন, এই অসময়ে হঠাৎ মহামাত্যের

এই বিপরীত বিধানে তাহার সুখী হইবার কথা নয়। কিন্তু অন্য উপায়ও ত ছিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া একলাই তাহাকে যাইতে হইল। তবে অত্রী তাহাকে, আগাগোড়া ব্যাপারটা যাহাতে তাহার পক্ষে অকাট্য সহজ হয় এমন ভাবেই শিখাইয়া পড়াইয়া দিল।

প্রথম দর্শনে এবং বাক্যারম্ভেই মহামাত্য মানুষটিকে বুঝিলেন। ওদিকেও তিনি গুপ্তচরমুখে আগেই অনেক সংবাদ পাইয়াছিলেন। সেইজন্য শান্তভাবে তাহাকে, তাহার মত করিয়াই সকল কিছু বলিবার অবকাশও দিলেন। যাহা হউক তিনি নিরীহ বীরভদ্রের মুখে সকল কথাই অত্যন্ত শান্তভাবে শুনিলেন বটে কিন্তু তাহার বলা শেষ হইলেও—কিছুই না বলিয়া আর্য্য কিছুক্ষণ মৌনী রহিলেন। ইত্যবসরে বীরভদ্র বেচারা, তাঁহার এই মৌনীভাবের কারণ অনুসন্ধানে ঘামিয়া উঠিল। একটু ভয় তাহার আগে হইতেই ছিল, তাহার উপর সব বৃত্তান্ত শুনিবার পরও এই ভাবের মৌন! ভীত হইয়া সে মহামাত্যের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এমন সময় মহামাত্য প্রশ্ন করিলেন,—

'কুমারকে বন্দী করতে কে পরামর্শ দিয়েছিল?' প্রতিনিধির পক্ষে এই প্রশ্নটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে, শুনিবামাত্রই অর্থবোধ হইতে কিছুক্ষণ গেল। চাণক্য বীরভদ্রের বিষণ্ণ ভাবটা মুখ দেখিয়া সহজেই বুঝিলেন, তখন আবার বলিলেন, 'উত্তেজিত অবস্থায় মহারাজ নিজেই এই আদেশ দিয়েছিলেন, না মন্ত্রী অথবা কোন অমাত্যের সঙ্গে পরামর্শ করে এটা করেছিলন,—তাই জিজ্ঞাসা করচি।'

বীরভদ্র ইহাতেও মহামাত্যের মনোগত ভাবের তল পাইল না, তবে

সত্যটা বলিয়া ফেলিল, যদিও তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইল না। সে বলিল, 'তখন সেখানে অদ্রী ছিল, সেই বলতে পারে, সে সময় আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না।' তখন প্রশ্ন হইল,—'কোথায় ছিলেন?' প্রতিনিধি বলিল, 'পলাশরেণুতে, যেখানে বিদ্রোহীদল আড্ডা করিয়াছিল, সেইখানেই মহারাজ পাঠিয়েছিলেন।' শুনিয়া মহামাত্য একটু আরও নাড়া দিলেন,—যেন বিস্মিত হইয়া পুনরায় বলিলেন, 'আপনি ওখানে থাকলে মহারাজকে কি পরামর্শ দিতেন?'

প্রতিনিধি প্রমাদ গণিল, তথাপি বলিল, 'বন্দী না করেও উপায় ছিল না। তখন তাঁকে ছেড়ে রাখলে অনেক বেশী বিপদের সম্ভাবনা ছিল।' শুনিয়া সহাস্যে মহামাত্য আবার বলিলেন, 'কেন, কুমারের কি উন্মাদ সম্ভাবনা ছিল নাকি? বলুন ত শুনি, কি রকম বিপদ সম্ভাবনা?'

এবার কৌন্দক একটু ভাবিয়া বলিল, 'বিদ্রোহীদের কেউ কেউ বলেছে যে, কুমার গোপনে পিতৃহত্যা করে সিংহাসন লাভ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।' মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুপ্তভাবে হত্যা? তা এতদিন করেননি কেন? সে সুযোগ তো বহুদিন হতেই ছিল তাঁর।'

এই কথায় প্রতিনিধি বীরভদ্র শিহরিয়া উঠিল;—তথাপি বলিয়া ফেলিল, 'মগধ সম্রাটের বন্ধুত্বের অধিকারী ব'লেই বোধ হয় সাহস করেননি।' শুনিয়া আবার ঈষৎ হাসিয়া মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাই যদি কারণ হয় তাহলে কস্মিনকালেও রাজকুমারের গোপনে পিতৃহত্যার সম্ভাবনা আছে বলে কি মনে হয়?'

আবার বীরভদ্র ঘামিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং এবার তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কুমারের কোন পরামর্শদাতা বা অন্তরঙ্গ বন্ধু, আশ্রিত, বা বিশেষ অনুগত কোন ব্যক্তির কথা আপনাদের জানা আছে কি?'

'আমি জানি না, অদ্রী বোধ হয় জানে।'

শেষে মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'কুমার কখনও কুসুমপুরে এসেছিলেন কিনা তা আপনার জানা আছে কি?'—প্রতিনিধি বলিল, 'আমার বোধ হয়, তিনি কখনও প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাননি। পূর্ব্বে মহারাজ তাঁকে অনেকবার রাজধানীতে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি রাজি হননি।'

মহামাত্য, শেষে এই কথাটি প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুমারকে বন্দী

করে মহারাজ একটা বড় ভুল করেছেন। সেখানে কি মহারাজকে সৎপরামর্শ দেবার কেউ ছিল না?'

বীরভদ্র বলিল,—'একমাত্র ধূর্জ্জটি মিত্র ছিলেন। তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সেনাপতি।'

বিদায় পাইয়া এখন বীরভদ্র নিঃশ্বাস ছাড়িল।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে একজন বিশ্বস্ত সেনানায়কের অধীনে, অগ্রে কয়েকটি অশ্বারোহী, পশ্চাতে একশত ধনুর্দ্ধারী পদাতিক সৈন্যের ক্ষুদ্র এক বাহিনী রাজধানী হইতে মহামাত্যের আদেশক্রমে, পশ্চিমের পথে যাত্রা করিল। তাহারা চণ্ডালগড়ি যাইবে। আধুনিক চুনারই সেকালের চণ্ডালগড়ি, যাহা শত্রুজিতের রাজ্যপ্রান্তে অবস্থিত।

কোশল শত্রুজিতের প্রতিনিধি বীরভদ্র কৌন্দকের সহিত আর্য্য মহামাত্যের সাক্ষাতের চার দিন পরে অদ্রীহরি এবং খণ্ডিবর্ম্মা ঘটিত ব্যাপারের কথা। তার মধ্যে মহামাত্যের নাটকীয় রঙ্গরসের অবতারণা এবং পরিশেষে পুরস্কারের জন্য অদ্রীকে আহ্বান পর্য্যন্ত হইয়া আছে। এখন অদ্রীকে গ্রহণ করিবার জন্য মহামাত্য প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

তিনটি প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ মহামাত্যের গৃহখানি। অন্তঃপুর তোরণপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান মধ্যে চারিদিকেই বড বড় গাছে ঢাকা, গরমের দিনে ঘন পল্লবিত তরুচ্ছায়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন থাকায় উহা অপেক্ষাকৃত শীতল। গৃহ-ভিত্তি উচ্চ বলিয়া পথ হইতে কয়েকটি ধাপ বাহিয়া উঠিতে হয়। সম্মুখেই প্রশস্ত চত্তর, অন্তে দারুময় স্তম্ভশ্রেণী। তারপর তিনখানি কক্ষ—প্রথমখানিতে মঞ্চোপরি কোমলাসন বিস্তৃত; সেখানি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী প্রধান ব্যক্তিগণ, দূত, গুপ্তচর প্রভৃতির জন্য। মাঝের ঘরখানিতেই তাঁহার আসন। সারাদিন তিনি এই কক্ষে থাকিয়া সকল কর্ম্মই করিতেন। তৃতীয়খানি তাঁহার শয়ন কক্ষ; তদ্ব্যতিত সন্ধ্যাবন্দনাদি ঐ ঘরের পরেই একাংশে, পৃথগাসনে সম্পন্ন করিতেন। ঐ ঘরখানির পশ্চাতে বারান্দায় হোম-কুণ্ডটি বেদীর উপর অবস্থিত। নিত্য হোমাদির যাহা কিছু দ্রব্য তাহা ঐ ঘরখানির একাংশে সুশৃঙ্খলায় রাখা আছে।

ঐ গৃহের সম্মুখেই প্রশস্ত পথে এখন অদ্রী রথ হইতে নামিল। প্রহরী

তাহাকে প্রথম কক্ষের দ্বারে পৌছাইয়া দিল। মহামাত্য এখন তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সেই গুরুতর বিদ্রোহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবং কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ অদ্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের উপরেই নির্ভর করিতেছে। চিন্তিত অদ্রী আসিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

মাঝের ঘর প্রায়ান্ধকার, আঁধার-আলোয় মেশামিশি, তাহার উপর প্রায় অপরাহ্ণ বেলা, বাহিরের আলো হইতে আসিয়া সে কতকটা অস্পষ্ট ভাবেই দেখিল,—মধ্যে প্রশস্ত একখানি মঞ্চ বা চৌকীর উপর কোমল আসন। তাহা পরিপাটি, তখনকার ব্যবহারপ্রথামত দেয়ালে সংযুক্ত পৃষ্ঠরক্ষা। তখনকার দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বসিবার আসন এই ভাবেরই হইত। বহু লোকের সমাগম, সভা প্রভৃতি স্থানেও ঐ প্রকার মঞ্চের উপর আসন, তবে তাহার রচনা সারিবন্দী হইত। এখন মহামাত্যের আসনের সকল আস্তরণের উপর দীর্ঘ মৃগচর্ম্মাসনে এক অপরূপ প্রৌঢ় সৌম্য পাষাণ মূর্ত্তির মতই স্থির উপবিষ্ট। অল্পক্ষণেই তাহার দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া আসিলে সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সত্যই বিস্ময়াধিক্যে সে প্রাথমিক শিষ্টাচার, এমন কি যোড়করে নতি জ্ঞাপনটাও ভুলিয়া গেল। সে ভুলিলেও যাঁহার কাছে সে আসিয়াছে, তিনি ভুলিলেন না। সহজ স্বাভাবিক গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—স্বাগতম, বৎস! উপবিষ্ট হও। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ আসনের দিকে নির্দ্দেশ করিলেন। অদ্রীর চৈতন্য হইল। এখন ক্ষিপ্র পদে নিকটে গিয়া নতজানু উপবিষ্ট হইয়া প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলে মহামাত্য, সস্নেহে সেই হাতখানি সবলে ধরিয়া নিজ পার্শ্বস্থ আসনে বসাইয়া দিলেন। প্রৌঢ় হইলেও অদ্রী বুঝিল আর্য্য চাণক্য দুর্ব্বল নহেন।

এতদিন যে আর্য্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের নামটি সে শুনিয়াই আসিয়াছে, ঐ নামটির সঙ্গে তাঁহার কুটিল কর্ম্মপদ্ধতির কথা, যাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপরে এই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত; যাঁহার কথা তখনকার দিনে সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণের আলোচনার বিষয় ছিল, এই সেই মহাত্মা, তাহার সম্মুখেই বর্ত্তমান। রাজদর্শন অপেক্ষাও দুর্লভ যাঁহার দর্শন, সেই কারণে কত কুশ্রী ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জনসাধারণ কল্পনা করিয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে সেও করিয়াছে, এখন নিজ চক্ষের সম্মুখেই এই অপরূপ সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া এবং সৌভাগ্যের ফলেই সে এই কাজে প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে মহাবীরকে প্রণাম করিল। এখন মহামাত্যের ব্যক্তিগত

প্রভাব অনুভব করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। ফলে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে, এক পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল, ভাবাতিশয্যে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।
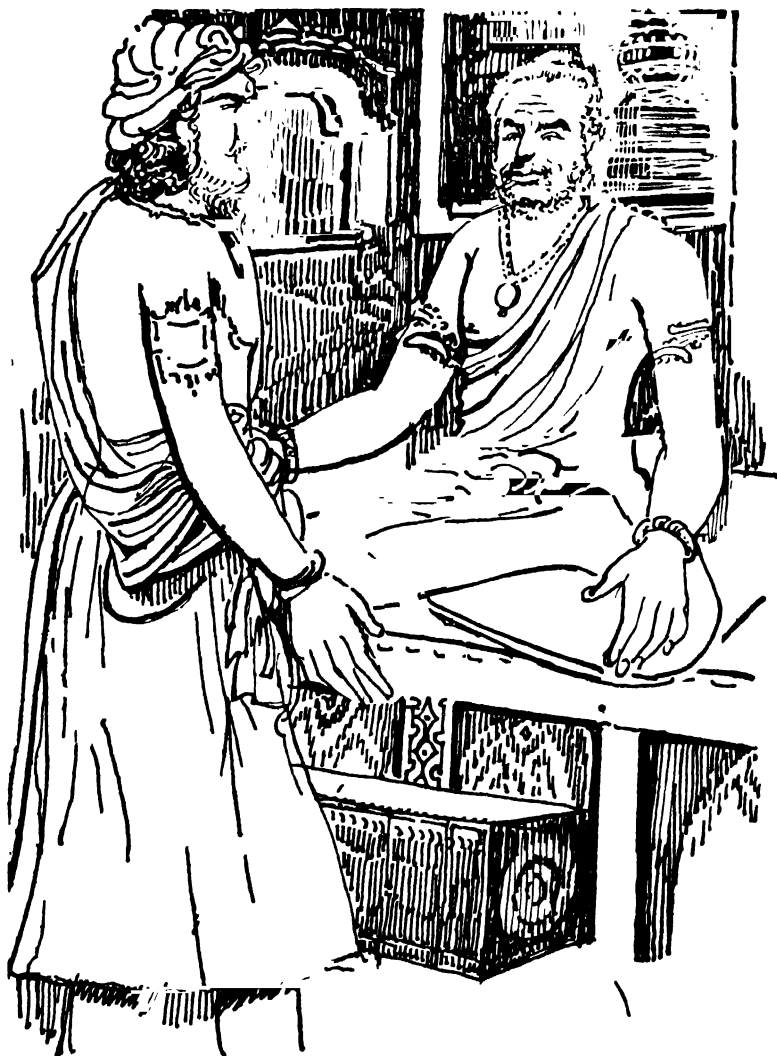
দৈর্ঘ্যে তাঁহার শরীর বিশাল, তাঁহাকে অতিদীর্ঘ বলা যায়। তাঁহার তুলনায় বরং অন্দ্রী মধ্যমাকৃতি। ক্ষীণ নয় তাঁহার দেহায়তন, তা বলিয়া স্থূলও নয়। রক্তাভ

গৌরবর্ণ শরীর, কেবল মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তবর্ণ, যেমন শ্রমজীবী একজনের হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, আঁধার ঘর যেন আলো করিয়াই বসিয়া আছেন। বামস্কন্ধ বেড়িয়া বক্ষ হইতে ত্রিরাবৃত মৃগচর্ম্ম উপবীত কটিদেশস্থ কোমরবন্ধে সংযুক্ত। অতীব প্রশস্ত, যাহাকে কপাট বক্ষ বলে তাহাই, তাহাতে একগাছি স্ফটিকের মালা, কণ্ঠে রত্নহার, তাহার নীচে সুবর্ণ জড়িত বৃহৎ একখণ্ড মাণিক্য ঝুলিতেছে। চন্দনলিপ্ত বক্ষ নগ্ন এবং উদার। প্রকাণ্ড সুগোল মস্তকে কাঁচাপাকা মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুল পশ্চাদ্দিকে দৃঢ় বদ্ধ এক গুচ্ছ বৃহৎ শিখা। পরণে ক্ষৌম্য বস্ত্র, উত্তরীয় খানি কাঁধে নাই, এখন গায়েও নাই, কোমরে জড়ানও নাই, দেয়ালে গজকাষ্ঠে ঝোলানো আছে। খড়্গ-নাসা যাহাকে বলে, ক্ষীণ ওষ্ঠ কিন্তু অধর বান্দুলী ফুলের পাপড়ির মতই স্থূল।

প্রশস্ত ললাটে সর্ব্বত্রই ঘন চন্দন লিপ্ত, মধ্যে রক্ত চন্দনের বেশ দীর্ঘ একটি ফোঁটা, উহা কেশমূল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাঁহার এখনকার এই প্রশান্ত মুখমণ্ডলের সর্ব্বোত্তম আকর্ষণ, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নিম্নে উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু দুইটি। উহা প্রকাণ্ড নয়, বিশালায়তও নয়; পরিমিত সেই অপূর্ব্ব পূর্ণ-তেজোদীপ্ত নয়ন-যুগলের বৈশিষ্ট্য ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। প্রশান্ত গভীর এবং ঈষৎ রক্তাভ, স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যপূর্ণ সেই চক্ষের মহিমা এমনই যে, তাহার পানে চাহিলেই দ্রষ্টার চক্ষু শ্রদ্ধায় স্বতঃই নত হইয়া আসে। দুই কানে রত্ন-কুণ্ডল ঝুলিতেছে। আশ্চর্য্য অদ্রী দেখিল, পূর্ব্বাপর দৃষ্ট এবং কল্পিত সকল মূর্ত্তির সহিত সম্বন্ধহীন এই যে সম্মুখে উপবিষ্ট তেজপূর্ণ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি, ইহার মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ত দূরের কথা বরং তাহার বিপরীত, ঐ চক্ষু করুণায় ভরা।

অবশ্য বর্ত্তমানে তাহার নব-জাগ্রত শ্রদ্ধায় উদ্বোধিত বুদ্ধিতে অদ্রী বুঝিল যে, এই মূর্ত্তি মহামাত্যের সর্ব্বকালীন ভাবময় মূর্ত্তি নয়, ইহার একটা ভয়ঙ্কর দিকও আছে, যাহার প্রভাব সময় সময় সাম্রাজ্যের সকলকেই সন্ত্রস্ত করে; এমন কি স্বয়ং সম্রাটেরও নিষ্কৃতি নাই। যদিও এই চাণক্য সম্বন্ধে অদ্রীর মনের গভীর স্তরে একটা ভয়ের ভাব অথবা ভয়মিশ্রিত একটি প্রবল বিস্ময়ের ভাব ছিল তথাপি এখনকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই ধারণাই প্রবল হইল যে ইনি সাধারণ, এ ব্যক্তির মাহাত্ম্যের পরিমাণ বা সীমা নির্দ্ধারণ তাহার মত একজনের সাধ্যাতীত। একবার তাহার মনে হইল, যেন মহা-বিচক্ষণতা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে, আবার পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ইহার দ্বারা কস্মিনকালে কাহারও অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি কখনও কাহারও অনিষ্টকামী হয় তাহার কোন প্রকারেই পরিত্রাণ নাই।

চাণক্যের কুশ্রী, কৃষ্টবর্ণ, রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির কথা,—তাঁহার তিরোভাবের পর, তাঁহার উপর বিদ্বিষ্ট শত্রুপক্ষের রটনা। আবার পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মদ্বেষী বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ, একশ্রেণীর কবি ও পুরাণকার বিপরীত ঐ সকল রটনা হইতেই তাঁহার মূর্ত্তি ও চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পরে আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা ঐ ধারাই অবলম্বন করিয়া চাণক্যের মূর্ত্তি গড়িয়া চলিয়াছেন। এইভাবে আমাদের দেশের ইতিহাসের মধ্যে অনেক সত্য চাপা পড়িয়াছে।

মগধের নন্দবংশের রাজ্যকাল হইতেই ওখানকার ব্রাহ্মণ সমাজ আর সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না। নানা কারণেই উহা ঘটিয়াছিল; সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের ফলেই মগধের রাজবংশে ব্রাহ্মণ প্রভাব ছিল না, ইহা তখনকার ইতিহাসসম্মত বিষয়। তক্ষশীলা হইতে আসিয়া মগধে আর্য্য চণক্যের প্রতিপত্তি লাভ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল হইয়াছিল, এই জন্যই চাণক্যের প্রতি কাত্যায়নের প্রবল বিরক্তি এবং গান্ধারবাসী বলিয়াই নন্দরাজপুরীতে যজ্ঞসভায় তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার অধিনায়কত্বে নন্দবংশের উচ্ছেদ, ওখানকার ব্রাহ্মণ সমাজের একটা ভয়ানক বিদ্বেষের কারণ রূপেই বর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের সময়েও ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজসভায় প্রতিপত্তি অথবা রাজানুগ্রহ আকর্ষণের উপায়স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল না, যাহা নন্দবংশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের কালে বলবান ছিল।

মৌর্য্যরাজ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছিল মাত্র তিনটি কারণে। প্রথম ও

প্রধান কারণ চন্দ্রগুপ্ত স্বভাবতঃ দুর্দ্ধর্ষ, রণপ্রিয়, কঠোর নিয়মনিষ্ঠ শৌর্য্যবীর্য্যবান এবং মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন ; এমনটি তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে বহুকাল উত্তর ভারতে পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় কারণ, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ন্যায়ধর্ম্মনিষ্ঠ, অতীব তেজস্বী মহামাত্য,—চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের মন্ত্রণা, বৃহস্পতিতুল্য তাঁহার প্রভাব সবাই স্বীকার করিত। লোকচক্ষুর অগোচরেই তিনি অবস্থান ও জীবনযাপন করিতেন। তৃতীয় কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তখন বেশ ছিল তথাপি মহারাজ অথবা মহামাত্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই ;—অথচ বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যদের স্বাধীন বিচরণ এবং প্রচারের প্রচেষ্টায় কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। তাঁহার নিজ ধর্ম্মমতও কখনও প্রচার করেন নাই! এ পর্য্যন্ত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অথবা মহামাত্য আর্য্য চাণক্যের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত কখনও কাহারও জ্ঞানগোচর হয় নাই।

* * * *

প্রায় চারি দণ্ডকাল অদ্রী মহামাত্যের নিকটে ছিল। যে সকল কথা হইল তাহা এখনই বলা হইল না। তাহাতে ক্ষোভের কারণ নাই ; কারণ, এখন হইতে অদ্রীর সকল কর্ম্মেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কথা প্রসঙ্গে অদ্রী আজ অনেক কিছুই বুঝিল। কুমার বিক্রম সম্বন্ধে মহামাত্যের অভিপ্রায়, অবস্থানুসারে কর্ম্মসিদ্ধির কৌশলপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনা শক্তি, তারপর প্রত্যেক বিষয়ে কত গভীর তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথা। এই বিদ্রোহ ব্যাপারকে মূল করিয়া প্রতিষ্ঠান রাজ্যের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি—এই সকল লইয়া তাঁহার যে মন্তব্য, তাহা শুনিয়া সে বুঝিল, তাহাদের ব্যবহারপরম্পরা ইনি যাহা জানেন তাহাদের নিকটতম আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও এতটা জানে কিনা সন্দেহ। এতটা দূরে থাকিয়াও কেমন করিয়া এত সংবাদ ইনি রাখিতে পারেন? তাঁহার অসাধ্য কাজ নাই।

পরিশেষে অদ্রী মুগ্ধ হইল তাঁহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে। সর্ব্ববিষয়েই, সে দেখিল ঠিক যেন তিনিই তাহার উপদেশ এবং সাহায্যপ্রার্থী। এরূপ ব্যবহার সে ইহার আগে কখনও কোথাও, তাহার পরিচিত কাহারও কাছে পায় নাই। এটা যে মহামাত্যের কৌশলে কর্ম্ম উদ্ধারের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, সরল, গুণমুগ্ধ অদ্রী তাহা না বুঝিয়া, মহামাত্যের মহৎ আন্তরিকতার নিদর্শন বলিয়াই বুঝিল। তারপর আবার,—নিতান্তই কঠিন সমস্যাগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সমাধান কত সহজ ও অবস্থানুকূল হইতে পারে, তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয়ে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই মিলনকে অদ্রী তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষণ বলিয়াই মনে করিল। শেষে যখন বিদায় লইবার জন্য দাঁড়াইয়া উষ্ণীষ বাঁধিবার পূর্ব্বে মহামাত্য তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, সে মুগ্ধ হইল। শেষে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদান্তে বলিলেন,

'—যাও বৎস! কার্য্যোদ্ধার করে ফিরে এস। মনে রেখ, সম্রাটের নগর প্রদক্ষিণের যতটা আগে ফিরে আসতে পারবে আমাদের কাজ ততই সহজ হবে।

আর্য্য চাণক্যের গুণমুগ্ধ ভক্ত অদ্রী, এখন হইতে এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ এবং এক অভিনব কর্ম্মপ্রেরণা লইয়াই ফিরিয়া গেল।

চার

রথ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল; অতি অল্পক্ষণেই তাহাকে শিবিরোদ্যানে পৌঁছাইয়া দিল। আজ তাহার বড় সুখ, অদূর ভবিষ্যতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট, উচ্চপদস্থ একজন হইতে চলিয়াছে সে। প্রথমেই সে বীরভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। বীরভদ্র যখন নিজ কর্ত্তব্য লইয়া মহামাত্যের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া অদ্রীর নিকট তাহাকে বড় ভয়ঙ্কর, কূটনৈতিক বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিল। অদ্রীও তাহাতে একটু বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেভাব সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, তাহা বীরভদ্রের একেবারেই বিপরীত। কাজেই এখন অদ্রীর মধ্যে এতটা উত্তেজনা, এতটা কর্ম্মোৎসাহ, মহামাত্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ফলেই ঘটিযাছে দেখিয়া প্রতিনিধি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অথচ অদ্রী তাহাকে খুলিযা কিছু বলিল না। সে এখন মন্ত্রগুপ্তির মহিমা বুঝিয়াছে। তাই, কেবলমাত্র এইটুকু জানাইল যে, এখনই একটি বিশেষ কর্ম্মে সে কুসুমপুর ত্যাগ করিতেছে। অবশ্য সে যে মহামাত্যেরই নির্দ্দেশ মত যাইতেছে, একথাটি বুঝা গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার সম্ভাবনাও জানাইল। শেষে, যতদিন না আমি ফিরিয়া আসি আপনি কখনও রাজধানী ত্যাগ করিবেন না—প্রতিনিধিকে এই কথা কয়টি বলিযা সে প্রস্তুত হইতে আপন কক্ষে গেল।

তাহার নিজ ভৃত্য শেখর, তাহাকে বর্ম্মচর্ম্ম কবচাদি পরাইতেছে, ইতিমধ্যে অদ্রীর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ চলিতেছে। এখন কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে শেখর বলিল, 'ভাল, আমার প্রভুর অবর্ত্তমানে এখানে থাকতেই যদি হয়, ত কি করব বলে দিন?'

অদ্রী বলিল, 'কর্ত্তব্য তোমার তো এমন কিছু নয় তুমি মজা করে নগরের উৎসব আয়োজন দেখে বেড়াও। কিন্তু দেখো, যেন কোথাও শান্তিভঙ্গের অপরাধ করে বোসো না, তাহলে নগরপালের কাছে নিয়ে যাবে, সাবধান! এখানে ঐ এক নূতন বিধি, আমাদের প্রতিষ্ঠানে এর নাম গন্ধও নেই।' শুনিয়া শেখর মুখে হাসি চাপিয়া বলিল, 'আমি ত আমার প্রভুর মত মল্ল উৎসাহী নই; কারণ, নিজে তাঁর মত একজন মল্ল নই।'

বাধা দিয়া অদ্রী বলিল, 'কি বলছ তুমি শেখর?'

শেখর মুখ নীচু করিয়া, বিনীত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,—'তা, যা বলেছি ভালমতে জেনে, ভাল বুঝেই বলেছি।' তারপর বিস্মিত অদ্রীর কাছে, আজ বৈকালের সকল খবর, সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে খণ্ডীবর্ম্মার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হইতে সুরু করিয়া নগরপালের কাছে, তারপর সেখান হইতে মহামাত্যের কাছে যাওয়া, সকল কথা বলিয়া শেষে বলিল, 'সর্ব্বক্ষণই আমি প্রভুর কাছে কাছেই ছিলাম।' শুনিয়া অবাক্ অদ্রী পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি জন্য তুমি এই বৃথা কাজে ঘুরে মরলে, বলত ?'

শেখর বলিল, 'যদি প্রভুর প্রয়োজন হ'ত তা'লে ত বৃথা ঘুরে মরা হ'ত না। এখন আজ্ঞা করুন।' অদ্রী বলিল, 'কি আবার আজ্ঞা করব ?' শেখর হাত জোড় করিয়া ধীরে ধীরে নিম্ন স্বরে বলিল, 'আমায় প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে নিয়ে চলুন না!'

শুনিয়া অদ্রী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি, এ খবর পেলে কি ক'রে, এ কথা আর ত কেউ জানে না, আমি প্রতিনিধিকেও ত বলিনি ?'

শেখর বলিল, 'ওটা আমার অনুমান মাত্র। প্রথম, এখনই যাত্রা, তারপর সঙ্গে যখন কেউ থাকবে না, শরীররক্ষকও নয়, কেউ নয়। আবার দেখি দরজায় সেনা নিবাসের প্রকাণ্ড এক আরব ঘোড়া বাঁধা, বহুদূর যাবার এই সব লক্ষণ দেখলাম। তারপর এক সপ্তাহেই ফিরতে হবে যখন শুনলাম তখন হিসেব করে দেখলাম ওখানে ছাড়া আর কোথায় যাওয়া সম্ভব ?' অতীব বিস্মিত ও পুলকিত অদ্রী বলিল, 'চুপ, চুপ শেখর, তুমি একটি রত্ন। আমি ফিরে এসে

পুরস্কৃত করব, তুমি এখানেই থাক, শেখর! তাতে আমার উপকার হবে। আমার কথা শোন। আমি বেরিয়ে গেলে প্রবীর বর্ম্মার বাড়ী গিয়ে আমার দিদিকে বলে আসবে, এক সপ্তাহ পরে ফিরে এসে তাঁর চরণ দর্শন করব।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অদ্রী কুসুমপুর প্রান্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বেগবান আরবটি তাহার বড়ই মনোমত হইয়াছিল, মহানন্দে সে উড়িয়া চলিল।

—জ্যোৎস্নারাত্রি, মনের ভিতরে চিন্তাধারাও গতি পাইয়াছিল, তাহার কর্ত্তব্য সে কেমন করিয়া সম্পাদন করিবে, তাহাই মনের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে করিতে চলিল।

এদিকে হইল কি, অদ্রী কুসুমপুরের সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই মহামাত্যের উদ্যান আশ্রম হইতে আজ্ঞাবাহী এক অশ্বারোহী অনুচরও নিষ্ক্রান্ত হইল। উপযুক্ত ব্যবধানে সে অদ্রীর অগোচরে তাহার পশ্চাদনুশরণ করিয়া চণ্ডালগড়ি পর্য্যন্ত যাইবে, সেখানে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত মহামাত্য প্রেরিত ধনুর্দ্ধারী সেনা লইয়া মৌর্য্য-সেনাপতি জঙ্গলমধ্যে দুর্গা মন্দিরের আশে পাশে অবস্থান করিতেছিল, সেইখানেই তাহার বার্ত্তা পৌছাইয়া দিবে। এই ছিল তাহার নিয়োগ।

প্রায় ক্রোশ খানেক ব্যবধানে উভয়েই চলিতে লাগিল। অদ্রী ইহার কিছুই জানিল না।

পাঁচ

তখনকার দিনে পাটলীপুত্র রাজধানী হইতে কেমন করিয়া অতবড় সাম্রাজ্য শাসনের কাজ চলিত? খবরাখবরের কাজই বা চলিত কি প্রকারে? প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা,—এই কৌতূহল এখনকার দিনে খুবই স্বাভাবিক।

সেটা হিন্দু-সভ্যতার উৎকর্ষের যুগ আর চিরকালই হিন্দু-সভ্যতা সরল প্রাকৃতিক নিয়মানুগ, সর্ব্বব্যাপারেই সহজ ব্যবস্থার পক্ষপাতি, তাহা জটিলতা-বর্জ্জিত। তখনকার দিনে প্রায় সকল সভ্য দেশেই নিয়ম এবং ব্যবস্থা অবশ্য সহজই ছিল তবে এই ভারতের সঙ্গে অপর সভ্য দেশের পার্থক্য এই ছিল যে, নীতিধর্ম্মকে মূল করিয়াই এ দেশের সকল বিভাগেরই সকল ব্যবস্থা। তখনকার দিনে রাজনীতি রাজধর্ম্ম নামে অভিহিত ছিল। যাহা হউক তখনকার সহজ ব্যবস্থা কি রকম ছিল তাহাই এখন আমাদের কথা।

পাটলীপুত্র কেন্দ্র হইতে সকল প্রদেশে যাইবার, এমন কি তক্ষশীলা প্রান্ত, তাহা ছাড়া গান্ধার—এখনকার আফগানিস্থান পর্য্যন্ত,—আরও পশ্চিমোত্তরে বাহ্লিক দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত রাজপথসমূহ ছিল। সেই রাজপথ হইতে আবার প্রত্যেক প্রদেশের নগর এবং গ্রামসমূহে যাইবার সরল পথ বর্তমান ছিল। দুই ক্রোশ অন্তর পান্থশালা ছিল। সেই সকল প্রশস্ত রাজপথে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, হাতি-ঘোড়া রথাদি লইয়া যানবাহন প্রভৃতি এবং বাণিজ্য দ্রব্যাদির সহিত সকল প্রকার পথিক, বণিক এবং প্রজাসাধারণ যাতায়াত করিত। আবার নদীপথেও নৌকার ব্যবহার তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রবল ছিল আবাব সমুদ্রগামী নৌকা ও জাহাজ সকল কত প্রকারেরই না ছিল; তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট দেশীয় কারুগণ নৌ-গঠনে যে অসাধারণ শিল্প-কৌশল এবং দক্ষতা দেখাইত, এখন তাহার কল্পনাও কঠিন; কারণ, তাহার শতাংশের একাংশও বর্ত্তমানে নাই। মালবাহী নৌকা এবং দ্রুতগামী যাত্রী নৌকাও যে কত প্রকারের হইত, তাহার হিসাব বা কোন চিহ্নও এখন নাই! যেখানে জলপথে প্রয়োজন সেথায় দ্রুতগামী নৌকায় দেশীয় বাণিজ্যসম্ভার এবং রাজকীয় ভাণ্ডারের সকল দ্রব্য এবং সংবাদাদির আদান-প্রদানও চলিত। নৌকা যে কত দ্রুতগামী হইতে পারিত তাহার অনুমানও এখন প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়!

স্থলপথে অশ্বই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন। তাহার উপযোগিতার কথা এখনকার দিনে অনুমান একেবারেই দুঃসাধ্য নয়। রেলপথ আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই অশ্বের ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল। দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য কেন্দ্রে ধাবক বিভাগ ছিল। বহু সংখ্যক মহামূল্য, উৎকৃষ্ট ও দ্রুতগামী অশ্ব, আরব, ইরাণ, বাহ্লিক, তুর্ক, গান্ধার, গুর্জ্জর, সিন্ধু দেশীয় ও বিদেশীয় অশ্ব সকল সেনাবিভাগের জন্যও যেমন তেমনি এই ধাবক বা সংবাদ বিভাগের জন্যও প্রস্তুত থাকিত। প্রত্যেক প্রদেশের বড় বড় নগরে যাইবার রাজপথ পার্শ্বে এবং পথিমধ্যস্থ গ্রামগুলিতে স্থানে স্থানে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের ব্যবস্থামত নগরপাল, গ্রামপাল ও স্থানীকগণ পরিচালিত এক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। অশ্ব পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ঐ সকল কেন্দ্রে অতীব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সম্পন্ন হইত।

ধাবকেরা সংবাদ বহন করিত আর অশ্বই ছিল তাহাদের অতীব প্রিয় এবং অপরিহার্য্য অবলম্বন। অশ্বারোহী ধাবক বিভাগ সাম্রাজ্যের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, মহাবল বিভাগের সঙ্গে ইহার গুরুত্ব সমান বিবেচিত হইত। সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রত্যেক গ্রামের প্রধান বা গ্রামনীর হাতেই থাকিত, যাহাতে সংবাদ পাইবামাত্রই দ্রুতগতি পরবর্ত্তী গ্রামে পাঠাইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না হয়। আর বিলম্ব ঘটিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। দ্রুতগতি সংবাদ প্রেরণের জন্য শিক্ষিত কপোতের ব্যবহারও ছিল। ঐজন্য বহুসংখ্যক কপোত রাজকার্য্যের জন্য প্রতিপালিত হইত। এইভাবে তখনকার দিনে সংবাদাদি প্রেরণ চলিত।

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই যথার্থ ভারতের রাজকীয় সকল বিভাগেই কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রবর্ত্তনা। কোন বিভাগেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার উপায় ছিল না। দণ্ড অত্যন্তই গুরু ছিল, সেই কারণেই প্রত্যেক নিয়ম এতটা নিষ্ঠার সহিত পালিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে এত কঠিন হস্তে, রাজ্যের কল্যাণের জন্য রাজ্য শাসনের প্রথা ছিল না, আর রাজ্যের কল্যাণের জন্যই ভবিষ্যতেও ইহা বহুকাল স্থায়ী, এমন কি অটুট ছিল। রাজার স্বার্থ অপেক্ষা ইহাতে প্রজাসাধারণের স্বার্থ এবং সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যই বেশী ছিল, ইহা তখনকার প্রজাসাধারণ বুঝিয়াছিল বলিয়াই ইহার প্রয়োগ সার্থক হইয়াছিল।

* * * * *

পথে, প্রথম দ্বিতীয় করিয়া কোথায় কোথায় তাহাকে বিশ্রাম লইতে হইবে ইহা মহামাত্যের নির্দ্দেশমত অগ্রী সব কিছুই স্থির করিয়া লইয়াছিল। সেই

নির্দ্দেশানুসার প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে অদ্রী রাজপথ পার্শ্বে পুরগোনার নামে এক গণ্ডগ্রামে প্রবেশ করিল। এখানে সেনাবিভাগের একটি আড্ডা ছিল। প্রধানকে বাহির করিতে তাহার কষ্ট হয় নাই। তখনও গ্রামখানি নিশুতি হয় নাই, পান্থনিবাসের ধারে কয়েকখানি দোকান তখনও খোলা ছিল। বিশিষ্ট অশ্বারোহী, সম্ভ্রান্ত, যোদ্ধবেশে সজ্জিত দেখিয়াই তাহারা যত্নসহকারে প্রধানের আড্ডায় লইয়া গেল। ঘোড়া হইতে নামিতেই প্রধানের ইঙ্গিতে একজন ঘোড়াটি লইয়া অশ্বশালায় চলিয়া গেল। তখন অদ্রী বলিল,—

'আজ রাত্রের মত ক্ষুন্নিবৃত্তি আর বিশ্রামের ব্যবস্থা, আব কাল প্রত্যূষেই একটি ঘোড়া চাই। রাজকার্য্যে বহুদূর যেতে হবে আমায়।'

তখনকার দিনে উত্তর ভারতে রাজবর্ত্মের ধারে সকল গ্রামের প্রধানগণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত সন্দেশবাহী, সৈনিক, দূত অথবা ভিন্ন প্রদেশের পথিক, পর্য্যটক পান্থগণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়াই থাকিত। সকল শ্রেণীর পান্থগণের অভাব মোচন হিন্দু স্বাধীন রাজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য। রাজপথ পার্শ্ববর্ত্তী বড় বড গ্রামে বা নগর প্রান্তে মহাবলবিভাগের একটি আড্ডা থাকিত বলিয়াছি,—সেখানে হস্তী, অশ্ব, ভারবাহী অশ্বতর, বলদ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সকল রকম পশু সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই রাখা থাকিত। গ্রামনী বা প্রধানগণও বহুদর্শী হইত।

যাহা হউক এখন, এই প্রধান মহাশয় অদ্রীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বুঝিতে পারিল সম্ভ্রান্ত বটে, তবে ইনি রাজধানীর বা রাজকার্য্যে নিয়োজিত কেহই নহেন, অথচ, রাজকার্য্যে যেতে হবে, কথাটি শুনিয়া তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। সে বিনিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কোথায় যাবেন, জানতে পারি কি ?'

তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অদ্রী একটু অপ্রসন্ন হইয়াছিল, তাহার নব উন্মাদনা,—আত্মসম্ভ্রম এখন কত গভীর,—প্রধানের ব্যবহারে তাহার আত্মসম্ভ্রমের উপরেই ঘা লাগিল। সে বলিল, 'সেটা নাই বা বললাম, তা না শুনলে কি ব্যবস্থা কিছুই করবে না এমন কথা আছে ?'

শুনিয়া প্রধান বলিল, 'কোথা থেকে আসছেন তা বলবেন ?' অদ্রী বলিল, 'তুমি ত বুঝতেই পেরেছ যে আমি রাজধানী থেকেই আসছি।' প্রধান বলিল,—'তা পেরেছি, তবে, আপনি ত মগধবাসী নন, রাজকীয় কোন বিভাগেও নিযুক্ত নন অথচ, রাজকার্য্যে যেতে হবে বলছেন তাতে আমি কি বুঝব ?' অদ্রী বলিল, 'কেন মহাবল বিভাগের ঐ আরবটা দেখেও কি বুঝলে না ? রাজসৈন্য বিভাগ

ছাড়া আরব ঘোড়া কি আর কোথাও আছে?' প্রতিষ্ঠানবাসী অর্দ্রীর ঐরূপ ধারণাই ছিল।

প্রাধান বলিল,—'কেন থাকবেনা, আরব, তুরাণী, ইরাণী, আরমেনী, বাহ্লিক গান্ধার প্রবাসী বড় বড মহাজন বা বণিক, যারা কুসুমপুরে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করে তাদের অনেকেরই যে আরব ঘোড়া আছে তা যখন আপনি জানেন না তখন সন্দেহ হয় না কি? তবে আপনার আরবটি যে মগধের সেনাবিভাগের ঘোড়া সেটা ওর সাজ জীন বলগা দেখেই বুঝেছিলাম, কারণ ঐগুলির সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু আপনার পরিচয়? সেটা পেলেই ত সব গোল মিটে যায়।' শুনিয়া অপ্রতিভভাবেই অর্দ্রী বলিল,—

'কেন ঐ আরব তুরঙ্গ, তার সাজসজ্জা, আসন, বলগা?'

একথা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রধান বলিল,—'কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ওগুলো সেখান থেকে কেউ যে অপহরণ করেনি তার প্রমাণ কি? আপনার যথার্থ পরিচয় অথবা রাজাদেশের বিশেষ কোন অভিজ্ঞান না দেখলে ত এর মীমাংসা হবে না?' এ কথা শুনিয়া অর্দ্রী বলিল, 'যদি তা না দি' বা না দেখাতে পারি?'

তৎক্ষণাৎ প্রধান বলিল,—'তাহলে এখনই স্থানীক অথবা গ্রামপালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

এইবার অর্দ্রী বুঝিল, পূর্ব্বাপর রাজবিধির কতটা উন্নত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—এটা কোশল রাজ্য নয়, নন্দরাজ্যও নয়, এটা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মগধ আর চাণক্যের বিধি। সে বলিল,—'ভদ্র! তোমার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয়ে বড়ই সুখী হলাম,—এখন ঐ মশালের আলোটা একটু কাছে আনো, তোমার বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন দেখাব।' এই বলিয়া সে বক্ষ হইতে যে অভিজ্ঞান বাহির করিল তাহা একখানি স্থুল, প্রায় চতুষ্কোণ রজতপত্রে খোদিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত নিদর্শন। উচ্চ কর্ম্মে অথবা যাহাদের গুপ্ত রাজকার্য্যে নিয়োগ তাহাদের জন্যই।

উহা দর্শন মাত্রেই আনুগত্য এবং সর্ব্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার বিধি নির্দ্দেশ করে। তখনকার ইহাই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। উহা দর্শনমাত্রেই প্রধান সসম্ভ্রমে তখন করজোড়ে কহিল, 'এখন আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে।'

অদ্রী বলিল, 'অবশিষ্ট রাত্রের বিশ্রামটুকুর ব্যবস্থা, আর ভোরে এমনি একটি ঘোড়া।'

প্রধান প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রধানের নিজগৃহের নিকটেই রাজকীয় বিভাগেরই বিশ্রামাগার উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারিগণের জন্য সযত্নে রক্ষিত গৃহেই সকল ব্যবস্থা হইয়া গেল। আহারাদির পর অদ্রী বোধ হয় দুই দণ্ডের অধিক নিদ্রা যায় নাই, এমন সময়ে তাহার অনুসরণকারীও সেই গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং কাহাকেও কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই প্রধানের কাছেই গেল। প্রধান তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতেও দেখিল না অথবা কোন পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিল না। দুজনে মিলিয়া কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিতে গেল।

প্রত্যূষে অদ্রী যাত্রা করিবার অনেকক্ষণ পর সে যাত্রা করিল—অবশ্য পথে একই গ্রামে তাহারা আশ্রয় লইল না। পরস্পরের অগোচরে তাহারা উপযুক্ত ব্যবধানেই গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রতি মধ্যদিনে এবং মধ্যরাত্রে আহার, বিশ্রাম এবং ঘোড়া বদল করিয়া তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নে অদ্রী চণ্ডালগড়ি উপস্থিত হইল। কোশল সীমান্তের এই দুর্গটি গঙ্গার উপরেই। শত্রুজিতেরই অধিকার এখানে, কাজেই তাহার নিজ স্থান বলিলেই হয়। দুর্গমধ্যে অনেকেই তাহার পরিচিত, সুতরাং অশ্ব পরিবর্ত্তন, গঙ্গাস্নান, আহারান্তে স্বল্পক্ষণ বিশ্রামান্তর সে যখন দুর্গ হইতে রাজপথে নামিয়া পশ্চিমোত্তর কোণে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছে বোধ হয় ক্রোশাধিক পথ যায় নাই তখন ওদিক হইতে মহামাত্য প্রেরিত সংবাদবাহী অনুচর চূণার দুর্গের ক্রোশার্দ্ধ দক্ষিণের পার্ব্বত্য জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ঐ স্থানে এক প্রাচীন দুর্গামন্দির ছিল, —সৈন্যসকল তাহারই পার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ শিবির মধ্যে ছিল। মগধাগত অনুচর এই দুর্গ-মন্দিরেই নায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং মুখে যাহা বলিবার ছিল তাহাও বলিল। এই ভাবে সে তাহার কর্ত্তব্য নিঃশব্দে সম্পাদন করিয়া স্নানের জন্য গঙ্গার পথে চলিয়া গেল।

এদিকে অদ্রী যখন ক্লান্ত অশ্ব লইয়া প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইল তখনও গাছের মাথায় মাথায় রৌদ্র রহিয়াছে।
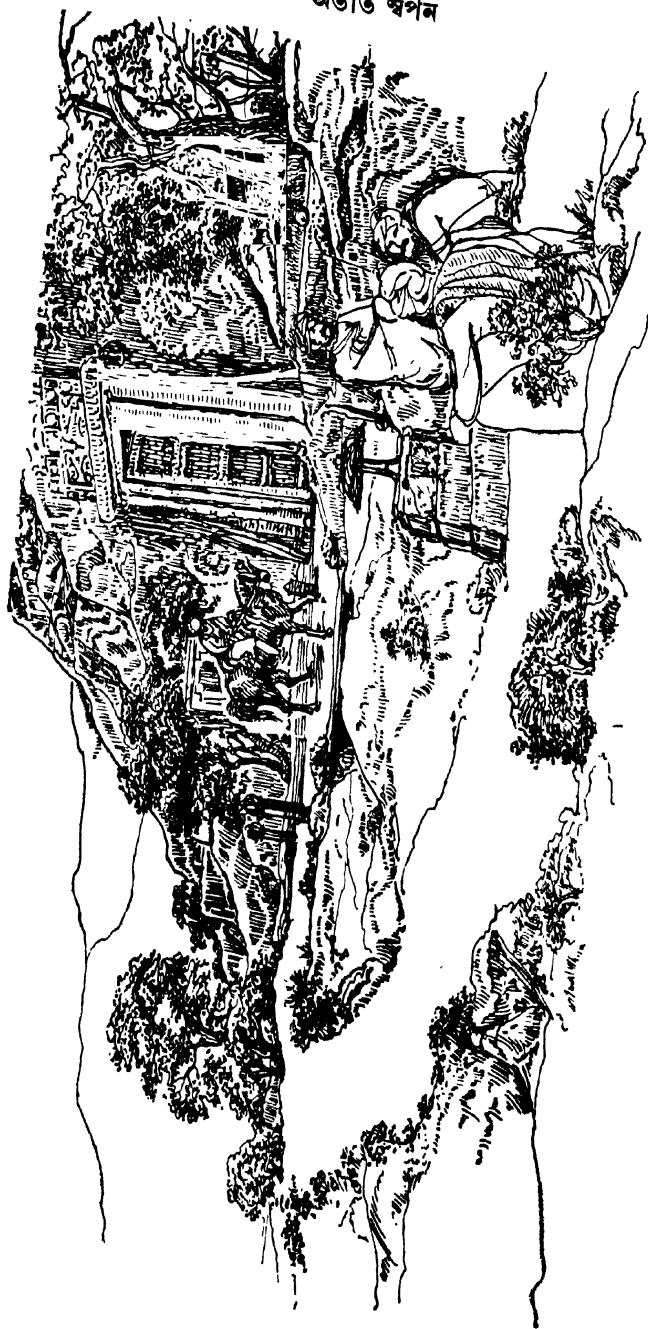
গঙ্গাতীরে ঐ প্রতিষ্ঠান-দুর্গের মধ্যেই সেনানিবাস অতিক্রম করিয়া অনেকটা গেলে পর তবে প্রাসাদ। দুর্গটি এখন দেখিতে ক্ষুদ্র কিন্তু তখন ছিল বিশাল —গঙ্গার তীরে তীরে প্রায় ক্রোশাধিক বিস্তৃত। তাহার মধ্যে সব কিছুই ছিল,— দোকান, বাজার, সেবাশ্রয়, মন্দির, অতিথিশালা ; উদ্যান, কোষাগার, অস্ত্রাগার, সভাগৃহাদি, বহুবিধ তোরণ শোভিত প্রশস্ত পথ-সকলই ছিল। এখন সকলকিছু জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে—প্রাচীন কিছুই নাই।

অদ্রী প্রথমেই প্রাসাদে গেল। সেথায় মহারাজের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইলে প্রণামান্তর মহামাত্যের প্রেরিত সকল সমাচার দিল। সে সকল সংবাদে মহারাজ প্রসন্নও হইলেন আবার কোন কোন সংবাদে ক্ষুণ্ণও হইলেন, অদ্রী কিন্তু ইহা লক্ষ্যও করিল না,—শেষে সে বলিল, 'কুমারকে এখনই মুক্তি দিতে আর্য্য মহামাত্যের আদেশ। আমাকে এখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আপনি তার মুক্তির আদেশ দিন, আমিই তাকে মুক্ত করে নেব।'

মহারাজ অবিলম্বেই সেই আদেশ দিলেন। আদেশ অর্থে মুক্তির অভিজ্ঞান একটি তার হাতে দিলেন, অদ্রী তৎক্ষণাৎ বন্দিশালায় প্রস্থান করিল।

প্রতিষ্ঠানের কারাগার—মৃত্তিকানিম্নে প্রকাণ্ড এক গহ্বর, সুড়ঙ্গ পথে নামিয়া অন্ধকার—সরু গলির পথে অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে হয়। অদ্রী কারাগারের পথে যাইতে ভদ্রাশ্ব বলদেবের সঙ্গে দেখা হইল। বলদেব রাজমন্ত্রী গঙ্গাধরের পুত্র, তাহারই সখা। সে নিভৃতে তাহাকে লইয়া গেল এবং বলিল—'কুমার বিক্রম কারাগারে নাই, পিতা গোপনে আমাদের গৃহেই রাখিয়াছেন।' শুনিয়া অদ্রী খুসী হইল। তখন উভয়েই অমাত্য গঙ্গাধরের আশ্রমের পথে গেল।

অমাত্য গঙ্গাধর অদ্রীর আবির্ভাবে চমকিত হইল,—কহিল,—'অদ্রী, তোমার এমন মূর্ত্তি কেন?'—যথাযোগ্য উত্তর দিয়া অদ্রী,—বিক্রম কোথায়, জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাধর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

উভয়েই অমাত্যবরের শয়ন কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলে গঙ্গাধর দ্বারে ঘা দিয়া ডাকিলেন, 'কুমার, দ্বার খোল, অদ্রীহরি তোমার দর্শনপ্রার্থী।'

দ্বার খুলিয়া কুমার বিক্রম বাহিরে আসিলে অদ্রী তাহাকে বাহুবন্ধনে নিভৃতে প্রাঙ্গণস্থ উদ্যান মধ্যে লইয়া গেল! সেখানে নির্জ্জন কুঞ্জবন মধ্যে এক শিলাসনে দুই বন্ধু উপবেশন করিল। অদ্রী দেখিল, বিক্রম অত্যন্ত বিষণ্ণ, তাহার এমন বিরস মুখ সে কখনও দেখে নাই। স্বভাবতঃ বিক্রম তেজস্বী এবং চঞ্চল স্বভাব ছিল।

বিস্মিত বিক্রম প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, 'অর্দ্রী! তুমি না কুসুমপুরে গিয়েছিলে?' অর্দ্রী বলিল,—'হ্যাঁ, সেখান থেকেই আসছি। বিক্রম! বিধাতার ইচ্ছায় এখন তোমার উত্তম সুযোগ উপস্থিত।'

শুনিয়া বিক্রম সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসের সুযোগ? —বিক্রম অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল, তাহার উপর এ কথায় কতকটা কৌতূহলী হইয়া যখন সে অর্দ্রীর পানে চাহিল তখন তাহার মুখের মধ্যে একটু চঞ্চল ভাব লক্ষ্য করিয়া অর্দ্রী সুখী হইল।

অর্দ্রী—তুমি যাহা চাও তাহারই সুযোগ! এখনই আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে।

কুমার—কোথায়?

অর্দ্রী বলিল—পাটলিপুত্রে।

কুমার—কেন?

শুনিয়া অর্দ্রী বলিল—বলছিনা, তোমার ঈপ্সিত মহাসুযোগ উপস্থিত সারা পাটলিপুত্র চক্রান্ত করে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, ঐ শূদ্রকে তারা কোনমতেই সহ্য করবে না।

শুনিয়া বিক্রম বলিল, শূদ্র! চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র? অর্দ্রী বলিল, পূর্ব্বে রাক্ষস ত' ঐ কথাই প্রচার করেছিল—সেইটিই এখন আবার এঁরা কাজে লাগিয়েছেন, সাধারণ প্রজারা কি জানে, রাজ-সংসারের কথা? মহাপদ্মের বা ধননন্দের বা মগধের রাজার কতগুলি স্ত্রী আর তাদেব কতগুলি ছেলে? সাধারণে কেবল বড়গুলিকেই জানে। তা ছাড়া চন্দ্রগুপ্ত যখন শিশু এমন কি বাল্যকাল থেকেই উপেক্ষিত। জানত, শেষে কারাগার ভোগও করতে হয়েছে ভাইদের চক্রান্তে—তখনকার দিনে রাজার কাছে পর্য্যন্ত যাওয়া বারণ ছিল তার। অজ্ঞাতবাসেও তার কম দিন যায় নি—এসব কথা ত পুরাণো। যাই হোক, চাণক্যের চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলীবনের ক্ষত্রিয় রাজকন্যা মুরা আর নন্দরাজ ধনের প্রিয় পুত্র—আর রাক্ষস কাত্যায়নের চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র রাজজারজ। শুনিয়া কুমার চিন্তিতভাবে বলিল, 'এখন সে কথা থাক কিন্তু এত দিনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, এত সহজে এক বিপ্লবের ধাক্কায় একেবারে উচ্ছেদ হবে—এটা বিশ্বাস করাই শক্ত—নয় কি?' শুনিয়া অর্দ্রী বলিল, 'তুমিই তো সেই চেষ্টাই এতদিন ধরে করছিলে বন্ধু।' বিক্রম

বলিল, 'তা করেছি বটে কিন্তু এত শীঘ্র, এখনই তার সিদ্ধির আশা তো করিনি ?—'

অদ্রী—আসলে মহালাধিকৃতই এই বিদ্রোহটি গড়েছেন গত দুইটি বছর থেকে। চন্দ্রগুপ্তের পরেই মগধে তার তুল্য শক্তিশালী আর কে আছে এই মৌর্য্য রাজ্যের মধ্যে ? আসলে নন্দরাজ্য যেভাবে গিয়েছে মৌর্য্য রাজ্যেরও সেই দশা হবে। অতি কঠিন পীড়নকারী রাজার সব সময়েই ঐ দশা। নন্দরাজারা যেভাবে প্রজাপীড়ন করেছিলেন, এদেরও ঠিক সেই পীড়ন কেবল প্রকার ভেদ, এই যা তফাৎ।

কুমার—আচ্ছা অদ্রী, তুমি এর মধ্যে এতটা আশা পেলে কি করে ?

অদ্রী—এ সুযোগ কি আর দুবার আসে, বন্ধু ? রাজা পলাতক, শূন্য সিংহাসন, রাজপুত্র বন্দী, মহারাণীর সঙ্গে সবাই রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ। যবন দূত অশ্বারোহণে পালিয়েছে। নৃসিংহ বলভদ্র নিজে কখনও সিংহাসন চান না। তা যদি চাইতেন তা হলে আজ আর আমাকে এখানে এসে, তোমায় নিয়ে যাবার জন্য এত বেশী যত্ন করতে হত না। আমি যখন দেখলাম, সাধারণ প্রজা আর বড় বড় ভূস্বামীরাও মৌর্য্যদের আধিপত্য চাইছে না, তারা প্রাচীন আর্য্য রাজবংশের অধীনে থাকবে, তখন তোমার দাবী সবার ওপর। প্রাচীন ভরতবংশের তুমি,—আর গোড়া থেকেই তুমি মৌর্য্যদ্বেষী এখন পর্য্যন্ত লেগে আছ ঐ কাজে—এ কথা আজ কে না জানে ? শোনো, এখন আর কোনমতে সময় নষ্ট না করে চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। মহাবলাধিকৃত নৃসিংহবলভদ্র আমাদের আশাপথ চেয়ে আছেন—

কুমার—আচ্ছা তুমি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছ এ কথা বীরভদ্র জানেন ? আমাদের প্রতিনিধির কথাই বলচি।

অদ্রী—এ সকল এখন গোপনে গোপনেই চলচে সাধারণের মধ্যে যাতে জানাজানি না হয়। তারপর, সিংহাসন পূর্ণ হলে সবাই ত' জানবে। যারা জানে না তাদের জানিয়ে এখন বাধার সৃষ্টি করে লাভ কি বল ? তুমি ত জান আমাদের বীরভদ্র ভীতুলোক, গোলমালের মধ্যে যেতেই চান না।

কুমার—কিছু মনে কোরো না, একটা কথা বলছি,—আচ্ছা, তুমি মগধ রাজবংশের কেউ নও, কোন রাজকর্ম্মচারীও নও,—এমন কি মগধের প্রজাও নও, কোশলবংশীয় প্রতিষ্ঠানবাসী হয়ে কেমন করে বিদ্রোহীদের ভিতরে ঢুকে এতটা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে পড়লে,—এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ?

অদ্রী—হায় হায়, কুমার! তুমি কি এতই অন্ধ, এই সহজ ব্যাপারটি তোমার চোখে পড়ল না? জান না কি, আর্য্য প্রবীরবর্ম্মা আমার ভগিনীর স্বামী, তিনি ওখানকার পঞ্চসাহস্রী মহারথ আর মহাবলাধিকৃত নৃসিংহবলভদ্রদেব আবার তাঁরই ভগিনীপতি। চিন্তা কোরনা বন্ধু, আমি তাদের বিশ্বাসভাজন ব'লেই না এতটা হতে পেরেছে।

কুমার এবার যেন অনেকটাই আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'তাহলে এখান থেকে কিছু বিদ্রোহী সৈন্য সংগ্রহ করে একটু সতর্ক হয়েই আমাদের যাওয়া উচিত। অতন্তঃ কিছু সৈন্য—বাছা বাছা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা, যাদের আমি আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ নিজের হাতে গড়েছি, তারা সঙ্গে থাকা ভাল নয় কি?'

অদ্রী—তোমার নিরাপত্তাব কথা যদি বলো তাহলে, আমার বুদ্ধিতে, কোন সৈন্যসামন্ত এমন কি শরীর-রক্ষী প্রহরী পয্যন্ত না নেওয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা। এই দেখ, আমি একেশ্বর, আজ তিনটি দিন রাত পথের সম্বল একমাত্র ঘোড়াটি নিয়েই এখানে চলে এসেছি, কোন রক্ষক নয়, ভৃত্য নয়, কিছু নয়। এখন সবার উপর গুরুতর কাজ হ'ল সেখানে তোমার উপস্থিতি, যার জন্যে দেখ কুমার, আমার পেটে অন্ন নেই, বিশ্রাম নেই, একটি মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিনি, সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটকের বেদনা, উপেক্ষা করেই এসেছি, আবার ফিরে যাব—কেবল তোমার মুখ চেয়ে।

বিক্রম বলিল,—'বুঝেচি, এখন ভাবছি—আর কি করা যেতে পারে—?'

অদ্রী—চিন্তা করবার আর কিছুই নেই, বাকবিতণ্ডা বা যুক্তিতর্কেরও সময় নেই, যেমন অবস্থায় আছ চলে এস। জানিনা, এতক্ষণ ওখানে কি হচ্ছে। —সন্দেহ ক'র না বন্ধু, সার্ব্বভৌম নরপতিব টিকা তোমার কপালে পরাতে পারব এই আশাতেই এতটা করেছি।

কুমারের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইল। একটি ভয়ের আভাস, তার সঙ্গে নিশ্চিৎ সিদ্ধির আনন্দ, এখন যুগপথ ক্রিয়া করিয়া তাহার হৃদয় মধ্যে রক্তের চলাচল দ্রুত ক্রিয়াশীল হইল। সে কতকটা ভাবাবেগেই কহিল,—'অদ্রী! তোমার বন্ধুত্ব, তোমার আনুগত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই আমার, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই মীমাংসা করতে পারছি না,—সেই কুটিল ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য, সে থাকতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কখনও—'

মুখের কথা কাড়িয়া অদ্রী বলিল,—'না, না, না, বন্ধু সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তাঁকে বন্দী করবার আগেই গয়ার পথে তিনি পালাচ্ছিলেন, তাঁকে বিদ্রোহী সৈন্যেরা এমন ভাবে ধাওয়া করেছিল যে, তিনি গয়াতে মাত্র একটি

রাত্র কোন রকমে কাটাতে পেরেছিলেন, তারপর অতি প্রত্যূষে ওখান থেকে গুরুপাদ-পর্ব্বতে যাত্রা করেন, সেইখানেই প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেছেন। গভীর নৈরাশ্যের ফলেই তাঁর অবস্থার এই পরিণতি।'

আর প্রশ্নমাত্র না করিয়া বিক্রম বাহিরে আসিয়া আপন অনুচরকে অশ্ব আনিতে আদেশ করিল। যে সময়ে অদ্রী পাটলীপুত্র হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই উভয়ে প্রতিষ্ঠান হইতে যাত্রা করিল। দ্রুতবেগে অশ্ব চালনার ফলে পথে তাহারা আর কোন কথা কহিবার সুযোগ পাইল না।

এইরূপে মধ্যরাত্রে তাহারা চণ্ডালগড়িতে আসিয়া পৌছিল। দুর্গদ্বার বন্ধ ছিল, তাহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ না করিয়া পর্ব্বত নিম্নে উদ্যানস্থ রাজ-নিবাসের মধ্যে রাত্রি যাপন করিল। বিশ্রামান্তে প্রত্যূষেই আবার তাহারা যাত্রা করিল। রাত্রে উদ্যানস্থ অশ্বশালায় তাহাদের ঘোড়াগুলিও আহার ও বিশ্রাম পাইযাছিল, সুতরাং তাহাদের ঘোড়া প্রস্তুত ছিল, রাজপথে পড়িয়া গুটি গুটি চলিতে চলিতে তাহাদের মধ্যে কথা হইতে ছিল,—'আজ দ্বিপ্রহরে স্নানাহার কোথায় হইবে।' এমন সময় সম্মুখের জঙ্গল হইতে কয়েকজন অশ্বারোহী বাহির হইল,—দেখিতে দেখিতে ক্রমে অনেকগুলিই পদাতিক ধানুকীও বাহির হইল এবং পথের উপরে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিবার উপক্রম করিল। তাহাদের ধনুকে শর যোজিত, মুহূর্ত্তেই নিক্ষিপ্ত হইবে এমনই তাহাদের ভাব।

একি ব্যাপার! তখনও সব কিছু খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাহাদের

সৈনিকের বেশ স্পষ্টরূপে দেখিয়াই তাহারা যে মগধ রাজকীয় সেনাবিভাগেরই পদাতি এবং অশ্বারোহী তাহা আমাদের এই দুই বন্ধুই বুঝিতে পারিল, আরও সেইজন্য যুদ্ধের কোন উদ্যম না করিয়া তাহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

যখন মগধ রাজ-অশ্বারোহিগণ নিশ্চিত বুঝিল যে, উভয় বন্ধুর পক্ষেই আর কোন প্রকার যুদ্ধ উদ্যমের সম্ভাবনা নাই তখন তাহাদের নায়ক অগ্রবর্ত্তী হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল,—

'মৌর্য্য আর্য্য,—আপনারা রাজদ্রোহিতার অপরাধেই বন্দী। আপনাদের বিচার এবং রাজবিধানের জন্য সসম্ভ্রমে রাজধানীতে নিয়ে যেতে আর্য্য মহামাত্যের আদেশ হয়েছে। কিন্তু, প্রতিবাদ অথবা কোন উপায়ে পলায়নের চেষ্টা করলে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যেতেও তাঁর নির্দ্দেশ আছে। এখন অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের অনুগৃহীত করবেন কি?'

এখন, নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের বর্ম্মচর্ম্ম দেখিয়াই ইহারা যে সুনিশ্চিত মহাবল বিভাগেরই সৈন্য, বুঝিয়া ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তারা দুজনেই তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করিল। কেবল কটিদেশে বদ্ধ কীরীচ মাত্র রহিল।

অদ্রীর মুখ শুখাইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য মহামাত্যের উপর তাহার অবিশ্বাস আসিল। তাইত! এ ব্যবস্থাব বিষয় ত সে কিছুমাত্র জানে না, পূর্ব্বে আভাসও পায় নাই। সেই কৌটিল্যের কুটিল চক্রান্ত ভাবিয়া তাহার সরল অন্তঃকরণে যে বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এইক্ষণেই তাহা ঘৃণা এবং জীঘাংসায় পরিণত হইল। উঃ, ঐ সৌম্য মূর্ত্তির মধ্যে এতটা হলাহল! সে কি অন্যায়ই করিয়াছে—ঐ ভীষণ মহামাত্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া। উত্তেজনায় সে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অবশ্য এ-ভাব তাহার মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। উত্তেজনার ক্রিয়া পূর্ণ হইয়া গেলে অল্পক্ষণেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে সে যখন প্রকৃতিস্থ হইল—তখন তাহার স্মরণ হইল তাহারই বক্ষমধ্যে আর্য্য মহামাত্যের যে অভিজ্ঞান আছে তাহাতে সে, যে-কোন কঠিন অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহার সঙ্গী কুমার বিক্রমের কোনও উপকার হইবে না। সুতরাং তাহাকে কুমারের সঙ্গীরূপে নিয়তই সঙ্গে সঙ্গে রাখিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাহার সঙ্গে থাকিলেই কুমার শান্ত থাকিবে আর যতক্ষণ না রাজধানীতে পৌছাইয়া কোন বিশেষ বিধান পাওয়া যায়, ততক্ষণ কুমারকে বাধ্য হইয়াই স্থির থাকিতে হইবে। মনের মধ্যে এই সকল তোলা পাড়া

করিতে করিতেই সে চলিল। কিন্তু এই সৈন্য বাহিনীর এভাবে পথিমধ্যে আবির্ভাব ও তাহাদের বন্দী করায় যে ভয়টি অন্তরে ক্রিয়া করিতেছিল তখনই তাহার শান্তি হইল না, সকল ব্যাপারের মীমাংসাও হইল না।

তাহারা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই ঐ অশ্বারোহী কয়জন ও তাহাদের পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকেরাও যন্ত্রবৎ—দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত কাহাকেও অভ্যর্থনা করিয়া পথে যে ভাবে লইয়া যাওয়া হয়, সেই ভাবেই তাহাদের লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল,— দেখিয়া, অদ্রীর মনে হইল যে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে মহামাত্যের একটি কল্যাণকর উদ্দেশ্য আছে। একদল অনেকটা দূর ব্যবধানে অগ্রে, অন্যদল অপেক্ষাকৃত নিকট পশ্চাতে, মধ্যে সম্ভ্রমোচিত যথেষ্ট ব্যবধানে তাহারা দুইজনে পাশাপাশি যাইতে লাগিল। অদ্রী এখনও মহামাত্যের এই কুটিল কর্ম্মপদ্ধতির ইতি করিতে না পারিয়া বিষণ্ন মনেই চলিতে লাগিল।

বিক্রম বলিল, 'অদ্রী! আমার সঙ্গে এই হীন প্রবঞ্চনাটা করলে? তোমায় বন্ধু বলেই জানতাম, শেষে চক্রান্ত করে তুমিই আমায় ফাঁদে ফেললে?'

শুনিয়া অদ্রী অতিশয় লজ্জিত এবং ব্যথিত অন্তঃকরণে কাতর কণ্ঠে বলিল,— 'যদি তাই করব তবে তোমার সঙ্গে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হয়ে দুর্নাম কিনলাম কেন,—তুমি কি আমার মনোভাব জান না?'

শুনিয়া কুমার কহিল,—'তবে এসব কি? রাজধানী পাটলীপুত্রে যদি বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটে থাকে, গুরুপাদে মহামাত্য প্রায়োপবেশনে, চন্দ্রগুপ্ত পলাতক, তবে এই সৈনিক দল আবার কোন্ মহামাত্যের আদেশে আমাদের রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করে কুসুমপুরে নিয়ে যায়? এ অধিকার এরা কোথায় পেলে?'

অদ্রী বলিল,—'আমিও বোকা বনেছি, কুমার! তোমার সঙ্গে কথা কইবার মুখ আমার এখন নেই, যদি কখনও দিন পাই আমার নির্দ্দোষিতা ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়ে তোমার মনদুঃখের শান্তি করিব। এখন আমার এই দুঃখ যে, তোমার সঙ্গে রাজদ্রোহী হয়ে সাম্রাজ্যের শত্রু বলে কলঙ্ক কিনলাম। অথচ তুমি ভালই জানো যে, আমি জীবনে কখনই রাজদ্রোহী হতে পারি না।

* * * *

এই ভাবে তৃতীয় দিনে দিবাবসানের পূর্ব্বেই তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দ্বৈরীৎ সেনানিবাসে প্রবেশ করিল। সেখানে পৌছিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা এবং সৎকার, স্নান, পানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা দেখিয়া বিক্রম অবাক হইয়া

গেল। রাজদ্রোহের অপরাধী যাহারা তাহাদের প্রতি এবম্বিধ ব্যবহার পূর্ব্বে তাহারা কখনও দেখে নাই, কোথাও শুনেও নাই।

এখন এই দ্বৈরীৎ সেনানিবাসের কথা, পরিচয় হিসাবে একটু জানিয়া রাখা ভাল ;—

মূলতঃ ইহা বৈদেশিক বিশাল, প্রায় দুই-তিন রশি পরিমাণ দীর্ঘ, দ্বিতল সেনানিবাস। দেশীয় সেনার অধিকাংশই গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় ও কৃষকশ্রেণী হইতে লওয়া হইত এবং যুদ্ধকালে তাহাদের বৃত্তি দেওয়া হইত। তাহাদের সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা নিজ নিজ কেন্দ্রস্থ গ্রামেই সম্পন্ন হইত এবং প্রয়োজনমত গ্রাম হইতে রাজধানীতে আনীত হইত। আর বিদেশী সৈন্যগণ যাহারা রাজধানীতে থাকিত বিভাগীয় সেনাপতিগণের তত্ত্বাবধানেই তাহারা এই দ্বৈরীৎ সেনানিবাসেই থাকিত এবং শান্তির সময়ে রাজধানীর নানা বিভাগে, বিশেষতঃ রাজপুরী রক্ষার সকল কাজেই নিযুক্ত থাকিত।

ভারতীয় সেনাদলে তখন বহু বিদেশী সেনা থাকিত। বাহ্লিক, শক, কিরাত, কম্বোজ, আরমেনী, তুরাণী, হাবসী সৈন্যও ছিল, এমন কি কিছু কিছু যবন ও মিশরীয় সৈন্যও ছিল ঐ মৌর্য্য সেনাবিভাগে। এই সকল বিজাতীয় সৈন্যগণ পৃথকভাবে সংগৃহীত হইয়া সামরিক শিক্ষার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, চতুরঙ্গ বলের যে-কোন বিভাগেই নিযুক্ত হইত। অশ্ব, গজ, রথ আর পদাতি—এই চতুরঙ্গ বল রাজ্য-রক্ষার প্রধান শক্তি। এতদ্ব্যতীত নৌ-সেনা এবং নৌ-বলও মহাবলবিভাগের একটি বল। তখনকার দিনে বাণিজ্য এবং ভ্রমণ উভয় উদ্দেশ্যেই সমুদ্রে যাতায়াত চলিত ছিল ; সুতরাং, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ভারত-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নৌ-বল প্রবল হইয়াছিল। তখনকার দিনে কিন্তু এদেশে যাহার গৌরব বিশেষরূপেই প্রবল ছিল, তাহা ঐ প্রথমোক্ত চতুরঙ্গ বলেরই। ঐ বল লইয়াই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি সমগ্র এশিয়া খণ্ডে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্থানে মহাবলবিভাগের কেন্দ্র ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্রে প্রধান এবং তক্ষশীলায় গান্ধার সীমান্তে প্রবল অপর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। এই দুই কেন্দ্র হইতেই এক একজন দক্ষ সেনাপতির তত্ত্বাবধানে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের সৈন্য বিভাগ গঠিত।

এখন যেমন সকল প্রদেশের মধ্যেই দেখা যায় যে, সকল নগরের এবং গ্রামের কৃষক-সংসারের যুবারা অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল এবং উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে, তখন

তাহা ছিল না। এখনকার গ্রাম এবং নগরবাসী যুবকগণের ঐ প্রকার আলস্য ও অকর্ম্মণ্যভাব তখনকার দিনে দেশবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেকালে গ্রামের যুবারা গ্রামপালের নির্দ্দেশে, আপন উৎসাহেই প্রত্যেক গ্রামের উপযুক্ত স্থানে তখনকার প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র সকল অভ্যাস, প্রয়োগ, নৈপুণ্য, আক্রমণ ও আত্মরক্ষাদি শিক্ষা পাইত এবং ভবিষ্যতে সময় উপস্থিত হইলে সেনা বিভাগে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইত। মল্লবিদ্যা আপামর সাধারণের প্রিয় ছিল—বাল্যকাল হইতেই সকল বিদ্যাই অভ্যাস করিবার প্রথা ছিল।

আর বিদেশের সৈন্য যাহারা, নানাবিভাগেই নানা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারা নিজদেশ ত্যাগ করিয়া ভাগ্য অন্বেষণে, তক্ষশীলা কেন্দ্রে, আবার রাজধানী পাটলীপুত্র কেন্দ্রেও আসিত। কখনও কখনও অন্যান্য প্রাদেশিক কেন্দ্রেও আসিত। নানা কর্ম্মের সন্ধানেই যেমন তাহারা আসিত আবার নানা বিভাগেই তাহারা কর্ম্মও পাইত। রাজপ্রাসাদ এবং অন্তঃপুরের অধিকাংশ প্রহরী যবন এবং লিচ্ছবি। এই দুই জাতীয় নরনারী নির্ব্বিচারে তখনকার দিনে অতীব বিশ্বাসী এবং প্রহরীর কর্ম্মে বিশেষ দক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত।

নরনারী ভেদে ভাষা ছিল অপূর্ব্ব এবং বিভিন্ন। বিদ্যাবান পুরুষগণ নাগ্‌রী অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন, অশিক্ষিত জন এবং নারী সাধারণ প্রাকৃত অথবা পালি অর্থাৎ পল্লি ভাষা, এখন আমরা যাহাকে পালি বলি, সেই ভাষায় কথা কহিত। সেনাবিভাগেও ঐ ভাষা, রাজ্যের সর্ব্বত্রই, কেবল বিচার এবং উচ্চ রাজকর্ম্ম বিভাগ ব্যতীত মগধে পালিই ছিল কথ্য ভাষা। বিদেশের সকল কর্ম্মচারীই প্রাকৃত অথবা পালি আয়ত্ত করিয়া অতি অল্পদিনেই দেশকে আপন করিয়া ফেলিত। তবে প্রদেশ ভেদে ভাষার যে ভেদ ছিল তাহাতে কোন কর্ম্মই আটকাইত না। নগরবাসী বিদ্যাবান, উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অল্প-সংখ্যক অভিজাত শ্রেষ্ঠিগণের মধ্যে সংস্কৃত বা দেবনাগরী ছিল সভ্য, সার্ব্বজনীন ভারতীয়গণের ভাষা এবং ঐ সংস্কৃত মূল হইতে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় উদ্ভব, পরে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছিল। কাজেই কোন প্রদেশের সহিত কোন প্রাদেশিক জনগণের ব্যবহারে ভাষা একটা প্রতিবন্ধক ছিল না। যেমন সভ্য ও শিক্ষিত সাধারণ, তেমনই অতি সাধারণ অশিক্ষিতজনও অতি সহজেই যে কোন প্রাদেশিক বা পরদেশীর সঙ্গে মিলিতে-মিশিতে পারিত। সকলের উপর ছিল দেশীয় জনসাধারণের সুস্থ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর, উৎসাহশীলতা ও ভ্রাতৃভাবের সহজ আকর্ষণ। শক্তিবান জনপদবাসিগণ প্রীতি পরবশ হইয়াই পরদেশীয়গণের

সঙ্গে মিলিত, মিলিতে ভালবাসিত ;—এমন কি, না মিলিতে পারিলে নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করিত। দেশ পর্য্যটন তখনকার সভ্যতার উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ছিল। অধীতশাস্ত্র, বিদ্যাবান কেহ পর্য্যটক হইলে সকল সমাজেই স্বদেশীয় অথবা পরদেশীয় রাজসভাতেও তাঁহাদের বিশেষ স্থান ছিল।

যাহা হউক, চণ্ডালগড়ি হইতে মহামাত্যের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী উভয় বন্দীর সহিত অদ্য রাজধানীতে আসিয়া পৌছিয়াছে, ইতিমধ্যেই সেনাবিভাগ হইতে মহামাত্যের স্থানে এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল। অবিলম্বেই সেখান হইতে আবার প্রতিনির্দ্দেশ আসিল, সেনাপতিও সেই নির্দ্দেশ অনুসারে অবিলম্বেই সকল ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইল।

পথে আসিতে আসিতে অদ্রী ভাবিয়াছিল, রাজধানীতে পৌছিয়াই মহামাত্য নিশ্চয়ই একবার তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া সকল রহস্যের সমাধান করিবেন ; অর্থাৎ এই অভাবনীয় কর্ম্মপদ্ধতি, যাহার বিষয় সে কিছুমাত্র জানিত না, তাহার উপর আলোকপাত করিবেন। পূর্ব্বে তাহার সহিত আলাপের মধ্যে সে যে ভাবের সম্ভাষণ পাইয়াছিল, তাহাতে সে মহামাত্যের একজন বিশ্বাসভাজন এবং দক্ষ কর্ম্মসহায় হইতে পারিয়াছে, ইহাই বুঝিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস লইয়াই সে বাহির হইযাছিল। এখন তাঁহার এ ভাবের কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া তাহার মনটা বড় ছোট হইয়া গেল, সে নিজেকে ক্ষুদ্র এবং সহাযহীন মনে করিতে লাগিল ;—আবার মহামাত্যের অনুগ্রহভাজন হইবার উপযুক্ত হইতে পারে নাই মনে করিয়া সে অন্তরে অন্তরে নিজেকে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিল।

ওদিকে বিক্রমের অবস্থা কঠিন হইল। অদ্রীর প্রতি নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই বলিয়াও বটে আবার অন্য দিকে মর্ম্মপীড়াও তাহার কম ছিল না। অদ্রীর প্রত্যেকটি কথা সে সারাপথ ধরিয়াই আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছে। অদ্রীর মধ্যে এতটা শঠতা, এতটা প্রবঞ্চনা কখনই সে কল্পনাও করিতে পারে না—তাহার পর এই বিচিত্র আবেষ্টনের মধ্যে যখন তাহারা ধীরে ধীরে আসিয়া পড়িল, এমন কি রাজধানীর মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপথের জন-প্রবাহ, সুশৃঙ্খল নগর রক্ষার সহজ নিত্যকার আয়োজন, প্রহরীগণের সহজ আচরণ দেখিয়া এমন কি সকল স্থানেই এবং সকল ব্যাপারেই একটা সুন্দর নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়া, তাহার মধ্যে বিস্ময় এবং ভয় যুগপৎ ক্রিয়া করিতে লাগিল। মহা উদ্বেগে সে ক্রমে ক্রমে বড় অস্থির হইতে লাগিল। কুসুমপুরের মধ্যে বিদ্রোহের কোন লক্ষণই না দেখিয়া সে যে একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছে,

এই অনুমান করিয়া এবং তাহার জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা বলিয়াই, নানা চিন্তায় তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া মুক্তি পাইবার চিন্তা যে তাহার হয় নাই তাহা নহে, সারা পথটাই সে মুক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে কিন্তু এখন এই সেনানিবাসে আসিয়া মুক্তি যে তাহার পক্ষে দুষ্কর, ইহা বুঝিয়া সে নিরাশ হইল। সে বুঝিল, শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাদের আনা হয় নাই বটে কিন্তু তাহাদের মাথার উপর যে অপরাধ ঝুলিতেছে তাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে শৃঙ্খলিত হওয়া ত' সহজ কথা—শেষ অবধি মৃত্যুদণ্ডই হয়ত বরণ করিতে হইবে।

বন্দী হইবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে ভয় ছিল না যদিও রাজদ্রোহের অপরাধ তাহার মধ্যে পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান ছিল। এখন অবস্থান্তরে তাহার গুরুত্ব বুঝিয়া সে অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল, মুখে তাহার কতকটা বিষাদের ছায়াও পড়িয়াছিল।

রাত্রে একই কক্ষে পরিপাটী শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহাদেব উভয়েরই অন্তর একটু প্রফুল্ল হইল। যদিও নিতান্তই ক্লান্ত এবং মানসিক উদ্বেগের ভারে অবসন্ন তথাপি তখনই উভয়েরই শয়নের প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ বিক্রমের প্রবল উদ্বেগ, তাহার মধ্যে, অদ্রীর সঙ্গে এখনই যেন একটা বুঝাপড়া করিয়া লইবার প্রবৃত্তি পীড়াদায়ক হইলেও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অদ্রীর সঙ্গে সে এই প্রকার সন্দেহজনক একটা সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না,—ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। এদিকে, এই যে ভীষণ দণ্ডনীয় অপরাধে তাহারা উভয়েই অভিযুক্ত—আর মৃত্যুদণ্ডই তাহাদের উপযুক্ত—এমন কি অনিবার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অথচ ইহাদের ব্যবহার বড় অদ্ভুত, প্রীতি ও সম্মান ও পদমর্য্যাদার উপযুক্ত সম্ভ্রম প্রতি ব্যবহারেই দেখাইয়া বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। অবাক কাণ্ড!

অদ্রীর মধ্যেও একটি সংযম তাহাকে যেন রক্ষা করিতেছিল। নিজের এতটা গভীর মানসিক উদ্বেগ সত্ত্বেও বিক্রমের অবস্থাও সে সম্পূর্ণই অনুভব করিয়াছিল। সে যে অন্তরে বিষম, এমন কি অসহ্য একটা পীড়া ভোগ করিতেছে অথচ প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাহা দেখিয়া অদ্রী আর থাকিতে পারিল না। অতীব ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—'বন্ধু! এতটা মুহ্যমান কেন?—ইহাদের আচরণে আমার মনে ত' কোন অমঙ্গল আশঙ্কা হয় না।'

শুনিয়া বিক্রম নতশিরে কিছুক্ষণ থাকিয়া বলিল,—'তোমার ঐ 'বন্ধু' সম্বোধনে আমার মধ্যে আর শান্তি আসে না, তুমি যে আমায় প্রতারণা কর নাই, মগধের

রাজধানীতে মিথ্যা বিদ্রোহের সংবাদে আমায় প্রলুব্ধ করে শেষে',—বলিতে গিয়া বিক্রমের কণ্ঠরোধ হইল।

অদ্রী তাহার স্বাভাবিক কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'শোন বিক্রম,—জন্মাবধি একত্র লালিত পালিত, কোশল মহারাজের স্নেহে ও অন্নে পুষ্ট এ দেহ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে একত্র সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষিত হয়েছি, আমাদের মধ্যে কখনও বিরোধের কোন কারণ হয় নি। বিশ্বাস কর বন্ধু, এক্ষেত্রে যাহা করেছি তোমার কল্যাণ, সর্ব্বাংশেই শুভ ফলের নিশ্চিত আশাতেই করেছি; অন্য কোন উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না।' বলিতে বলিতে অদ্রী কটিবন্ধে কোষ হইতে শানিত ছুরিকা বাহির করিয়া ফেলিল,—বলিল, 'এখন তোমার সঙ্গে —চির-বন্ধুত্বের প্রমাণ গ্রহণ কর। উপরে দেখ, আমাদের কুলদেবতা সাক্ষী,—আমরা চন্দ্রবংশীয়,—অন্তর্য্যামী জানেন'—বলিয়া নিজ বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই ছুরিকার ফলায় বক্ষের মধ্যস্থলে একটি তীক্ষ্ণ রেখা টানিয়া দিল। অদ্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত বিক্রম নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে তিলমাত্র বিলম্ব করিল না,—সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজ ছুরিকা ক্ষিপ্রহস্তে আবরণ-মুক্ত করিয়া নিজ বক্ষে ঠিক ঐ প্রকার অনতিগভীর রেখা পাত

করিতেই যে রক্ত বাহির হইল উভয়েই নিজ নিজ বক্ষ হইতে ছুরির ফলায় তাহা উঠাইয়া প্রথমে ফলায় ফলায় মিলাইয়া লইল এবং তর্জ্জনী-অগ্রে সেই তপ্ত রক্ত লইয়া উভয়েই উভয়ের ললাটে গাঢ় দীর্ঘ টীকা পরাইয়া দিল। তারপর রক্তাপ্লুত বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া উভয়েই গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া কতকক্ষণ রহিল।

এইবার অদ্রীর সম্বন্ধে বিক্রমের যাহা কিছু সন্দেহ—সকল সংশয় সম্পূর্ণ ই দূর হইল। পূর্ব্বের সহজ প্রীতি আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল, অন্তরদাহ নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

প্রাতে,—এক প্রহরী সসম্মানে তাহাদের সেনাপতির নিকট লইয়া গেল। সেনাপতি অতীব ভদ্র মূর্ত্তি, প্রৌঢ় এবং স্বল্পভাষী, অথচ তাহার দু'টি চক্ষে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় ছিল। একজন প্রহরী অগ্রসর হইয়া নিকটতম ব্যবধান হইতে, অথচ ইহারা শুনিতে না পায় এমনই ভাবে কিছু কথা কহিল। তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও যে দুই একটা কথা আমাদের এই বন্ধুদ্বয়ের কানে গেল তাহা,— 'মহামাত্যের আদেশ'।

মহামাত্য শব্দটা বিক্রমের কানে যাইতেই নানা প্রশ্ন বিক্রমের মনে উঠিতে লাগিল। যাহা হইবার তাহা এখনই ত' হইয়া যাইবে, হয়ত জানিতেও পারা যাইবে আসল কথা, ভাবিয়া সে স্থির রহিল। অদ্রীকে আর সে দোষী ভাবিতেও পারে না, বরং অদ্রীর নিষ্কলঙ্ক, শান্ত মুখখানি সে যতবার দেখিয়াছে ততবারই তার প্রাণে একটা দুঃখ এই ভাবিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহার নিজ বিদ্রোহ-অপরাধের সঙ্গে সে দৈবগতিকে জড়িত হইয়া তাহারই জন্য নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াছে ,—নিরীহ অদ্রী, আহা !

এখন সেনাপতির সম্মুখে যখন দুই বন্ধু দণ্ড বিধানের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল,—প্রহরী কর্ত্তৃক আনীত একখানি ভূর্জ্জপত্র-লিপি সেনাপতি পাঠ করিতেছিল। উহা শেষ হইলে সে ব্যক্তি অতি ভদ্রভাবে দুইখানি আসন দেখাইয়া তাহাদের আহ্বান করিল এবং তাহারা বসিলে,—কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বিনয় সহকারে বলিল,—'মহামাত্যের এই আজ্ঞা পত্র, অবশ্য রাজমুদ্রাঙ্কিত এই পত্রখানির কথাই বলছি,'—বলিয়া নিজ হস্তস্থিত পত্রখানি দেখাইল ; তারপর বলিল, 'যারপর নাই আশ্চর্য্য হয়েছি এই খানি পেয়ে। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত, যার বিচার-ফল প্রাণদণ্ড। কিন্তু অদ্ভুত, এই পত্রে তিনি আজ্ঞা পাঠিয়েছেন যে, আপনাদের সঙ্গে রাজ-অতিথির মতই ব্যবহার যেন করা হয়। অথচ এটি ব্যঙ্গ নয়, মহারাজের মুদ্রা অঙ্কিত আজ্ঞা। আর আপনারা এখন থেকে শিবিরোদ্যানেই থাকবেন, নির্ভয়ে রাজধানীর সর্ব্বত্রই বিচরণ করতে পারবেন। আপনাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়ে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে আজ্ঞা হয়েছে। নগরের সর্ব্বস্থানেই, যেথা খুসী যাবেন কেবল নগরসীমা অতিক্রম করবেন না,—এইটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাদের। আগামী পরশুদিন আপনাদের প্রতি যা বিধান হবে তা জানতে পারবেন। কারণ আগামী কাল মহারাজের নগর প্রদক্ষিণ উৎসব, রাজকীয় সকল কর্ম্মই বন্ধ আছে।'

শুনিয়া উভয়েই বিস্মিত, নির্ব্বাক, কোন কথা না কহিয়া মৌন সম্মতি প্রকাশ করিল। সেনাপতি আবার বলিলেন,—

'তা ছাড়া আর এক ব্যাপার,—কোন বিদ্রোহ অপরাধের বিচারাধীন বন্দী এখানে রাখবার কথা নয় অথচ প্রথমে আপনাদের এখানে রাখার ব্যবস্থাই হ'ল,—তারপর আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ হয়েছে,—অথচ এই শ্রেণীর অপরাধী যারা তাদের পরিচয় দামামা ঘোষণায় সাধারণের মধ্যে প্রচারের নিয়ম। মহামাত্যের কর্ম্মকৌশল অথবা উদ্দেশ্যভেদ কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি যেটুকু বুঝতে দিয়েছেন তাতেই এইটুকু মাত্র বুঝতে পারচি যে, আপনাদের প্রতি কারো বিশেষ লক্ষ্য না পড়ে, এইটিই মহামাত্যের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। আপনারা এখন শিবিরোদ্যানেই যাবার জন্য প্রস্তুত হোন। একজন কর্ম্মচারী আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসবে। যদি ইচ্ছা করেন ত' আমিও যেতে পারি সঙ্গে।'

অদ্রী বলিল, 'কারো যাবার কোন প্রয়োজন নেই,—আমি খুব ভালই চিনি সে স্থান, এখন আর আমাদের কি করতে হবে ?'

'কিছুই না,—যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন—কোন বাধা নেই, কেবল নগবসীমা অতিক্রম করবেন না। এইটুকু স্মরণ রাখবেন,' বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন শিষ্টাচার সম্মত বিদায় সম্ভাষণান্তে অদ্রী বলিল, 'এখন আমাদের বিদায় দিন। আমরা যে কতটা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে,'—বাধা দিয়া সেনাপতি বলিলেন, 'কৃতজ্ঞতা জানাতে যদি হয় ত' ঐ একজনের কাছে,—তিনি মহামাত্য।

এখন দিবা প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হয় নাই,—তাহারা দ্রুতগতি বাহিরে আসিল। এবার তাহাদের প্রাণে যেন একটা মুক্তির, সচ্ছন্দ, নির্ম্মল এবং স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতে লাগিল ; আজ তিনটি অহোরাত্রের পর,—সেই আনন্দেই যেন তাহারা ভাসিয়া চলিল। কোথায় যে ছিল এ আনন্দ, কোথা হইতে আসিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

সেনাপতির নিকট হইতে অবিলম্বে বাহিরে আসিয়া পড়িল দুই বন্ধু। যখন দেখিল, নিকটে কেহ নাই তখন অদ্রীর কাঁধের উপর দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিয়া বিক্রম চলিতে চলিতে বলিল,—'কি ব্যাপার বলত ?' শুনিয়া অদ্রী এবার আর এক কথা বলিল। সে বলিল, 'কুসুমপুরের মধ্যে যে বিদ্রোহ ব্যাপার

সর্ব্বৈব মিথ্যা তা এখন সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়ে গেল। তারপর এবার এগিয়ে চল বন্ধু! আরও কি রহস্য আমাদের জন্য ধরা আছে, দেখা যাক।'

সেনানিবাসের প্রাঙ্গণে আসিয়া বিক্রম চুপি চুপি কহিল, 'অদ্রী আমি নিশ্চয়ই পলাবো।' শুনিবামাত্র অদ্রীর মুখে একটু আনন্দের রেশ দেখা গেল। সে হাসিয়া বলিল,—'এখানে চুপি চুপি কোন কথা বলো না, সহজ ভাবেই বলবে সব কথা।' শুনিয়া বিক্রম বলিল,—'হাসলে যে?'—অদ্রী বলিল, 'বন্ধু! যমের হাত থেকে বরং চেষ্টা করলে পালাতে পারবে কিন্তু আর্য্য চাণক্যের দৃষ্টিসীমা এড়াতে পারবে না।'

বিক্রম ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া বলিল, 'কেন?' উত্তরে অদ্রী বলিল, 'এ রাজ্যে কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহার শক্তি সবার উপর; দুর্ব্বার—অপ্রতিহত শক্তি যাকে বলে ঠিক তাই-ই, সত্যই অতুলনীয়, তাঁহার তুলনা নাই।'

বিক্রম বলিল, 'একটি কথার উত্তর দাও,—তুমি সেই ভয়ঙ্কর কুটিলের শিরোমণিকে কখনো দেখেছ, তুমি ত' এখানে আগেও দু' একবার এসেছিলে? তাঁর মূর্ত্তিটি কেমন বল ত'—কালান্তক যমসদৃশ কিনা?'

অদ্রী, বলিল,—'না না, মোটেই তা নয় বরং ভারি সুন্দর,—একটি সৌম্য মূর্ত্তি। সত্য, তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। যেমন কাত্যায়ন বলতে একজন মূর্ত্তিমান রাক্ষস বুঝায় না, তেমনি কৌটিল্য বা চাণক্য বা মহামাত্য বলতেও একজন ভয়ঙ্কর বোলে কাকেও বুঝায় না।' শুনিয়া মহা বিস্ময়ে স্তম্ভিত-প্রায় বিক্রম বলিল, 'তাই নাকি?'

অদ্রী দৃঢ়কণ্ঠে, স্পষ্টভাষায় বলিল,—'ঠিক তাই। তা ছাড়া তাঁহার চক্ষু দুটি গভীর রহস্যের আকর। আর আমার মতে সেই দৃষ্টিযন্ত্রের নামই চাণক্য অথবা কৌটিল্য,—। এখানে, এই রাজধানী কেন্দ্র করে সারা সাম্রাজ্যে রাজার বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে,—সেইখানেই তাঁর অব্যর্থ দৃষ্টি। যেদিকেই দেখিনা কেন আমার মনে হয়, সেই দুই চক্ষের দৃষ্টি যেন নিজ চক্ষের সামনেই দেখছি। সেই চক্ষুর্দ্বয় সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকর্ম্মে, রাজ্যের সর্ব্ব বিভাগেই যেন তীক্ষ্ণ লক্ষ্য করছে।' শুনিয়া বিক্রম বলিল, 'আশ্চর্য্য, এ এক বিচিত্র সৃষ্টি বিধাতার!'

অদ্রী বলিল, 'সেই চক্ষুর দৃষ্টি তোমার উপরও অব্যাহত রয়েছে তা হয়ত তুমি জান না এবং তাঁর সম্বন্ধে এক মহাপণ্ডিত এবং কবির উক্তি, শোনো:—'মুহুর্লক্ষোদ্ভেদা মুহুরধিগমা ভাবগহনা, মুহুঃ সম্পূর্ণাদি মুহুরতিকৃশা

কার্য্যবশতঃ। মুহুর্নশ্বদ্বীজা মুহুরপি বহুপ্রাপ্তিফলে, তাহো চিত্রাকারা নিয়তিরিব নীতিনয়বিদঃ।'

শুনিয়া বিক্রম বলিল, 'বিদ্রোহের অপরাধ আমাদের উপর অথচ বলত কেন এখন আমার প্রাণে আর কোনরূপ আতঙ্কের লেশ নাই ;—ইহাও কি সেই অপ্রতিহত দৃষ্টির প্রভাব নাকি ?' শুনিয়া অদ্রী কিছুই বলিল না দেখিয়া সে আবার বলিল,—'যতক্ষণ না মহারাজের শোভাযাত্রা ও নগর প্রদক্ষিণ উৎসবের শেষ হয় ততক্ষণ অভয়, তারপর বিচার ও দণ্ডলাভ। তখন কি আর ঐ অভয় দৃষ্টি থাকবে ?'

অদ্রী এবার বলিল,—'নিশ্চয়ই থাকবে. আমার ত অশুভ কিছুই মনে হয় না। তা যদি হ'ত তা হলে আগে হতেই এতটা স্বাধীনতা আমাদের থাকত না। তোমার প্রতি তাঁর শুভ দৃষ্টি কত গভীর তা জান কি বন্ধু !'

বিক্রম বলিল,—'তুমিই না হয় জানিযে দাও।' অদ্রী বলিল, 'তুমি সম্রাটের আশ্রিত ও অনুগত বন্ধু কোশল রাজবংশের একমাত্র বংশধর, কুলের প্রদীপ ;— তোমার প্রতি তাঁহার অভয়দৃষ্টি না থাকলে রাজদণ্ডে কোশল রাজবংশ বিলোপ, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড বিলোপন ঘটবে, তাঁর ঐ দৃষ্টির মধ্যে যে সে লক্ষ্য নেই, একথা কে বলতে পারে ?'

বিক্রম প্রফুল্ল হইল, বলিল, 'এতটা গভীর যাঁর লক্ষ্য একবার দেখতে ইচ্ছা করে সে মানুষটি কেমন।'

অদ্রী বলিল, 'তোমার সে ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে বন্ধু,—একটু অপেক্ষা কর।'

সকল কথাই বিক্রমের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল, 'অদ্রী, যদিও আমি তোমায় বিশ্বাস করেই আজ এই অবস্থায় পড়েছি, তবুও আমি এখন থেকে তোমাতেই আত্মসমর্পণ করলাম। কেন জানিনা, তোমার প্রত্যেক কথাই আমার মধ্যে একটা নূতন আশা, একটা নূতন সম্ভাবনার পূর্ব্বাভাষ জাগিয়ে দেয়। চল এখন একবার রাজধানীটা দেখে জীবন সার্থক করা যাক। এতদিন কূপমণ্ডুক হয়েই ছিলাম, প্রতিষ্ঠানে বসে বসে মগধরাজ্যকে বিদ্বেষের চক্ষেই দেখে এসেছি,—এখন প্রাণটা বড়ই ছট্‌পট্ করছে,—কুসুমপুরের সকল ঐশ্বর্য্য তন্ন তন্ন করে দেখবার জন্য ;—তুমি সহায় হও।'

বিক্রমের মধ্যে এবম্বিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অদ্রী নিজেকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত মনে করিল ;—এই শুভ পরিবর্ত্তন যাহাতে স্থায়ী হয় তাহাই ইষ্ট দেবতার

নিকট কামনা করিল আর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কল্যাণময় ফল যেন সে মানস-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল।
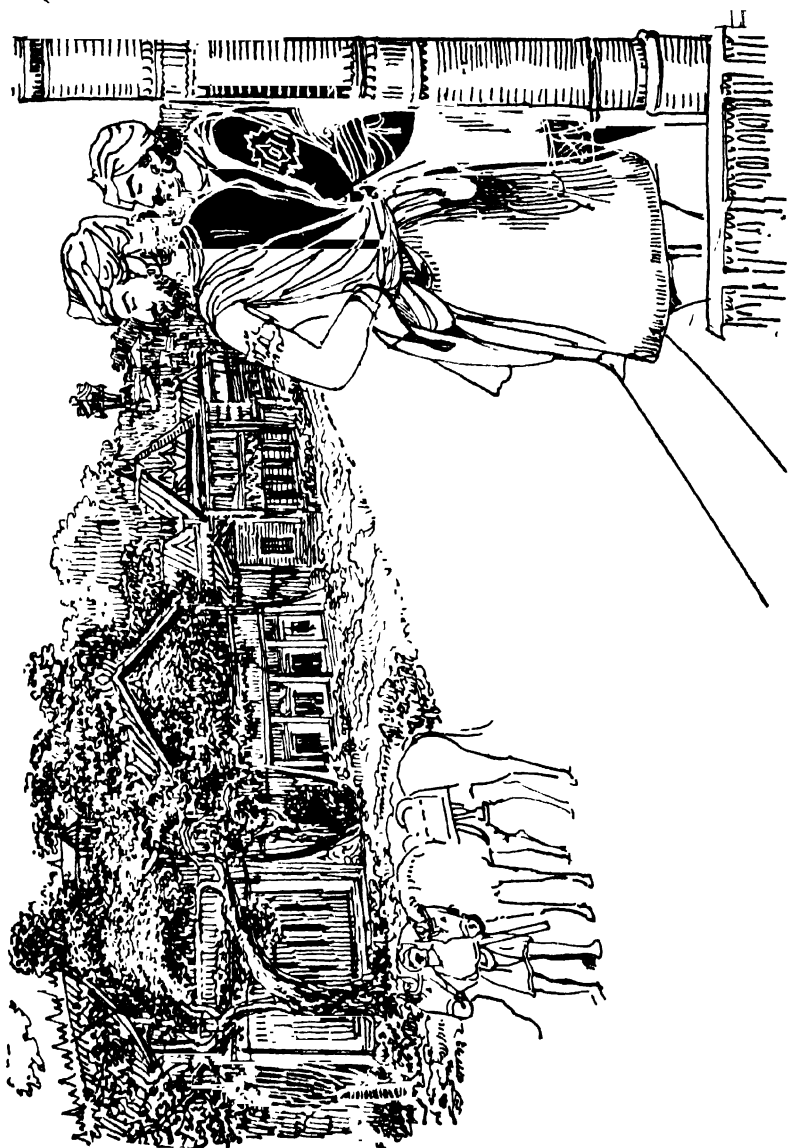
অদ্রী যদিও এখানে পূর্ব্বে দুই একবার আসিয়াছিল, কুসুমপুরের অল্প কতকাংশের সঙ্গে তাহার পরিচয় থাকিলেও ভাল করিয়া সর্ব্বস্থান দেখা হয়

নাই। অতএব এক্ষেত্রে আবার বিক্রমকে ভাল করিয়া দেখাইতে তাহার বিশেষ আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এখন মহা উৎসাহে দুই বন্ধু অগ্রসর হইল।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা তোরণের পথে অগ্রসর হইল। এখন বিক্রম বলিল, 'নগর দেখতে যাব বোলেই যখন এরা আমাদের মুক্তি দিলে তখন কি এই মনে করলে যে আমরা পদব্রজেই সারা নগরটি দেখে বেড়াব? এমন কি আমাদের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কেউ যদি নগর দেখতে চায় আমরা তার জন্য তৎক্ষণাৎ একটা রথ না হয় একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা তখনই করে থাকি।' অদ্রী কোন উত্তর করিল না।

তাহারা তোরণ নিম্নে আসিয়াই দেখিতে পাইল এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ সেনাবিভাগেরই হইবে, দুইটি সুসজ্জিত গান্ধারাশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

দেখিয়াই বিক্রম আপন মনেই যেন বলিল,—'এ দুটা ভাড়া পাওয়া যায় না?'—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অশ্বরক্ষককে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেই উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল,—

'আপনাদের জন্যই আনা হয়েছে। নগরপালের আজ্ঞা,—আপনারা যদৃচ্ছা ভ্রমণ করবেন কিন্তু নগরসীমা অতিক্রম করবার চেষ্টা করবেন না।' শুনিবামাত্র বিক্রম দুই কাণে হাত দিয়া বলিল, 'বাপরে বাপ,—নগরসীমা অতিক্রম নিষেধ শুনতে শুনতে প্রাণটা গেল। ক'রব না, ক'রব না, ক'রব না, তিন সত্য করছি—আর বোলো না—রক্ষা কর।'

এইবার দু'জনে অশ্বারোহণ করিয়া গুটি গুটি মহাকালের মধ্য দিয়া গঙ্গাতীরের দিকে চলিল। পূর্ব্বে এ পথের কতক অদ্রীর দেখা ছিল, বিক্রম বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সকল কিছুই দেখিতে দেখিতে চলিল।

ছয়

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র,—কুসুমপুর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।—তখনকার দিনে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-শক্তির কেন্দ্র, বিশাল জনপূর্ণ, সৌভাগ্য-সম্পদে অতুলনীয়া মহানগরী, শুধু ভারতের নয় বোধ হয় সমগ্র এশিয়া খণ্ডের এবং ইউরোপের অংশবিশেষের আকর্ষণের বস্তু ছিল। তখনকার সভ্যজগতে, প্রত্যেক সভ্যজাতির সহিত ভারতের এই মহাগৌরবময় বিপুল কীর্ত্তিমুখর পাটলিপুত্রের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলাবিদ্যাদি সংস্কৃতি সম্পর্কে সকল দিকেই এই মহানগরীর সহিত সভ্যজগতের ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান চলিত।

যদিও গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমের উপরেই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা তথাপি গঙ্গার তীরে তীরেই ইহা প্রায় সার্দ্ধ চারিটি ক্রোশ দীর্ঘ এবং প্রায় দুই ক্রোশ প্রস্থে বিস্তৃত ছিল, এবং যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আরও বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রধান নগর প্রাচীরের চারিদিকেই প্রশস্ত রাজপথ। কেবল গঙ্গার তীরের পথটি অধিক প্রশস্ত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও প্রশস্ত পথকে 'রাজপথ,'—আর প্রস্থে,—পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পথকে 'মহাকাল' বলিত। গঙ্গাতীরে অতি উচ্চ বাঁধ নগরের শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর তিনদিকে বেষ্টিত অতি উচ্চ নগরপ্রাচীর।

গঙ্গাতীর হইতে মহাকালের মধ্য দিয়া আসিতে দারুময় বিশাল দ্বিতীয় প্রাচীর,—উহা এতটা প্রশস্ত যে, তাহার উপর দিয়া ছয়জন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। উচ্চেও উহা প্রায় ত্রিশ হাত হইবে। তাহার মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধানে স্তম্ভাকৃতি প্রহরাসন,—সেখান হইতে বহুদূর দৃষ্টি চলিত। এই দারুপ্রাচীরের উপর সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত উনষাটটি প্রহরাসন বা স্তম্ভ, সৈনিক প্রহরীরা ঐ সকল স্থান হইতে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিত।

নগর প্রাচীর ও দারুময় এই যে প্রাচীর, এই দুই প্রাচীরের উপযুক্ত ব্যবধানে ছোট বড় চৌষট্টিটি দ্বার ছিল। প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলকসংবদ্ধ বিশাল কপাটযুক্ত, ভিতর হইতে বন্ধ করা হইত। এই দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়াই প্রশস্ত নগর প্রাকার। উহা সর্ব্বদা গভীর জলপূর্ণ থাকিত। গঙ্গার সহিত তাহার যোগ ছিল। তাহার উভয় পার্শ্বেই রাজপথ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপর গৃহশ্রেণী,

নিম্নতলে দোকান। সেই প্রাকারের অল্পদূর ব্যবধানে নগরদ্বার সংলগ্ন এক একটি কাষ্ঠ সেতু—উহা শৃঙ্খলাবদ্ধ, রাত্রে উঠাইয়া পথ বন্ধ করা হইত এবং দিনমানে লোক চলাচলের জন্য ফেলিয়া রাখা হইত। এইভাবে বহিঃশত্রু হইতে মহানগরী সুরক্ষিত ছিল।
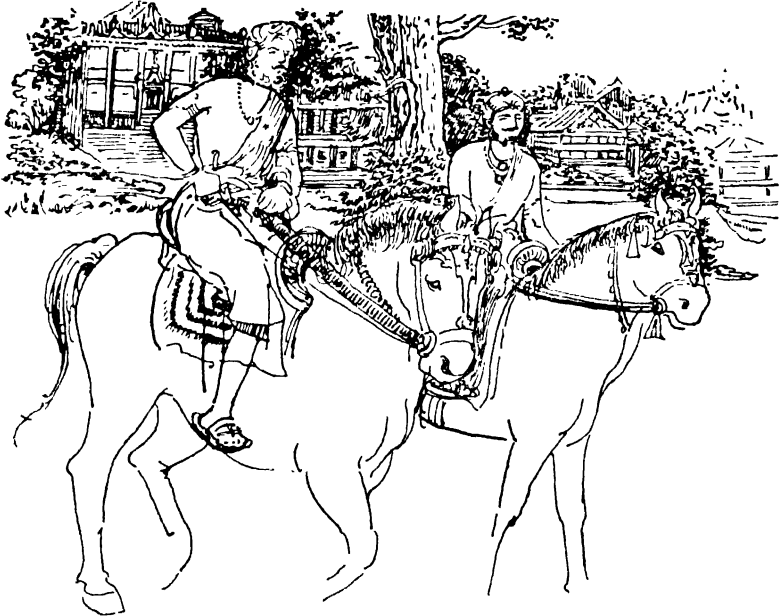
গঙ্গাতীর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাকালের পথে আসিতে আসিতে আমাদের এই দুই বন্ধু—নগর রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইল,—বিশেষতঃ কুমার বিক্রমের বিস্ময়ে মুখে বাক্য সরিল না। প্রতিষ্ঠানপুর হইতে কোশল রাজকুমারের গতি কৌশাম্বি পর্য্যন্ত—ইহার বাহিরে আর যা কিছু দেশভূমি—তাহা তাহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। কারণ, সে কালের রাজপুত্রগণের নিজ রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রথা ছিল না।

তাহারা দেখিতে দেখিতে প্রধান রাজপথ বাহিয়া কেন্দ্রে, দারুনির্ম্মিত বিশাল সপ্ততল ইষ্টমন্দিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তখনকার দিনে ইহা অতুলনীয় ত ছিলই, ধ্বংস না হইলে চিরকালই অতুলনীয় থাকিত। এখন ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজাদি পূর্ব্বেদেশে, এমন কি নেপালেও যেরূপ সূক্ষ্ম কারুপূর্ণ দারুময় মন্দির স্থাপত্য দেখা যায় উত্তর ভারতে তখনকার দিনে প্রায় ঐ ধারাই ছিল। ভাস্কর্য্যে এবং স্থাপত্যে তখন প্রস্তরের বহুল প্রচার হয় নাই যেমন পরবর্ত্তী কালে

হইয়াছিল। তখনও দারুময় স্থাপত্যের যুগ। এই মহাকাল সংলগ্ন মার্ত্তণ্ড মন্দিরটি নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির, স্বয়ং মহারাজ এখানে প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া মার্ত্তণ্ডদেবকে অর্ঘদান করিতেন। তখনকার দিনে কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রত্যহ প্রাতে স্নান এবং মার্ত্তণ্ড অর্ঘ না দিয়া জল গ্রহণ করিত না।

এই মহামন্দিরের চতুর্দ্দিকেই মনোহর পুষ্পোদ্যান, মধ্যে একটি কুণ্ড;—নিত্যপূজার জল গুপ্ত-প্রণালীর মধ্য দিয়া সেই কুণ্ডে গিয়া পড়িতেছে। পুষ্পোদ্যানের প্রশস্ত পথের দুই ধারে নানা জাতীয় পুষ্প-বৃক্ষলতা বহুদূর সারিবদ্ধ—চারিদিকেই পুষ্পবৃক্ষ, মধ্যে হরিৎ বর্ণ তৃণ-সঙ্কুল ক্ষেত্র। প্রস্তর বেদী স্থানে স্থানে ক্লান্ত ভ্রমণকারীকে উপবেশনে আহ্বান করিতেছে। এইরূপ উদ্যান-বেষ্টিত মহামন্দিরের চারিদিকে চারিটি সুউচ্চ কারুখচিত তোরণ, স্থূল দারুস্তম্ভের উপর অবস্থিত। মহানগরীর প্রধান চারিটি রাজপথের মধ্যে তিনটি এই মহামন্দিরের তোরণত্রয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব তোরণে আসিয়া শেষ হইয়াছে। বাকী চতুর্থ বা উত্তর তোরণটি রাজপুরীর মধ্যে যাইবার পথের সঙ্গে মিলিত ও রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ পথে রাজপুরাঙ্গনাগণ এবং মহারাজ স্বয়ং মন্দিরে আসিতেন। মন্দির দেখিয়া কুমার বিক্রমের চক্ষের পলক পড়ে না। শীর্ষে ক্রমোচ্চ সপ্তম তলের উপরিভাগে অপূর্ব্ব সুবর্ণমণ্ডিত কলসে সূর্য্যকিরণের তীব্র উজ্জ্বল দীপ্তি। তাহার উপরে রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা রাজপ্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হইল।

রাজপুরীর শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। প্রাসাদের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে মনোহর উদ্যান, উহার বিস্তার একদিকে দ্বিতীয় দারুময় নগর প্রাচীর পার হইয়া একেবারে গঙ্গা-তীর পর্য্যন্ত। রাজপুরীর পশ্চিম প্রান্তের একাংশেই বহুতর সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত কোষাগার এবং তাহার অল্প ব্যবধানে অনুরূপ প্রহরীবেষ্টিত অস্ত্রাগার। সেথায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। কাজেই, তাহারা ফিরিল।

রাজপুরীর সিংহদ্বার পার হইয়া বহুল প্রহরীবেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহার তিন দিকেই বৃক্ষশ্রেণী। রাজ অনুচরগণ এবং বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী, রাজকার্য্যের জন্য যাহাদের প্রাসাদমধ্যে অবস্থানের প্রয়োজন, তাহার মধ্যে মন্ত্রী, অমাত্য, দৌবারিক, প্রতিহারী ও রাজসহচরগণই প্রধান,—তাহাদের জন্যই এই সকল সুসজ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাস ও আরামের উপাদান পরিপূর্ণ কক্ষসকল। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে বিশাল সভাগৃহ।

এই বিশাল সভাগৃহের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বাহিরের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় দূত এবং

প্রতিনিধিগণ বিস্মিত হইতেন। দীর্ঘ ছয়টি সোপান আরোহণ করিয়া সভাস্থলে উঠিতে হয়। চারিদিকেই স্তম্ভশ্রেণীর উপরে বিশাল চন্দ্রাতপ। স্তম্ভের উচ্চ প্রান্তে বিচিত্র ঝালর, স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সন্নিবিষ্ট, তাহার শোভা বর্ণনাতীত। স্বর্ণ-জড়িত অলঙ্কার শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন যাহার উদ্ভাবনা তখনকার পক্ষেও নূতন এবং দ্রষ্টার চিত্ত আকৃষ্ট করিত, যেহেতু সে বস্তু অন্যত্র দেখা যাইত না। উজ্জ্বল দিবালোকে সেই বিচিত্র কারুখোদিত স্তম্ভশ্রেণী এবং তাহাদের উপর দিকে ঝালর সমূহ যখন পবনস্পর্শে আন্দোলিত হইত, বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। সভাতলে নানা ধাতু এবং বিচিত্র স্বর্ণোজ্জ্বল কারুখচিত প্রান্ত, বহুমূল্য সুকোমল ও সুখকর আসনশ্রেণী সভাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত, সভাকালে সে সকল পূর্ণ থাকিত।

ইরাণ হইতে রাজদূত আসিয়া এই সভাগৃহ দেখিয়া অনুরূপ রচনার জন্য এখানকার শিল্পী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখানকার পরিচালকগণ এই সকল সংবাদ বন্ধুদ্বয়ের গোচর করিল।

কুমার বিক্রম, তাহাদের প্রতিষ্ঠানের সভাগৃহের সঙ্গে তুলনা করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কুসুমপুরের এই ঐশ্বর্য্য কত দিনে, কত স্থান হইতেই সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমানে এমনটি হইয়াছে! এই চিন্তা তাহার মনে প্রথমেই উদয় হইল। তারপর মনে হইল, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত যে সত্য সত্যই আজ ভারতের সম্রাট, এই সভাগৃহই তাহার প্রমাণ। এই কথাই এখন বিক্রম ভাবিতেছিলেন।

বহুবার বৃদ্ধ মহারাজ তাহাকে কুসুমপুর ভ্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু কি যে দুর্ম্মতি তাহার হইয়াছিল যে, বার বার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার মনে দুঃখ দিয়াছেন। দৃষ্টি তাহাদের ক্লান্ত না হইয়া উত্তরোত্তর সতেজ হইতেছিল ;—একটা উত্তেজনা অনুভব করিয়া তাহারা উভয়েই কক্ষ হইতে কক্ষ ও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে তাহাদের যে সকল সুসজ্জিত কক্ষশ্রেণী,—দেখা হইলে, তাহারা অপর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক দল অশ্বারোহী বর্ম্ম চর্ম্মে সুসজ্জিত, এক হস্তে কোষমুক্ত অসি এবং অপর হস্তে বিচিত্র আকারের খেটক, রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় সর্ব্বকালই এখানে উপস্থিত থাকে, কেবল প্রহর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদের দলও বদল হয়। সেই প্রাঙ্গণ পার হইলে দ্বাদশ প্রহরীরক্ষিত একটি বিশাল তোরণ, তাহার দারুময় স্তম্ভ দুটিতে নানালঙ্কার সন্নিবিষ্ট যক্ষ-যক্ষিণী মূর্ত্তি খোদিত,—দুই বন্ধুর নয়ন গোচর হইল,—উহা অন্তঃপুর তোরণ।

উহা পার হইয়া বিস্তৃত অলিন্দ্যবেষ্টিত চত্বর,—মধ্যে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ,—আসলে উহা একটি ক্ষুদ্র উদ্যানই—ইহার তিন দিকে কক্ষশ্রেণী, তাহার মধ্যে পরিচারিকা, করঙ্কবাহিনী, ধাত্রী, সহচরীবৃন্দ প্রভৃতি অন্তঃপুরিকাগণের বাসস্থান। রাজপুরীতে কর্ম্মকালটুকুই থাকার অধিকার,—তাহাদের অবসর কালে রাজপুরীর বাহিরে নিজ গৃহে যাইতে হইত, তখন অন্য দল আসিয়া আশ্রয় লইত। তাহার উপরে দ্বিতলেও ঐরূপ কক্ষশ্রেণী,—তাহা অবসর কালে মহারাজের নারী শরীর রক্ষিগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। গৃহশ্রেণী সন্নিবিষ্ট এই প্রাঙ্গণের ঠিক অপর পার্শ্বে দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ, সকলগুলিই চমৎকার সুসজ্জিত, এই কক্ষসমূহ রাজপরিবার-বর্গের জন্যই। তাহার অপর পার্শ্বে পুষ্পবাটিকা,—দারুময় স্তম্ভশ্রেণী-সংযুক্ত বিস্তৃত চত্তর ও অলিন্দ্য অতিক্রম করিয়া পুষ্পবাটিকায় আসা যায়। নানা জাতীয় পুষ্পের সুগন্ধে দিবা এই প্রথম প্রহরান্তেও রাজপুরী আমোদিত রহিয়াছে। এই অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের মধ্যে ছোট একটি কারুশিল্পে সমৃদ্ধ মন্দির;—উহা কুসুমায়ুধ মন্দির—মহারাজ উদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উহা একটি পুরাতন কীর্ত্তি।

বহুল সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত রাজ অন্তঃপুরের পশ্চাতে এই মনোহর উদ্যান নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সুরম্য উদ্যানের রাজপুরী-সংলগ্ন প্রাচীর—পশ্চাতে অগণিত পুরীরক্ষী সৈন্যগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান। এখানে নগর-প্রাচীরের দ্বার একটি দ্বাদশ প্রহরী-রক্ষিত—তাহার একটি কপাট বন্ধ থাকিত,—উহার পরেই রাজপুরীর অশ্বশালা। তাহাতে নিত্য রাজকার্য্যে, ব্যবহার্য্য একশত উৎকৃষ্ট আরব সৈন্ধব ও গান্ধার অশ্ব রক্ষার ব্যবস্থা আছে, অশ্বপালকগণের বাসস্থান তাহার পার্শ্বেই, উদ্যান-প্রাচীর সংলগ্ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে।

রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া তাহারা মহানগরীর উত্তর অংশে, যেদিকে রাজপুরোহিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন সেই দিক দিয়াই যাইতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রিগণের গৃহ, অমাত্যগণ, রাষ্ট্রিক, প্রাড়্‌বিবাকগণের গৃহ সকল পৃথক পৃথক উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। এই সকল গৃহ রাজপ্রদত্ত,—তাহাদের কর্ম্ম অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত এই অংশে বিস্তর ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণ-পল্লী গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত;—তাহার পর বিস্তৃত অংশে রাজকর্ম্মকার, অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্মাদি যুদ্ধোপযোগী প্রহরণ সকল নির্ম্মাণকারী শিল্পিগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। ইহার পরেই পথে রত্নবণিকগণের সুরক্ষিত গৃহসকল সন্নিবিষ্ট পল্লী, রাজপথের উভয় পার্শ্বেই অবস্থিত। তাহাদের বিশাল অট্টালিকা

দ্বারগুলির দুই পার্শ্বে তীর ও ধনুর্দ্ধারী প্রহরী। তাহাদেরই নিযুক্ত এই সকল দ্বারপাল দিবারাত্র প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে প্রশস্ত দীর্ঘ চত্বরে নিজ নিজ আসনে বা লঘু খট্টায় অবস্থান করিতেছে।

কিছু দূর যাইতেই ছোট একটি বাজার—প্রত্যেক চারিটি পল্লীর মধ্যে একটি করিয়া বাজার। ইহা ব্যতীত, দীর্ঘ মহাকাল ও রাজপথের দুই ধারেই ঘন সন্নিবিষ্ট পণ্যবীথি। ছোট বড় মিলিয়া মহানগরে প্রায় বত্রিশটি বাজার, তাহার মধ্যে পশ্চিম ভাগে যেখানে ব্যবসায়িগণের ঘন বসতি,—রাজপথ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি পথে এ পল্লীতে আসা যাইত। মহানগরের এই অংশ দিনমানে সর্ব্বদাই কোলাহলপূর্ণ থাকে। ইহার পার্শ্বেই বস্ত্র ব্যবসায়িগণের বিস্তৃত পল্লী। ঐরূপই ঘন সন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী—চারিদিকেই দেখা গেল,—মধ্যে একখণ্ড উন্মুক্ত ভূমি,—প্রাঙ্গণ মধ্যে এক বিশাল প্রাচীন বট-বৃক্ষ, তাহার তলে ঐ পল্লীর বালক-বালিকাগণ মহানন্দে খেলা করিতেছে। বোধ হয়, প্রত্যেক বিশিষ্ট পল্লীতে প্রশস্ত মুক্ত স্থানে একটি করিয়া আতুরাশ্রম। এই সকল আশ্রম বিদেশী, বিপন্ন, সহায়-বন্ধুহীন জনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু আসলে সেখানে ভদ্র কেহ যাইত না,—ঐ পল্লীর গৃহহীন দুঃস্থ বৃদ্ধ ভিক্ষুকেরাই বাস করিত।

ইহার পরেই একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত স্থান—সেই প্রাচীরের বাহিরে গৃহশ্রেণী—তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান চারিদিকেই—মধ্যে একটি বিশাল দ্বারপথ,—তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ অঞ্চলের পশুশালা দেখা গেল। এখানে নিত্য রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হস্তী কয়েকটি, প্রায় শতাবধি অশ্ব, গো, মহিষ, অশ্বতর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগুলির বিশ্রাম স্থান। তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি বিশাল বট ও অশ্বত্থ মিলিত বৃক্ষ, বহুদূর অবধি তাহার শীতল ছায়া। পশুগণের জলপানের জন্য পৃথক পৃথক কুণ্ড, পাথরে বাঁধান কুণ্ডলিকা শীতল জলে পূর্ণ রহিয়াছে। পৃষ্ঠে আরোহী লইয়া কয়েকটি অশ্ব জলপান করিতেছে দেখা গেল। মহারাজের নিজ ব্যবহার্য্য তিনটি সুবৃহৎ এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটি গজ তাহার নাম মহেন্দ্রবারণ এইখানেই থাকিত। যুদ্ধের জন্য অশ্ব ও হস্তিশালা নগর-প্রাচীরের বাহিরে ক্রোশার্দ্ধ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।

দেখিতে দেখিতে তাহারা পশ্চিমাংশে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে ক্ষত্রিয় বীরগণের ঘন বসতি। তাহাদের মধ্যে সেনাপতি ও মহাবলাধিকৃত,—সর্ব্বরথীর গৃহ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই পল্লীতেই অদ্রীর ভগিনীপতি প্রবীর বর্ম্মার গৃহ, কিন্তু অদ্রী এখন সেদিকে বড় লক্ষ্য করিল না।

একটি সুন্দরী নারী ছোট একটি শিশুর হাত ধরিয়া অপর হস্তে কক্ষস্থ ধাতুনির্ম্মিত কলস লইয়া বোধ হয় ইঁদারা হইতে জল লইয়া যাইতেছিল,—পথিমধ্যে অশ্বারোহণে কুমার ও অর্দ্রীকে দেখিয়া, দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—ততক্ষণে তাহারা খানিকটা অগ্রসর হইয়া পথের বাঁদিকে পল্লীপ্রাঙ্গণে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শীতল ছায়ায় দাঁড়াইল ;—কেহ যে তাহাদের দেখিতেছে, তাহারা লক্ষ্যই করে নাই।

উভয়ের বেশভূষা কোশলে প্রচলিত জাতীয় এবং সামাজিক পোষাক। কোশলের বা প্রতিষ্ঠানের উষ্ণীষ বাঁধিবার রীতি ভিন্ন, তাহা ছাড়া উভয়ের কতকটা যোদ্ধবেশ। মাথায় উষ্ণীষ এবং বুকে উরস্ত্রাণ, তাহার উপরে উত্তরীয়, কোমরবন্ধে তরবারি নাই কেবল একখানি কীরিচ কোষবদ্ধ আছে। পায়ে স্থূলচর্ম্ম পাদুকা। অবশ্য কর্ণে কুণ্ডল, নিম্নহস্তে সুবর্ণবলয় এবং উপর হাতে কবচ নাই, কেবল কেয়ূর, যাহা নিত্যকার ব্যবহার্য্য অলঙ্কার তাহা আছে।

যে রমণী শিশু সঙ্গে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল,—সে একটু দ্রুত চলিয়া নিকটস্থ একখানি শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই শিশুকে ছাড়িয়া দিল। অল্পক্ষণেই এক পরিণত যৌবন হৃষ্টপুষ্ট পুরুষের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া যে দিকে দুই বন্ধু গিয়াছে সেইদিকে দেখাইয়া দিল। তখন দুজনেই চলিল সে দিকে। স্বচ্ছন্দ দ্রুতপদসঞ্চারে তাহারা একেবারে সেই পল্লী প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে আমাদের নায়ক দুইজনে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই প্রিয় প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছিল, সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কুমার বিক্রমের পদস্পর্শ করিয়া, প্রতিষ্ঠান রাজকুমারের জয় উচ্চারণ করিল। তার পরেই অর্দ্রীকেও ঐরূপ পদস্পর্শ করিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই কুমার প্রীতি মিশ্রিত বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, আঃ হাঃ ভদ্র মদনবট্ট,—তুমি এখানে যে ? ততক্ষণে প্রফুল্লমুখে রমণীও করজোড়ে উভয়কেই নমস্কার করিল, পাদস্পর্শ না করিয়া। জোড় হাতে তাহারাও, অর্দ্রী ও কুমার, তাহার নমস্কার প্রত্যর্পণ করিল ও বলিল,—তুমি এখানে সস্ত্রীক আছ দেখছি, কতদিন প্রতিষ্ঠান ছেড়েছ ? তোমার বাবা, ভদ্র নকুলবট্ট কোথায় ?

তখন জোড় হাতে মদন বলিল, যুবরাজের জয় হোক। একবার আমাদের ঘর পদরেণুতে পবিত্র করবেন দাসের এই আকাঙ্ক্ষা,—সেইখানেই সব কিছু শুনবেন। আজ আমাদের সুপ্রভাত—

কুমার অদ্রীর দিকে চাহিল। অদ্রী তখন মৃদু, ঘনিষ্ঠ কোমল কণ্ঠে বলিল,—ছাখো রট্ট! আজ আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরো না, এখন ছেড়ে দাও,—আমরা প্রচ্ছন্নভাবেই এখানে আছি—কাল আর পরশু, দুটি দিন পর আমরা স্বীকার করছি তোমার ঘরে আসবো, কিছুক্ষণ থাকবো আর তোমার সকল কথাই শুনবো। আজ কেবল তোমাদের গৃহখানি আমাদের দেখিয়ে দাও।

সময়টা অনুকূল নহে বুঝিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রট্ট,—যথা আজ্ঞা—বলিয়া অগ্রসর হইল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা যখন পদব্রজে যাইতে প্রস্তুত হইল তখন মদন আসিয়া দুই হাতে তাহাদের অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া বলিল, চলুন। তখন কুমার এবং অদ্রী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মদন রট্টের স্ত্রী ভামা, তাহার স্বামীর সঙ্গে মিলিল না, সে দৃঢ়ভাবেই নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে মধুর সে হাসি নাই। সে অদ্রীর কথা শুনিয়াছিল যে তাহারা আজ তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিবেন না শুধু স্থানটী দেখিতে যাইতেছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদ্রীর পানে চাহিয়া সে যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল ; তাহা দেখিয়া অদ্রী, মদনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মদন, সামলাও তোমার গৃহিণীকে,—ও অপমানিতা মনে করছে। ওকে বুঝিয়ে দাও আমাদের পক্ষে এখন তোমাদের ঘরে গিয়ে আনন্দ উৎসব নিয়ে থাকা সম্ভব নয়,—দুদিন দেরী করতেই হবে।

শুনিয়া মদন বলিল, ঐ ভামাই যে প্রথমে আপনাদের দেখেছিল আর আমায় ডেকে নিয়ে এল কিনা, তাই, ও একটু হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। তারপর ভামার দিকে তীব্র রোষ দৃষ্টি হানিযা বলিল, অতটা ঠিক নয়, ওগো ভদ্রে ভামা! ঘরে গিয়ে তোমায় ভাল করেই বুঝিয়ে দেব আজ,—এখন এস সঙ্গে। এখানে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শুনিবামাত্র সুড় সুড় করিয়া ভামা তাহার স্বামীর পার্শ্বে আসিল—তখন তাহারা চলিল। পথের দুই চারিটি ঐ পল্লীবাসী ভদ্র শিশু-সন্তান যাহারা খেলা করিতেছিল তাহারা এই দুইজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভিন্ন দেশীয় যুবাকে দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঐ সব চলিতেছিল রাজকুমারদ্বয় দেখিলেন তাঁহাদের সম্মুখে বাম দিকেই অঙ্গনের মধ্যে বসিয়া রট্টের নিজ দুইটি সন্তান মহানন্দে পরস্পর প্রীতিপূর্ণভাবে খেলায় মত্ত। তাহারা কেহই পিতামাতার ব্যবহার লক্ষ করিতেছে না,—তবে মধ্যে মধ্যে এই দুই অপরিচিত অশ্বারোহীর দিকে চাহিতেছে আর যেন নিজেদের মধ্যে তাঁহাদের পরিচয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উভয়েই রাজকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে ওরা যে চমৎকার নিজ নিজ

কর্ম্মে ব্যস্ত—তাহা বিশেষ লক্ষ করিয়া বিক্রম যতটা না হউক অর্দ্রী অধিক প্রীত হইল এবং পায়ে পায়ে উহাদেব দিকে অগ্রসর হইয়া আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া,

নিকট হইতে উহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে ব্যগ্র হইল। যাহা হউক মদনরট্টের গৃহ দেখা হইলে অর্দ্রী অশ্বারোহণের পূর্ব্বে মদনকে একান্তে লইয়া এবং ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে হাত রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—রট্ট, স্ত্রীকে প্রহার করা তোমার অভ্যাস আছে না কি ?

রট্ট মৃদু হাসিয়া বলিল,—দেবতা সাক্ষী ! মাঝে মাঝে একটু আধটু দিতে হয় বৈ কি ? ওর বাপের বাড়ীর বড় জাঁক কিনা তাই যখন বড় বেশী মান দেখায়, তা শোধরাতে মধ্যে মধ্যে একটু পৌরুষ দেখাতে হয়। কিন্তু,—প্রভু !—তবে—ও মেয়েটি ও—

অর্দ্রী বলিল, ও-ও মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দেয়, এই কথাই কি বলতে চাইছ ? হাসিয়া রট্ট তাহার হাতের উপর গভীর একটা দাগ দেখাইয়া দিল। অর্দ্রী বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলিল, উঃ অস্ত্রাঘাত ? রট্ট বলিল, না প্রভু ! তার চেয়েও বোধ হয় তীক্ষ্ণ,—দংশন। শুনিবামাত্র অর্দ্রী ঘোড়ায় উঠিয়া পেটে তাহার পায়ের গোড়ালির গুঁতা মারিয়া রট্টকে বলিল, তাহলে আব তোমায় কিছু বলবার নেই মদন ! আচ্ছা, দুদিন পরে কেমন ?—শান্তি থাকুক তোমার ঘরে।

যাইতে যাইতে কুমাব বলিল, আচ্ছা বুড়ো নকুলরট্ট আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারী ছিল না রাজপুরীতে ? অর্দ্রী বলিল, হ্যাঁ, তার ছেলে ঐ মদন ছিল প্রতিহারী। গত বছরে শ্বশুরের বিষয় অধিকার করতে এখানে এসেছিল। তখন থেকেই এখানে আছে। বুড়োও আছে ছেলেরই কাছে বোধ হয়। ঐ একটিই ত ছেলে তার।

সাত

এই অংশে, বহুধাবিভক্ত পল্লীমধ্যে সাধারণ ক্ষত্রিয় বেতনভোগী স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহস্থ অথবা রাজপুরীতে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত সৈন্য ও নায়কগণের অবস্থিতি। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় বিশিষ্ট মল্লগণও এখানে কেহ নিজ গৃহে, কেহ বা রাজদত্ত গৃহে বাস করে।

সাধারণ সৈন্যগণ অধিকাংশ গ্রামেই থাকিত, প্রয়োজন মতে একত্রিত হইত। স্থান বিশেষে সেনাপতির আজ্ঞায় এবং মহাবলাধিকৃতের নির্দ্দেশেই তাহাদের যুদ্ধকালেই আসিতে হইত। এই মহানগরে যাহারা থাকিত তাহারা অবসর কালে নানা কর্ম্মেই নিযুক্ত ছিল। এই পল্লীতেই রাজকর্ম্মে নিযুক্ত রথীও তাহাদের নিজ নিজ রথ সমূহের জন্য ছত্র ও অশ্বগণ সহ বাস করিয়া থাকে। তাহার পর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থপতিগণ, দারু-ভাস্কর, রজ্জুকার, যন্ত্র নির্ম্মাতা কর্ম্মকার, রথ নির্ম্মাতা, লৌহকার ও সূত্রধরগণের কর্ম্মশালা। রাজপথের অপর পার্শ্বে ঘন বিস্তৃত পল্লীর অপর দিকে কুম্ভকার, চিত্রকর, পটুয়া প্রভৃতি মৃৎশিল্প ব্যবসায়িগণের পল্লী। এইখানেই মহাকাল ও রাজপথ মিলিয়াছে—চৌমাথায় ঘন জনসমষ্টির অবিরাম যাতায়াত। তারপরে রাজপথের একদিকে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণীর সম্মুখেই বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতাগণের দোকান বা কর্ম্মক্ষেত্র বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পথের অপর দিকে সম্মুখভাগে নানা বিচিত্র বর্ণে সুসজ্জিত দোকানশ্রেণী, তাহার পশ্চাতে তন্তুবায় পল্লী বহুদূর বিস্তৃত। তারপরেই পুত্তলিকা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আকারের নানা মূর্ত্তি দারু ও মৃতশিল্পিগণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য চিত্র ও পুত্তলিকা মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধু চলিয়াছে। এখনও ক্লান্তি আসে নাই তাহাদের মধ্যে।

ইহার পর গো-পালকগণ তাহাদের গো-মহিষাদি লইয়া ভিতরে থাকে আর পথপার্শ্বে মোদক—নানাপ্রকার শুষ্ক খাদ্য ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত-কারী মিঠাইওয়ালার দোকানশ্রেণী। গৃহগুলির মধ্যে চিত্র গৃহ-ভিত্তিতে শোভা পাইতেছে। পথের উপর কাঠের সরু সরু থামগুলি, সোনালী রূপালী পতকে মোড়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেই সকল পার হইলে কতকটা ফাঁকা জায়গা—সেখানে দূর পল্লী হইতে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের মেলা প্রতি পর্ব্ব উপলক্ষে ত হয়ই এবং সপ্তাহে দুই দিন করিয়া বসিয়া থাকে। বহুতর বেদী

শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তুত আছে—সেখানে তাহারা নিজ নিজ দ্রব্যসমূহ সাজাইয়া রাখে; পর্ব্বকালে উহা প্রশস্ত হয়, তখন এখানে বহুতর লোক সমাগম হইয়া থাকে। ইহার পরেই মহারাজের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণকার্য্যের বিরাট কর্ম্মশালা। সেখানে খড়্গ খেটকাদি, ভল্ল, ভিন্দিপাল, তোমর নালীক, ক্ষেপনি-বাটুল, দণ্ড, গদা প্রভৃতি বহু প্রকারের যুদ্ধ অস্ত্র ও অপরাধিগণের দণ্ডহেতু যন্ত্রাস্ত্রসমূহ নিত্য প্রস্তুত হইতেছে; বহুদূর ব্যাপিয়া তাহার শব্দ পথিকগণের কানে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই কর্ম্মশালা দেখা সম্পূর্ণ হইলে নিকটস্থ ধর্ম্মমন্দির হইতে তৃতীয় প্রহর ঘোষিত হইল।

এইবার অদ্রী ও কুমার দুই জনেই ক্লান্ত হইয়া এক পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিয়া অল্প বিশ্রামান্তে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল। নট, নটি, নর্ত্তকী, শূদ্রগণ, লবণ ব্যবসায়ী মহাজন, মাদক ব্যবসায়ী, যাদুকর, জুয়ার আড্ডা এই দিকে। তারপর বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কারুশিল্পিগণ এবং বারাঙ্গনাগণের সমৃদ্ধ পল্লী,—সে পল্লীর শোভা ও পরিচ্ছন্নতা অন্যান্য সর্ব্বপল্লী হইতে সুন্দর এবং লক্ষ্যণীয়। এইখানেই কুসুমপুরের বিখ্যাত কুসুম তোরণ যাহা প্রসিদ্ধ ধনবান বিলাসী যুবা ও বণিক সম্প্রদায়ের নৈশ লীলা-স্থল। তাহার পরেই চর্ম্মকার পল্লী। বিবিধ চর্ম্মবাদ্য নির্ম্মাণকারী এবং গোহার ইত্যাদি চর্ম্মশিল্পগণের বিশেষ ধন ও বিস্তৃত পল্লী। এখানে সহস্রাধিক চর্ম্মকার নানাবিধ বর্ম্ম, চর্ম্ম, যুদ্ধোপকরণ, নানাবিধ বন্ধনী, অঙ্গুলিত্র প্রভৃতি যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণে তৎপর। তারপর সেই পথ শেষ হইয়াছে গঙ্গাতীরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী ধীবর পল্লীতে। আমাদের নায়ক দুইটি আর সেদিকে না গিয়া গঙ্গাতীরে, বাঁধের পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিল। বাঁধের নীচে যে প্রশস্ত পথ তাহার দু'দিকেই দোকান,—মধ্যে মধ্যে বাঁধ হইতে প্রায় পঁচিশটি সোপান নামিয়া পথে আসিতে হয়, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া বাঁধের সোপান অতিক্রম করিয়া অনেকেই রাজপথে বিপণীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

বিক্রম বলিল, চল অদ্রী, ঐ উঁচু বাঁধের উপর উঠে দেখি। প্রসিদ্ধ সঙ্গম আমাদের প্রয়াগের তুলনায় কেমন দেখা যাবে। দুজনেই বাঁধের নীচে একটি বৃক্ষকাণ্ডে অশ্ববল্গা বাঁধিয়া পায়ে পায়ে বাঁধের উপর উঠিল। আঃ, বলিয়া বিক্রম দৃশ্যমধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই মগ্ন হইয়া গেল। কি বিশাল এই সঙ্গম, গঙ্গা ও শোনভদ্র,—কাহারও কোন চিহ্ন নাই,—তাহাদের সম্মুখে কেবল এক দুস্তর
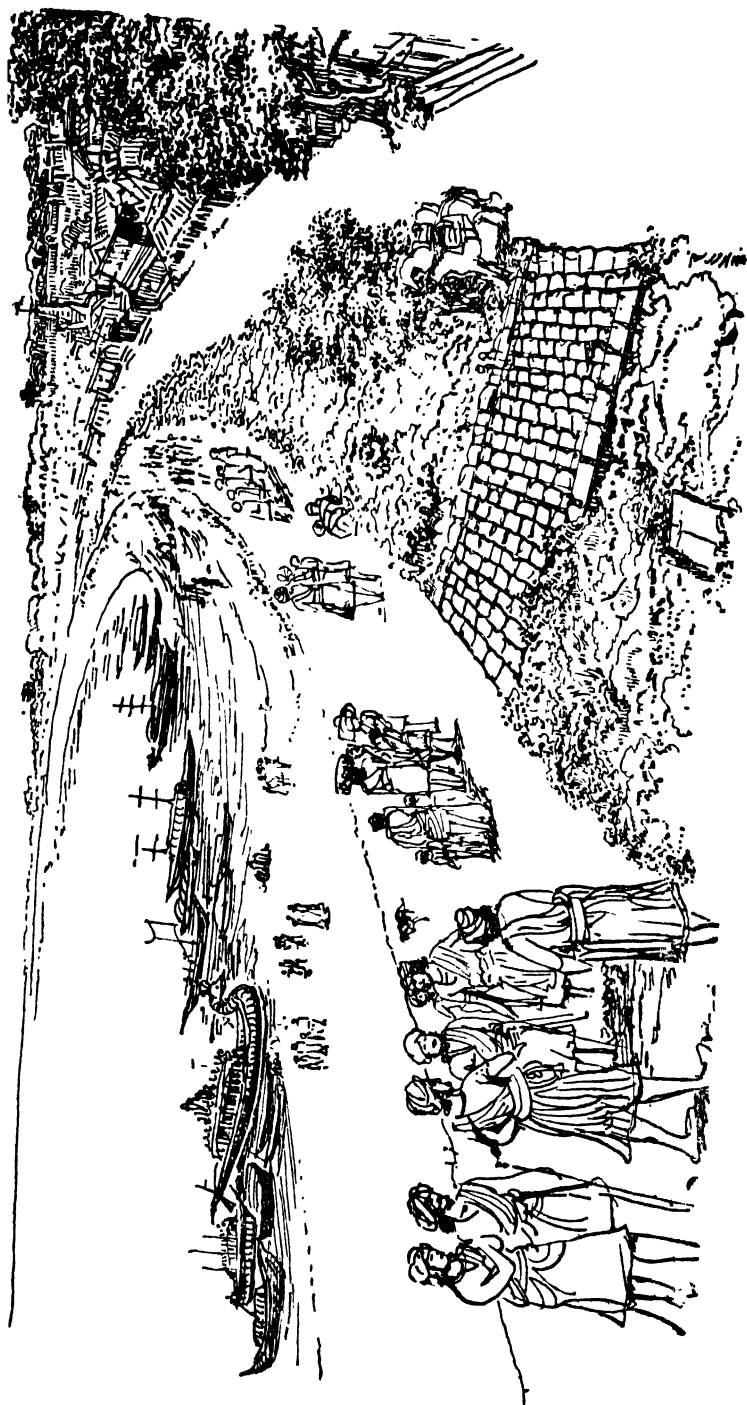
পারাবার। বর্ষাশেষে, এই শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিক্ষণে, এক অকুল, অখণ্ড জলরাশি সমুদ্র মনে করাইয়া দেয়, যদিও উভয়ের মধ্যে কেহই সমুদ্র দেখে নাই। অল্পক্ষণেই দৃষ্টি তাহাদের বাঁধের নীচে ঘাটের দিকে পড়িল; অসংখ্য নৌকা এক দিকে। পার্শ্বেই স্নানের ঘাট, সেখানে বহু নরনারী স্নান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাহারা চলিল। বাঁধের উপরেও লোক চলাচল কম নয়।

এক জায়গায় কয়েকজন নাগরিকের জটলা। একখানি ময়ূরপঙ্খী নৌকাই তাহাদের লক্ষ্য। দূরেও বটে, আবার অতটা নীচে জলের উপর ঐ অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্র-কারুপূর্ণ নৌকাখানি এতটা ব্যবধান হইতেও সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধবর্ণ জ্যোতি ছড়াইয়া দ্রষ্টাকে মুগ্ধ করিতেছিল। দর্শকগণের চিত্ত শুধু অভিনব ঐ তরণীর রূপশ্রী দেখিতেই মগ্ন ছিল না, উহার অধিকারী কে হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও নানা মন্তব্য প্রকাশ চলিতেছিল তাহাদের মধ্যে।

একজন বলিল, আজই নূতন দেখচি নৌকাখানি, আগে ত' দেখিনি। অপর একজন তাহাকে সমর্থন করিল, বলিল, বোধ হয় মহারাজের সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য নূতন তৈরী হয়েই এসেছে। রাজপুরীর মধ্যে কারো হবে, নিশ্চয়ই; বলিয়া অপর একজন, তাহার অনুমান যে সত্য ব্যতীত মিথ্যা হইতেই পাবে না, এইভাবে বুক ফুলাইয়া, চক্ষু দুইটি সঙ্কুচিত করিয়া নৌকার পানে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময় পিছন হইতে—না বন্ধু! তোমার অনুমান ঠিক হ'ল না। বলিতে বলিতে দীর্ঘ শরীর, প্রিয়দর্শন, গৌরবর্ণ এক যুবা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অতীব সৌখীন নাগরিকের পরিচ্ছদ তাহার, কর্ণে কুণ্ডল, তাহার মধ্যে দীপ্তিশালী মরকত খণ্ড। বলয়, কেয়ূর-সকল অলঙ্কারই রত্নমণ্ডিত। কণ্ঠহারের মধ্য-মণিটি বৈদূর্য্য, তাহার দীপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনামিকায় অঙ্গুরীতে মাণিক সংলগ্ন, ললাটে এবং অঙ্গে স্রক চন্দন কুঙ্কুম কর্পূরাদি বিলেপন, সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। চক্ষু দুইটি তাহার অতীব কমনীয় এবং আয়ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ঘন পত্রযুক্ত,—চক্ষে তাহার গোলাপী আভা, বোধ হয় যেন দুই এক পাত্র মাগধী মধু পান করিয়া আসিয়াছে। স্ফূর্ত্তিতে চঞ্চল, অথচ তাহার মধ্যে সংযমও প্রচুর, দেখিয়া আমাদের বন্ধুদ্বয় বুঝিল, ঐ যুবা অভিজাত অথবা সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশের।

এখন মৃদু মৃদু হাসি-মাখা মুখে সে এমন ভাবে কটি পার্শ্বে বাম কর মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়া আরামের ভঙ্গীতে সবার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সবার সঙ্গে মিলিয়া ঐ

চিত্রিত তরণীখানির দৃশ্য উপভোগ করিতে নিবিষ্টচিত্ত হইল—যেন ঐ নৌকার অধিকারী সম্বন্ধে এখনিই যে একটি কথার প্রতিবাদ করিয়াছে, উহা প্রকাশ করিবার দায়িত্ব যে তাহারই এই কথাটা মনেই নাই। ইহাতে সবাই একটু বিস্মিত হইল। সকলকার দৃষ্টি এখন তাহার উপরেই নিবদ্ধ। এমন সময়ে,—এই যে আর্য্য গাণপৎ! তুমি এসেছ দেখছি,—বলিতে বলিতে অপর একটি যুবা আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। উভয়েই এক শ্রেণীর এবং পরম বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, তাহা উপস্থিত সবাই অনুমানে বুঝিল।

তাহাকে দেখিয়া ও কথা শুনিয়াই যেন গাণপতের চমক ভাঙ্গিল, সে বলিল, কৈ, ইলা, কণকা, মেনকা কোথা?—তুমি একা কেন, ধুন্ধু?

ধুন্ধু বলিল,—সারঙ্গী বরদান্, ভারুয়া তাটজঙ্গ, এদের সঙ্গে ইলা, কণকা ও চম্পা আগেই নৌকায় পৌঁছেচে,—জানো না? চল দেখি; বলিয়া গাণপতের হাতে হাত মিলাইয়া নামিতে আহ্বান করিল। উভয়েই কথা কহিতে কহিতে নামিতেছে। এতগুলি লোকচক্ষে তখন দূর হইলেও দেখা গেল, সেই নৌকার মধ্যে সামনের দিকে চিত্রিত রেশমের ঝালর তুলিয়া অপরূপ লাবণ্যবতা এক তন্বঙ্গী আবির্ভূতা হইল—মুখে তাহার মৃদু হাসি।

জটলার দর্শকগণের মধ্যে একটা কৌতূহল, ইহারা কে, ঐ নৌকার সঙ্গেই বা ইহাদের সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্নই যেন সকলকার মুখে ধ্বনিত হইতেছিল। এমন সময়ে এক মালাকার, একটি সুন্দর চাঙ্গারীতে অনেকগুলি পুষ্পমালা আরও কত কি সাজাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর ঐ পঙ্খী নৌকার দিকে দেখিয়া এবং অগ্রগামী বন্ধুদ্বয়েরও গতি সেই মুখে লক্ষ্য করিয়াই তাড়াতাড়ি সেই দিকে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দর্শকগণের একজন আসিয়া তাহাকে বলিল, দাঁড়াও একটু ভদ্র, একটি কথা আছে। সে দাঁড়াইল।

বল্‌তে পার, ঐ নূতন নৌকাখানি কার, আর ঐ দুজন শ্রীমানই বা কাহারা ?

ও, হো,—ওঁদের চেন না ? ঐ যিনি আগে যাচ্ছেন উনি মহাবলাধিকৃত বলভদ্র দেবের একমাত্র পুত্র আর্য্য গাণপৎ দামোদর,—দ্বিতীয়টি তাঁর বন্ধু,

সহচর, ধুন্ধু সহদেব। ঐ নৌকা আজ তাঁরই, নূতন প্রস্তুত হয়েছে, ওঁর প্রিয় সখী, নায়িকা ইলা, কণকা প্রভৃতিকে নিয়ে আজ নৌ-বিহার হবে, তাই এই পুষ্পমালা সজ্জাদি নিয়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই তৃপ্ত হইয়া গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। আমাদের দুই বন্ধুও আরও কতক দূর যাইয়া অবতরণ করিল যেখানে তাহাদের অশ্বদ্বয় বাঁধা আছে।

এই বাঁধের নিম্নস্থ পথের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাগ পুষ্পব্যবসায়ী ও মালাকারগণের দোকানশ্রেণী। এ অঞ্চলে এইটিই বড় পুষ্পব্যবসায় ক্ষেত্র। মহাকাল মন্দিরের পার্শ্বেই একটি পুষ্পবিপণী আছে—উহাতে পূজা ও উপহারের ফুলই বেশী বিক্রয় হয়। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিক পুষ্প ক্রয় করে,—সকাল ও বৈকালেই বেশী ভীড় থাকে। পুষ্পপটির পর শঙ্খ ও কাংস বণিকের দোকানশ্রেণী। সারি সারি এই দোকানের পশ্চাদ্দিকে কর্ম্মশালা এবং দ্বিতলে তাহাদের বাসগৃহ। তাহাদের কর্ম্মশালায় অবিরাম কর্ম্ম চলিতেছে। এই কাংস বণিক পল্লীর পর একটি অনতি প্রশস্ত পথ গঙ্গাতীর হইতে সোজা মহাকালের মন্দির পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুই দিকেই সারা পথ জুড়িয়া গন্ধ বণিক ও তাম্বুল ব্যবসায়িগণের দোকান। একদিকে তাম্বুল অপর দিকে গন্ধানুলেপন বিপণী। এই পথটিতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার সুগন্ধে মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বাতাস পর্য্যন্ত যেন সেই সকল গন্ধে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। এই মহানগরীতে প্রায় দ্বিসহস্র তাম্বুল ও গন্ধ ব্যবসায়ীর দোকান। তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভাগ এই পথেই অবস্থিত। চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কস্তুরী, কেশর ও কুঙ্কুম এবং নানাবিধ পুষ্পসংগৃহীত গন্ধ সর্ব্বগৃহেই ব্যবহৃত হইত। অবশ্য কনৌজ বা কান্যকুব্জই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্ধানুলেপন শিল্পের ক্ষেত্র এবং অধিকাংশ গন্ধ

দ্রব্যাদি সেখান হইতে আমদানী হইলেও তখনকার দিনে কুসুমপুরের প্রসিদ্ধিও কম ছিল না। সকল প্রকার গন্ধ তখন উত্তর ভারত হইতেই সুদূর পশ্চিম দেশে, যবন ও মিশর পর্যন্ত রপ্তানী হইত। যাহা হউক, সেই ঘন গন্ধপূর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের অদ্রী ও কুমার একেবারেই মহাকাল মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া পৌছিল এবং বিশ্রামার্থে এক স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

প্রহর দুই পূর্ব্বে তাহারা এই মহাকালের মন্দির হইতেই রাজমহালের পথে

প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিল ; তখন পথের এ মূর্ত্তি দেখে নাই। চারিদিক হইতে চারিটি প্রশস্ত রাজপথ এই মহাকাল মন্দিরেব এক একটি তোরণে মিলিয়াছে বলিয়াছি। এখন দেখিতে লাগিল, প্রধান রাজপথের উপর বৈকালিক জন-কোলাহল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে তাহাদের হৃদয় দুলিয়া উঠিল। পথে জল দিয়া ধূলার নিবৃত্তি করা হইয়াছে। দুই ধারে সারি সারি নানা জাতীয় বিপুলকায় বৃক্ষশ্রেণী,—প্রতিবৃক্ষের তলে তলে বেদী, তাহাতে সুসজ্জিত নানা বস্তু পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছে। যান-বাহন—অবিরাম গতি,—সকালে যেরূপ ছিল, তাহাপেক্ষা কম ত নয়ই বরং এ বেলা বেশী।

বৃক্ষশ্রেণীর তল দিয়াই পথিক-স্রোত হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেছে—তাহাদের এক পার্শ্বে বিপণীশ্রেণী নানা বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত দোকান-মধ্যস্থ স্তম্ভগুলি। রাজপথের দুই পার্শ্বেই অট্টালিকাশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নতলে দোকান। বিবিধ শিল্পালঙ্কারে ভূষিত ছোট বড় নানা দ্রব্যে পূর্ণ দোকানগুলি। অট্টালিকাগুলি কোনটি দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল, কোনটি চার, কোনটি পাঁচতল,—উপরে খোলার ছাদ,—আর প্রত্যেক গৃহখানির সম্মুখে সর্ব্বতলেই বারান্দা,—তবে সেগুলি দৈর্ঘ্যে যতটা ততটা প্রশস্ত নয়। দ্রষ্টব্য যাহা কিছু তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার দারুময় স্তম্ভগুলি—প্রত্যেকটিতে কারু বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। কোন কোন গৃহের সম্মুখ ভাগে নিম্নে স্তম্ভহীন বারান্দা,—কোনটি দীর্ঘ শুণ্ড গজমুণ্ড, কোনটি কুঞ্চিত শুণ্ড গজমুণ্ডের, কোনটি বা বিচিত্র হংস-শরীর, কোনটি দীর্ঘ বিস্তৃত মৃগমুণ্ড ও শৃঙ্গযুক্ত, কোনটি বা দীর্ঘাকৃতি রঙ্গীন মৎস্য-আধারের উপর স্থাপিত। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে নানা বর্ণের পতাকাধারী অথবা গদাপাণি প্রহরী মূর্ত্তি চিত্রাঙ্কিত। পতাকায় অধিকারীর বিশিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত। এই যে দারুস্তম্ভ ও বিবিধ আধারগুলির রচনা-বৈশিষ্ট্য, তাহা রাজধানীর নিপুণ সূত্রধরগণের শিল্পকীর্ত্তি। কাঠের উপর তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ এই খোদকারী, এমন অপূর্ব্ব চিন্তা, কল্পনা ও সংযমের পরিচয় অন্যত্র বিরল। একবার চক্ষু পড়িলে আর ফেরান যায় না।

প্রথম তলে দোকান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা উর্দ্ধতলগুলিতে অধিকারীর বাসস্থান। ভিতরদিকে প্রাঙ্গণ, তাহার চারিদিকেই বারান্দার কোলে কোলে কক্ষগুলি, তাহাতে তাহাদের মাল সকল সযত্নে রাখা থাকে। রাজপথের দুই দিকেই এই প্রকার গৃহশ্রেণী বরাবর চলিয়া গিয়াছে, যেন তাহার শেষ নাই। কেন্দ্রে এই বিশাল মহাকাল মন্দিরের চারি দিকের পথেই পথিককে সামলাইয়া চলিতে হয়। সেইখানেই সারাদিন, বিশেষতঃ বৈকালে ভীড় খুব বেশী। জনাকীর্ণ রাজপথে শুধুই দেশীয় বা স্থানীয় লোকের গতাগতি নয়। অদ্রী পূর্ব্বে এ সকল দেখিয়াছিল, তাহার অতটা বিস্ময়ের কারণ হয় নাই;—কুমার বিদেশীয়গণের নানা প্রকার বেশ-বৈচিত্র্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিল। এত বিদেশী লোক এখানে কি করে, এ কথা সে অদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল কিন্তু বাধিয়া গেল—সে বুঝিতে পারিল, বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী, এটা তাহাদের প্রতিষ্ঠানপুর নয়।

রাজপথের মধ্য দিয়া নানা বর্ণের বিচিত্র রথের যাতায়াতই খুব বেশী।

বিশেষতঃ এক প্রান্ত হইতে মহানগরীর অপর প্রান্তে অথবা কেন্দ্রে নানা শ্রেণীর যাত্রী রথারোহণ করিয়া যাতায়াত করিতেছিল—প্রত্যেকেরই লক্ষ্য আপনাপন কর্ম্মস্থল।

অশ্ব, গজ এবং অশ্বারোহী রাজপুরুষগণের গতাগতিও বড় কম নয়। রথের ঘর্ঘর, অশ্বের দড়বড়, খটাখট, হস্তীর পার্শ্বে বিলম্বিত ঘণ্টাধ্বনি, যাত্রিবাহী রথ অশ্বের গলে ও পদে ঘুঙুর শব্দে রাজপথ মুখরিত—সারাদিনই, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে। কোন কোন বৃক্ষতলে দূরে দূরে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নগর-রক্ষক প্রহরিগণ পথিকগণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত। নগরবাসী গৃহস্থ, ধনী, বণিক, শ্রমজীবী, বিবিধ ব্যবসায়ী, সৈনিক, বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, আচার্য্য, শিল্পী, নানাবিধ পণ্য-বিক্রেতা মাথায় অথবা স্কন্ধে ভার লইয়া চলিয়াছে। কেহ অলস নহে, সুস্থ শরীর, আলস্যহীন দীপ্ত চঞ্চল কটাক্ষ—বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নরনারী ক্ষিপ্র পদে গন্তব্যের পানে চলিয়াছে।

একাশ্ব অথবা অশ্বযুগল সংযুক্ত দ্বিচক্র রথে সাধারণ অথবা অবস্থাপন্ন যাত্রী আরোহীগণ দুই তিনজনে উপবিষ্ট, সুখকর আসনে বসিয়া আরামে চলিয়াছে। আবার অশ্বচতুষ্টয় সংযুক্ত যুদ্ধরথে সুদৃঢ় অঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দীর্ঘ সুদৃঢ় শরীররক্ষিগণ কোন বিশেষ কর্ম্মে রাজপ্রাসাদ হইতে উদ্দিষ্ট স্থানে চলিয়াছে।

সাধারণ যাত্রিবাহী রথের সারথীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিতেছে, লক্ষ্যস্থলে দ্রুত পৌঁছিবার জন্য। তাহা আবার মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে যখন কোন যুদ্ধরথী বা রাজপুরুষ অশ্বারোহণে অথবা নিজরথে দৃষ্টিমধ্যে উপস্থিত হইল, তখন সাধারণ যাত্রিবাহী রথের সারথীকে সংযত ও সম্ভ্রম দেখাইয়া চলিতে হইল।

দুই দিকে প্রকাণ্ড বেতের ঝাঁপা, ফলমূলাদি নানাপ্রকার হরিৎ শাকসব্জীপূর্ণ বাঁক কাঁধে বাহকগণ বাজারের দিকে চলিয়াছে। বিচিত্র বেশে রাজসন্দেশবাহী অশ্বারোহী দুইজন দেখা গেল ধীর তালে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে কহিতে চলিতেছে। সদ্যস্নাত, চন্দনচর্চ্চিত, কেহ বা পট্টবস্ত্র কেহ বা কৌষেয়, কেহ বা চীনাংশুক বস্ত্র ও উত্তরীয় স্কন্ধে, মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ আচ্ছাদিত বিপ্রগণ কেহ পুঁথি হস্তে, কেহ বা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় উপকরণ কিছু হস্তে লইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়াছে। গানের সুরের সঙ্গে হাতের তাল, স্নানের পর বৈকালিক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বিদ্যার্থিগণ চলিয়াছে। আবার পরক্ষণেই

দেখা গেল, বিশাল যুদ্ধোপকরণ ভার লইয়া রথশ্রেণী রাজকীয় অস্ত্রশালায় চলিয়াছে। আবার তাহার পশ্চাতে পদাতিক সৈন্যবেষ্টিত রথে প্রদেশ হইতে রাজস্ব অথবা স্বুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া কোষাগারের দিকে চলিয়াছে। তারপর বিচিত্র গো-যানের মধ্যে পণ্য ভার পূর্ণ করিয়া চালক পার্শ্বে উপবিষ্ট মহাজনাধিকারী নিজ নিজ বিপণীর দিকে দ্রুতগতি চলিযাছে।

এই ভাবে প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ করিয়া আরও কতক্ষণ পর্য্যন্ত যতটা সম্ভব মহানগরী পর্য্যটন করিয়া যখন তাহারা শিবিরোত্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন অন্তরে প্রবল উত্তেজনা ও শরীরের দুঃসহ ক্লান্তিতে তাহারা অবসন্ন।

আট

উভয়ে শিবিরোত্থানে প্রবেশ করিল ; অদ্রী অগ্রে ছিল, পিছনে বিক্রমজিৎ। শেখর সেখানে অপেক্ষায় ছিল, সে দ্রুতপদে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিল,—এবং অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলে অদ্রী অবতরণ করিল। পশ্চাতে বিক্রমকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া একবার অদ্রীর দিকে চাহিল, অদ্রী অঙ্গুলী সংকেতে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল। শেখর পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাইয়াছিল যে, অদ্রীহরি সবান্ধবে আসিয়াছেন এবং পরদিনই শিবিরোত্থানে আসিবেন। সেইজন্য সে সারাদিনই আজ তোরণদ্বারে কাটাইয়াছে। এখন দেখিয়া বুঝিল, বান্ধবটি কে। সে কোশলের সকল সংবাদই জানিত।

কুমারের হৃদয়ে অপরাধের ঐ গুরুভার সত্বেও আজিকার এই নগর প্রদক্ষিণ তাহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। সে তথাপি অদ্রীকে বলিল,—আমাদের ভাগ্যে রাজবিধান কি রকম যে হবে তাহা আমি জানি না ;—কিন্তু যদি অনুকুল বিধান কিছু হয তাহা হলে আমি আর প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাব না,—কোশল রাজ্যে আমার আর কোন আকর্ষণ নেই। আমি এইখানেই থাকব। কোন উত্তর না দিয়ে অদ্রী তখন ঈষৎ হাসিয়া নিজ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইল ;—সে তখন তাহার ভৃত্য শেখরকে কি উপদেশ দিতেছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্নানাদি হইয়া গেলে তাহারা নিজ নিজ সান্ধ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনান্তে উত্থানস্থ আসনে বসিয়া—তাহাদের চিত্ত,—অন্তরের নানা কথায় অভিনিবিষ্ট হইল। এখানে বক্তা ছিল কুমার, অদ্রী ছিল শ্রোতা, সে কদাচিৎ এক দুইটি কথার উত্তর দিতেছিল। আজ কুমারের মুখে কথা যেন আর ফুরায় না। তাহার উৎসাহ দেখিয়া যদি কেহ আন্তরিক সুখী হইয়া থাকে তবে সে আমাদের কোশল অদ্রীহরি।

উত্থানে একখানি বৃহৎ শিলাসন, আর তাহা লতাকুঞ্জ মধ্যে অবস্থিত ; তাহারা সেইখানেই বসিয়া কথা কহিতেছিল। সম্মুখেই তোরণ, দূরে রাজপথে লোকজন রথ-অশ্বাদি-শকট চলাচল স্পষ্টই সেখান হইতে দেখা যায়। যখনই বিক্রম কথা বন্ধ করিল প্রায় সেই সময়েই তাহাদের সম্মুখে তোরণপথে অশ্বখুরের শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই চাহিয়া দেখিল, একখানি যুগলাশ্ব রথ উত্থান মধ্যে প্রবেশ

করিল। সুচিত্রিত রথখানি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরেরই হইবে—ঘোড়া দুইটিও হৃষ্ট-পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ, তাহাদের সাজ-সজ্জাও সাধারণ নহে। রথের চূড়ায় রজত কলস, তাহার উপর চিত্রিত পতাকা।

এখানে অদ্রী এবং কুমার আর প্রতিনিধি বীরভদ্র কৌন্দক ব্যতীত অপর কেহ থাকে না। কে আসিল, কাহার কাছেই বা আসিল? দুজনের মনে একই সময়ে এই কথাই উদিত হইল। দেখিতে দেখিতে রথ, পথপ্রান্তে গৃহ-চত্বরস্থ সোপানের নিকটে আসিয়াই দাঁড়াইল। রথের মধ্যে একটি মহিলা,—আর বাহিরে সারথীর সহিত একাসনে বসিয়া এক বীর পুরুষ—সম্পূর্ণ যোদ্ধবেশে সজ্জিত। সম্পূর্ণ অর্থে যুদ্ধের সময় যেভাবে বর্ম্মচর্ম্মাদি সকল কিছু পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইতে হয়, শিরস্ত্রাণ, কবচ, কুণ্ডল, উরস্ত্রাণ, গোধাঙ্গুলিত্র, স্থূলচর্ম্মউপানৎ এই সকল, কেবল ধনু ও তূনীরপূর্ণ বাণ নাই। যুদ্ধের সময় নয় অথচ এ প্রকার পূর্ণ যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া দুই বন্ধুই বুঝিল যে, ঐ ব্যক্তি এই সম্ভ্রান্ত মহিলার শরীর-রক্ষী হইয়াই আসিয়াছে। যাহা হউক, রথ আসিতেই সেই সৈনিক নামিয়া সোজা হইয়াই দাঁড়াইল,—তারপর একবার ঘাড় ফিরাইয়া ভ্রূকুটিপূর্ণ চক্ষে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল।

বিক্রম অদ্রীকে বলিল, তুমি যাও অদ্রী, দেখ না ব্যাপার কি? অদ্রী ততক্ষণে দ্রুতপদে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। যে ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করা হইল সে মৃদুহাস্যে গোঁফের ডগাটি পাকাইতে পাকাইতে বলিল,—ভবান্ অদ্রীহরি! আমায় চিনতে পারেন নি দেখচি। আমি খণ্ডী বর্ম্মা।

অপরাহ্ণ, প্রায় তখন সূর্য্যাস্ত কতক্ষণ হইয়া গিয়াছে—তাই দৃষ্টিমাত্রেই অদ্রী খণ্ডীকে চিনিতে পারে নাই, তাহার উপর আজ তাহার পূর্ণ যোদ্ধবেশ। কাজেই, সে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল। শেষে খণ্ডী বলিল, রথে দেখ,—কে এসেছেন।

অদ্রী দেখিল বিদ্রাদেবী, তাহার দিদি স্বয়ং। অদ্রীর বয়স যখন দুই বৎসর, বিদ্রার নয়—তখন তাদের মা মারা যান। তখন হইতেই সে বিবাহিতা হইয়া যতদিন না কোশল ত্যাগ করিয়া আসে ততদিন ছোট ভাইটিকে স্নেহে যত্নে মানুষ করিয়াছিল। বাল্যে তাহার শাসনও কম ছিল না। এখন সেই প্রায় সন্ধ্যার আলোয় যেন রথ আলো করিয়া দেবী বিদ্রাঙ্গী। কতদিন অদর্শনের পর ছোট ভাইটিকে দেখিতে আসিয়াছে। তখন অদ্রীকে দেখিয়া দেবী বড়ই প্রসন্ন মনে রথ হইতে নামিল। তিলমাত্র অভিমান তার মনে ছিল না। অদ্রী

প্রণামান্তর কুশল প্রশ্ন করিল। মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদান্তর অতি মধুর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বিদ্রা বলিল,—এ তোমার কেমন ব্যবহার অদ্রী,—

অদ্রীর মুখে বাক্য নাই, তেজস্বী অদ্রীর উত্তর যোগাইল না। বিদ্রা পুনরায় বলিল, আমাদের জননী আজ বেঁচে থাকলে, তুমি কি পারতে এমন ব্যবহার করতে? বলো তুমি,—বাল্যে পিতৃমাতৃহীন আমরা ছোটবেলা থেকে তোমাকে কি আমি মায়ের মতই সেবা ও যত্নে মানুষ করিনি? বলিয়া অদ্রীর হাত ধরিল, ধরিয়া বলিল, বল, তোমায় বলতেই হবে।

এবার অদ্রী তাহার উপেক্ষার গুরুত্ব বুঝিল, কেবলমাত্র বলিল,—ক্ষমা। ঐ পর্য্যন্তই বাহির হইল। স্নেহার্দ্র বিদ্রা তাহার মনের কথা বুঝিয়া একেবারে অন্য আর এক কথার অবতারণা করিল,—বলিল, প্রতিষ্ঠানের কুমার বিক্রম এখন তোমার সঙ্গে আছেন না? অদ্রী বলিল, হাঁ আছেন বটে, গত পরশ্ব আর্য্য মহামাত্যের আহ্বানে এখানে এসেছেন, সম্রাটের নগর প্রদক্ষিণ দেখবেন তারপর আর্য্য মহামাত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি করবেন। একেবারেই অতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়াই সে একটু স্থির হইল। কিন্তু একটা কথা বহিল,—একথা তোমাকে কে বলেছে জানতে পারি কি? আর কেউ তো একথা জানে না।

শুনিয়া বিদ্রাঙ্গী ঈষৎ হাসিয়া যেদিকে কুমার বসিয়াছিল একবার সেইদিকে চাহিল। তারপর বলিল,—কেউ জানে না, একথা কি ঠিক?

অদ্রী বলিল,—তিনজন মাত্র জানতেন, চারজন নয়, এই কথাই ঠিক। বিদ্রা মৃদু হাসিয়া বলিল, এখন ধরে নাও চারজন কেন পাঁচ, এমন কি ছয়জনও জানে।

আশ্চর্য্য, অদ্রী আপনার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও মহামাত্যের কোন কাজের বিচারে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। অন্তরে চঞ্চল অদ্রী বিদ্রাদেবীর হাত একখানি ধরিয়া বলিল, মিনতি করি, দিদি আমার, সত্য বলো, কে কে সেই পাঁচ ছয়জন?

উত্তরে বিদ্রা সস্নেহে বলিল, ধর তোমরা দুটি, তারপর আর্য্য মহামাত্য,—আমার স্বামী, আমি আর বোধ হয় মহারাজ স্বয়ং,—হয়েছে? শুনিয়া অদ্রী, দিদির হাতখানি ছাড়িয়া দিল, তারপর বলিল, যাক, এখন আমায় কি করতে হবে অনুমতি কর।

বিদ্রা বলিল, চলো, আমায় কুমারের কাছে নিয়ে।

এ কি ব্যাপার? আর্য্য মহামাত্য কি আবার একটা নূতন কি উদ্দেশ্যের

পিছনে চলিলেন না কি? সে বিদ্রাকে বলিল, তাহলে আমি তাকে বলে আসি, আগে? বিদ্রা বলিল, তাই যাও, আমি এইখানেই আছি। এই বলিয়া খণ্ডীর দিকে ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হইল। অদ্রীও চিন্তিত মনে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কুমারের দিকে চলিয়া গেল।

দেবী বিদ্রাঙ্গী, উজ্জ্বল গৌরী। বয়সে প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর হইলেও সন্তানাদি না হওয়ায় শরীরে তাহার লাবণ্য, স্বাস্থ্য ছিল অটুট, তবে এখন তাহার শরীরায়তন কিছু স্থূল ভাবের দিকে যাইতেছিল কিন্তু ঠিক স্থূল যাহাকে বলে তাহা হয় নাই, গতি ছিল স্বচ্ছন্দ, দ্রুত এবং লঘু পাদক্ষেপ। যৌবনের গাম্ভীর্য্য, রূপ ও শ্রী, তাহার উপর ছিল স্বামীর প্রতি গাঢ় ভালবাসা, যাহার জন্য প্রবীর বর্ম্মা এখনও দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই। নিঃসন্তান আর্য্য পুরুষ ছিল তখনকার সমাজের অভিশাপ। পুত্রার্থে ই ভার্য্যা, সন্তান না হইলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ সমাজের কঠিন বিধি; এমনকি তৃতীয় ভার্য্যাও অনেকের ছিল, তাহারা সমাজের মহামান্য ব্যক্তি। এমনকি পুরুষ বন্ধ্যা প্রমাণিত হইলে নিয়োগ প্রথা পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। কারণ তখন বংশ প্রজাবৃদ্ধি ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, সমাজ চক্ষে এতটা পুরুষার্থহীন প্রতিপন্ন হইয়াও প্রবীর বর্ম্মা কেন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের পূর্ণযৌবনা রূপবতী কন্যার পিতা প্রবীরকে কন্যাদান করিতে নানা ভাবের নানা কৌশল উদ্ভাবনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যখন বিদ্রার সঙ্গে অদ্রীর কথা হইতেছিল তখন খণ্ডী বর্ম্মা উন্নত মস্তকে এক হাত কাঁকালে রাখিয়া অপর হস্তে গোঁপে চাড়া দিতে দিতে ভারী ভারী পা ফেলিয়া উদ্যানের পথে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পাদচারণ করিতেছিল। কুমার যেখানে বসিয়াছিল, সেদিকে সে গেল না। কুমার তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, রাজসৈন্য বিভাগের বড় রকমের কোন সেনাপতিই বা হইবে। কারণ খণ্ডীর শিরস্ত্রাণের উপরিভাগ ছিল সুবর্ণমণ্ডিত ও কারুখচিত। এ প্রকার শিরস্ত্রাণ ত সাধারণ যোদ্ধার নয়। বাহ্য দৃশ্যে বর্ম্মচর্ম্মমণ্ডিত খণ্ডী বর্ম্মাকে গর্ব্বিত, রূঢ় প্রকৃতির ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক বলিয়াই বোধ হইত কিন্তু প্রকৃতি তার আদৌ ইহার বিপরীত। তাহার গর্ব্বও ছিল না দম্ভও ছিল না, ছিল মাত্র রঙ্গরসপ্রিয় সরল প্রকৃতি। নাটক অভিনয়ে তাহার দক্ষতা। সঙ্গীতপ্রিয় স্বভাবের জন্য নগরের প্রসিদ্ধ নটির ঘরে প্রত্যহ তাহার সন্ধ্যা বা রাত্রি কাটাইবার উৎসাহ। আজ সন্ধ্যা সমাগত এখনও তাহাকে বর্ম্মচর্ম্ম পরিয়া বিদ্রাদেবীর

শরীর রক্ষকরূপে শিবিরোদ্যানে কাটাইতে হইতেছে। ইহাতে মহামাত্যের নির্দ্দেশ এবং প্রবীর বর্ম্মার অনুরোধ, শেষে তাহার কর্ত্তব্য, এই তিন বন্ধনের চাপে এখনও তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। ভাবিতেছিল, কতক্ষণে বিদ্রা তাহাকে মুক্তি দিবেন। তিনি ঘরে না পৌছাইলে তাহার আর মুক্তি নাই। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে যখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিল, বিদ্রা তাহার দিকেই আসিতেছে। সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

অতঃপর কি কর্ত্তব্য দেবী। বিদ্রা খণ্ডী বর্ম্মার স্বভাবপ্রকৃতি জানিত, সে বলিল, এখন অদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে একবার নগরপথে, সে একলা ত নয়। সঙ্গে আর একজন মহাজন আছে তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। শুনিয়া অবাক খণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল, মহাজন? সঙ্গে যাবে? অদ্রীর?—বিদ্রা বলিল, হাঁ যাবে যাবে, সে উপায় আমার কাছেই আছে; বলিয়া তাহার আপন বক্ষের উত্তরীয় মধ্যে হাত রাখিল, তারপর বলিল, চল যাই মহাজনের কাছে।

বিদ্রাদেবী সোজা একেবারে বিক্রম ও অদ্রী যেখানে কথা কহিতেছিল সেখানে আসিয়াই, প্রতিষ্ঠানের যুবরাজ কুমার বিক্রমের জয় হোক,—বলিয়া দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দূরে তাহাকে দেখিয়াই কুমার বিক্রম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এখন সসম্ভ্রমে আসিয়া তাহার পাদস্পর্শ করিল এবং কুশল প্রশ্নের পর কহিল, আজ্ঞা করুন, আমি কি করবো।

বিদ্রা তখন বক্ষের উত্তরীয় অভ্যন্তর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র বাহির করিল তারপর বলিল, আজই দ্বিপ্রহরে আমার স্বামী কলহনগড়ি থেকে এসেছেন তাঁর কাজ শেষ করে। সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য মহামাত্যের কাছ থেকে এই আজ্ঞা-পত্রখানিও প্রতিহারীর হাতে এসেই উপস্থিত, দেখুন,—তিনি কি লিখেছেন। বিক্রম অদ্রীকে ইঙ্গিত করিতেই অদ্রী তাহা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল,—আর্য্যা, দেবী বিদ্রাঙ্গী,—শ্রীমান অদ্রীহরি এবং প্রতিষ্ঠান রাজকুমার শিবিরোদ্যানেই আছেন। রাজ অতিথি তাঁরা,—আগামীকাল আপনাদের পরিবারবর্গের সঙ্গেই যেন তাঁদের উভয়কেই রাজদর্শনের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। যেহেতু সেটা আমাদেরই কর্ত্তব্য। কল্যাণমস্তু।

বিদ্রা বলিল, প্রদক্ষিণের পথে আমাদের যেখান থেকে দেখবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েচে আজ এখনই সেই স্থানটি দেখিয়ে দেবো, তাই তোমাদের নিতেই এসেছি। আমার স্বামী রাজপুরীতে গিয়েছেন কাল, শোভাযাত্রার মধ্যে তাঁর স্থান ক্রমপর্য্যায় জানতে। সেনানায়কেরাও আছেন, সভাগৃহে মহাবলাধিকৃত আর্য্য বলভদ্র

সেখানে নেতৃত্ব করবেন। তুমি কি যাবে?—না শুধু অদ্রীকে নিয়ে যাবো তাকে দেখিয়ে দেবো।

বিক্রম দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আজ সারাদিন নগর দর্শনের সুখে মন যতটা উন্নত ও প্রফুল্ল শরীর ততটাই অবসন্ন—তবুও যেতেই হবে আমাদের, স্বয়ং তুমি এসেছো যখন,—ততক্ষণ রথেই বসে থাক, দিদি, আমরা প্রস্তুত হয়ে এলাম বোলে। অদ্রী! দুটো ঘোড়ার কথা বোলে দাও,—আর দেবীকে রথে পৌছে দিয়ে এস।

অদ্রী তখন বিদ্রাকে রথে বসাইয়া প্রস্তুত হইতে গেল।

আগে যুগলাশ্ব সংযুক্ত চিত্রিত প্রকাণ্ড রথ। উহা প্রবীর বর্ম্মারই নিজ রথখানি; অভ্যন্তরস্থ সুকোমল আসনে দেবী বিদ্রাঙ্গী। সামনে সারথীর পার্শ্বে খণ্ডী বর্ম্মা, গোঁপে চাড়া দিতে দিতে চলিয়াছেন—আর রথেব পশ্চাতে দুইটি গান্ধার বাহনে দুইজনে চলিযাছে। যদিও সন্ধ্যা প্রায়োত্তীর্ণ তথাপি রাজপথে লোক সমাগম প্রচুর ছিল, কারণ, আজও উৎসবেব ব্যাপার কম ছিল না। চারিদিকেই প্রফুল্লতা। দিনমানে আজ তাহারা এস্থানে যখন আসিয়াছিল তখন এক রকম ছিল, এখন দেখিল আর এক মূর্ত্তি।

তাহাদের দলটি মধ্যগতিতে যখন মন্দিরের নিকট পৌছিল তখন দীপ জ্বালা হইয়াছে। পুষ্প ও তাম্বুল বিপণী আলোকমালায় সজ্জিত। অধিকাংশই সুন্দর ও সুন্দরী, নাগর, নাগরী, মহাকাল মন্দিব হইতে মার্ত্তণ্ড মন্দিরের দিকে চলিয়াছে। রাজপথ, মন্দির প্রাঙ্গণ ও পাশেই আরাম জনপূর্ণ হইত, আগামীকাল রাজ-সমারোহের জন্য রাজপথের উভয় পার্শ্বেই সজ্জা চলিতেছে, বোধহয় সারা-রাত্রই ঐ ব্যাপার চলিবে।

যাহা হউক, রথ আসিয়া মহাকাল এবং রাজপথ সংযোগস্থলের একখানি বৃহৎ ত্রিতল গৃহের সম্মুখেই থামিল। নীচে বড বড় দোকান উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। পার্শ্বেই প্রবেশ পথ, গৃহ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রথ হইতে নামিয়া কয়েকটি সোপান উঠিয়া বিদ্রাদেবী সকলের আগে তারপর খণ্ডী বর্ম্মা, তাহার পশ্চাতে আমাদের রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত, অন্তরে সুখী বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিল। দ্বারপথে একজন মশালধারী দাঁড়াইয়াছিল। নমস্কারান্তে সে ব্যক্তি সম্ভ্রমের সহিত তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল। প্রাঙ্গণ পাব হইয়া কাষ্ঠ-সোপানশ্রেণী বাহিয়া তাহারা উপরে দ্বিতলে উঠিতে অপর একজন ভৃত্য মশাল জ্বালাইয়া সকলকে পশ্চাতে লইয়া একখানি ঘরে প্রবেশ করিল। প্রশস্ত ও

সুসজ্জিত সেই ঘরের সকল দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশজন লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে এই ভাবে গৃহতলে সুকোমল বিছানা পাতা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারদিকের দেয়ালে চিত্রসকল অঙ্কিত। খোলা সকল দ্বারপথে সম্মুখে রাজপথের উপর প্রশস্ত বারান্দা প্রকাশিত হইল। সকলে সেখানে আসিলে রাজপথের জনকোলাহল, আলোক, আঁধার সকল কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল।

বিদ্রা প্রফুল্ল চিত্তে খণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিল,—খণ্ডী! মহারাজের দোলা মধ্যপথে যেখানে থামবে, সেখানে বরণ হবে সেইখানেই আমরা থাকতে পাবো তো? খণ্ডী বলিল, এই,—এই চৌমাথার উপরেই সেটা হবে, এখান থেকেই ভাল দেখা যাবে বোলেই না জ্যেষ্ঠ এই স্থানই আপনাদের জন্য নির্ব্বাচন করেছেন?

শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বিদ্রা কহিল, অদ্রী, কেমন স্থান হ'য়েচে আমাদের, —বলো? কুমারের মনোমত হবে ত, এ জায়গা?

স্থানটি দেখা হইলে কথা এই রহিল যে কাল প্রাতে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আপনাপন সঙ্গীসঙ্গ লইয়া তাহারা সবাই এখানে আসিয়াই মিলিত হইবে। বারান্দার একদিকে পুষ্পমালা, কুঙ্কুম, লাজাঞ্জলির উপকরণ সম্ভার; বরাঙ্গনাগণ উপহার প্রীতি উপর হইতে নিক্ষেপ করিবেন।

দেখাশুনা হইলে সবাই নীচে নামিল।

অদ্রী বলিল, তোমরা উপরে থাকবে, আমরা নীচে রাজপথের ধারেই, এই বাড়ীর বারান্দার মধ্যে দাঁড়াইব,—আরও যারা থাকতে চায়—তারাও থাকবে—

রথে বসিয়া দিদি বিদ্রা বলিল, কাল রাজদর্শনের পর তোমরা এখান থেকে একেবারেই আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে, সেইখানেই খাওয়া দাওয়া হবে, কেমন?—শুনিয়া অদ্রী বলিল,—আচ্ছা, যদি আর্য্য মহামাত্যের অপর কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকে তা হ'লে ঐ কথাই ঠিক রইল।

পথে বিক্রম বলিল, অদ্রী, তুমি সত্য বলেছ—আমরা সবদিকেই আর্য্য মহামাত্যের হাত দেখচি। আমরা যাতে স্বচ্ছন্দে এখানে কাল কাটাতে পারি এর ব্যবস্থাও তিনি করছেন। কিছুই ভোলেন না তিনি,—একথা আশ্চর্য্য।

অদ্রী বলিল, এক ঢিলে দুই পাখী মারার কৌশলটি তাঁর মত আর কেউ জানে না। আমার সঙ্গে দিদির দেখা হয় নি—এতদিন পরে সে যোগাযোগটাও কেমন করে ঘটিয়ে দিলেন দেখেছ? তিনি জানতেন যে, আমি এখনও তাঁর

কাছে যেতে পারিনি। বিদ্রা দিদি আমায় মায়ের মতই মানুষ করেছিলেন, শুধু বড় বোন বোলে নয়, নিজের সন্তানাদি কিছু হয়নি, আমার উপর একটা সন্তান-স্নেহ আছে তাই ছট্‌ফট্ করছিলেন এতদিন,—এখন দেখা হয়ে গেল।

বিক্রম,—এখন যা হোক একটা বিধান আমাদের উপর হয়ে গেলেই যেন বাঁচা যায়। সেইটি হ'তে যে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে তাই বুঝতে পারছি না। অদ্রী বলিল,—আমি এটুকু মাত্র জানি যে, এর মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে—আর তার ফলটাও মহৎ। তা ছাড়া, উপযুক্ত সময়টা না হলে অসময়ে তিনি কোন কাজই করেন না, ঠিক সময়ের জন্যই অপেক্ষা করেন। আর্য্য মহামাত্যের এইটিই বৈশিষ্ট্য।

রাজদর্শনের চমৎকার ব্যবস্থা তাহাদের জন্য হইয়াছে দেখিয়া উভয়েই প্রফুল্ল হইল, শ্রমাবসাদ, শরীরের ক্লান্তি বা গ্লানি যেন কিছুই আর রহিল না। বিক্রমের স্ফূর্ত্তি অধিক প্রকাশ পাইল তাহার কথায়। সে বলিল, যখন বেরিয়েছি চল অদ্রী! একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসা যাক, ওদিকে রাজপথটা কেমন সাজিয়েছে। অদ্রী বলিল, না থাক, আর বেশী দরকার নেই। কোন সাহসে এখন আমরা অন্যত্র যেতে চাইছি, এতক্ষণে শিবির উদ্যানে আমাদের জন্য মহামাত্যের কাছ থেকে যদি কোন সংবাদ এসে থাকে ?

বিক্রম বলিল, এতটা রাত্রে, তাও কি সম্ভব ? অদ্রী বলিল, এখানে কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব তাতো জানি না, কেবল এই মাত্র জানি যে, প্রতিটি ক্ষণ তাঁর নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করাই যেন আমাদের উচিত, কর্ত্তব্যও বটে।

বিক্রম চুপ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, অদ্রীর এটি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, এমন সময় নাকি আর্য্য মহামাত্যের আদেশ বা কোন সংবাদ আসিতে পারে ? পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু অদ্রী তাহার মনের কথাটি বুঝিয়া বলিল,—কুমার, তাঁর কর্ম্মের ধারা তুমি কিছুই জানো না। অবশ্য আমিও যে ঠিক বুঝি সে দাবী করতে পারি না, তবে যে কথাটা ভিতর থেকে আমার বিবেক বলছে তাই আমি তোমায় বলছি। আমার আসলে ভয়টা কি জানো, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের স্মরণ ক'রে বসবেন আর তখন আমাদের না পেলেই তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা সত্য সত্যই নিজ নিজ অবস্থা সম্বন্ধে কতটা অসতর্ক, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

কাজেই, তাহাদের শিবিরোদ্যানেই ফিরিতে হইল।

যখন তাহারা নিজ কক্ষের সম্মুখেই বারান্দায় উপস্থিত হইয়াছে, অদ্রীর ভৃত্য শেখর আসিয়া সংবাদ দিল আর্য্য মহামাত্যের সন্দেশবাহী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একখণ্ড ভূর্জ্জপত্রে লিখিত আদেশ আর্য্য চাণক্যের নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে,—কুমার বিক্রমজিৎ এবং অদ্রীহরি আগামী কল্য দিবা চতুর্থ প্রহার্দ্ধেক কালে যেন প্রস্তুত থাকেন, প্রতিহারী যাইয়া তাহাদের মৎসকাশে লইয়া আসিবে।

সংবাদবাহী চলিয়া গেলে অদ্রী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিক্রমের দিকে চাহিল। বিক্রম তখন মৃদু হাসিয়া বলিল, অদ্রী তুমি সব সময়েই ঠিক। এই জন্য তোমাতেই আমার আত্মসমর্পণ।
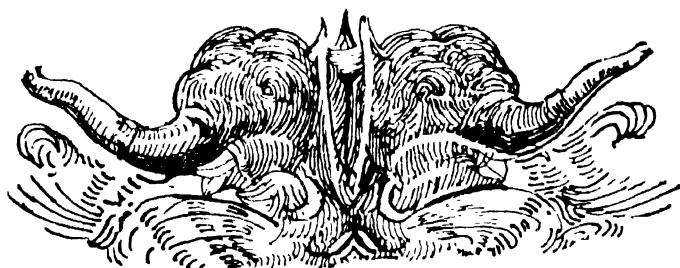
সেই সন্ধ্যায়, ঠিক যে সময়ে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট বন্ধুদ্বয় আর্য্য মহামাত্যের আদেশ-লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছিল, সেই সময় দেবী বিদ্রাঙ্গীর শান্তিপূর্ণ নিকেতনে যাহা হইতেছিল তাহাই বলিতেছি।

নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পশ্চাতে খণ্ডী বর্ম্মা, বিদ্রা যখন রথ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ অঙ্গনে প্রবেশ করিল তখন সবেমাত্র অবসন্ন শরীর প্রবীর বর্ম্মা, রাজপুরী হইতে আসিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িতেছিল। ভৃত্য তাহার অঙ্গ হইতে একে একে বর্ম্মচর্ম্মগুলি খুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া পরিধেয় উপস্থিত করিল।

বিদ্রাকে দেখিয়া প্রসন্ন প্রবীর বলিল, আহা,—আজ রাত্রে যেন না ঘুমালেই ভালো হয়। বিদ্রা বলিল,—ভোরে উঠেই মার্ত্তণ্ড মন্দিরেই যেতে হবে তো?

প্রবীর বলিল,—ঐখান থেকেই ত' যাত্রারম্ভ। বিদ্রা বলিল,—আবার দ্বিপ্রহরে প্রবর্ত্তনটাও ত' ঐখানেই? প্রবীর কিছুই বলিল না। আজ তাহার চক্ষু এবং মুখে ক্লান্তি ও অবসাদ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে; বিদ্রা ইহা আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল।

খণ্ডী এখন অগ্রসর হইয়া কহিল,—আর্য্য! আমাদের পর্য্যায় ঠিক হয়েছে তো?

প্রবীর সহাস্যেই বলিল, নিশ্চয়ই হয়েচে। তোমার রথ পর্য্যায়ক্রমে আমার

পরে তৃতীয় স্থানেই থাকবে। শুনিয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্তভাবেই খণ্ডী বলিল,—তাহলে এখন আমার ছুটি ত ?

প্রবীর বলিল,—রাত্র চতুর্থ প্রহরের তৃতীয়পাদ পর্য্যন্ত তোমার নিশ্চয়ই ছুটি।

শুনিয়া খণ্ডী যখন নমস্কারান্তে দ্রুতপদে বিদায় লইতেছিল তখন প্রবীর তাহাকে যেন একটু পরিহাসের ভঙ্গিতেই বলিল,—ছুটি নিয়েতো চললে, কিন্তু এখন গিয়ে আড্ডায় বান্ধবদের কাকেও পাবে কি ?

কথাটার মর্ম্ম ভালরূপ না বুঝিয়া খণ্ডী বলিল,—কি বলছেন আপনি! তাদের পাবো না, কেন ?

প্রবীর বলিল, তোমার গানপদ্মামোদর নেই, ধুন্ধু নেই, তারপর যারা না হলে তোমার,—বাধা দিয়া অধৈর্য্য খণ্ডী বলিল,—আহা, না থাকবে কেন, তারা সব গেল কোথা ? আমি ত কিছুই জানি না ?

প্রবীর বলিল,—তা তুমিই বা জানবে কেমন করে, যে দুটি দিন এখানে তুমি ছিলে না, তার মধ্যেই এই সব হয়ে গিয়েছে যে! নূতন ময়ূরপঙ্খী নৌকার কথা জানো ? সেই নৌকা আজ তারাই ভাসিয়েছে। সবার ছুটি আজ ত ছিলই কালকের শোভাযাত্রার জন্য, তাই আজ বিকালে তারা সঙ্গম থেকে উর্ব্বানগর পয্যন্ত নৌবিহারে যাত্রা করেছে। এইমাত্র মহাবলাধিকৃত আর্য্য বলভদ্রের কাছেই এই সব সংবাদ শুনে এলাম সভায়। আজ বোধ হয় তুমি তাদের কাকেও পুষ্পতোরণে পাবে না।

এই ভাবের রহস্য পরিহাস, তাহার কৌমার্য্যের উপর লক্ষ্য, তাহার স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে রহস্যময় ইঙ্গিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের মুখে শোনা তাহার অভ্যাস আছে, কাজেই ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই খণ্ডী একরকম ঝড়ের মত ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সেও বাহির হইয়া গেল আর প্রায় ঐ সময়েই এক ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে প্রবীর বর্ম্মার গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ধীরে ধীরে এক লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া রহিল।

দীর্ঘ শরীর, মাথায় উষ্ণীষ তাহার নীচে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ,—তাহাতেই বুঝা যাইতেছিল তাহার দীর্ঘ কেশ, বাহুতে কবচ, মনিবন্ধে বলয়—বক্ষে উরস্ত্রান উত্তরীয় মধ্যে ঢাকা, কোমরে পটি বাঁধা তাহার দুইদিকে দুইখানি ভিন্দিপাল কোষবদ্ধ ঝুলিতেছে। পরিধেয় আজানুস্থূল পশমের বস্ত্র লম্বিত, তাহার নীচে দীর্ঘপথ ভ্রমণ উপযোগী তলদেশে অতি স্থূল চর্ম্ম পাদুকা। মোটের উপর মধ্য

পদস্থ রথসৈন্যের যেমন পোষাক তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল তাহার পোষাক সেই রূপ। সে যেন বড় কষ্টেই নড়াচড়া করিতেছিল,—স্থির হইতে পারিতেছিল না।

এদিকে খণ্ডীর কথা, এখন সে শশব্যস্তে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে, যাহা অট্টালিকার অপর অংশে অবস্থিত,—প্রবেশ করিয়া পরিচারকের সাহায্যে তাহার বর্ম্ম চর্ম্মাদি খুলিয়া ফেলিল। তাহার ভৃত্যের নাম ভট্টদাস ; সে সযত্নে সকলগুলি যথাস্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আর্য্য ! প্রভু, এখন কি ঘরেই থাকবেন ? চৌকায় ভোজন স্থানে আসন দেবো কি ?

অব্যবস্থিত চিত্ত, চঞ্চল খণ্ডী তাহার স্বাভাবিক দ্রুত কণ্ঠে বলিল,—হাঁ, মেদ-মাংস্যাচার্য্য,—ভট্টদাসের শরীর কিছুটা স্থূল ছিল, তোমার শ্রাদ্ধকর্ম্ম ও সপিণ্ড করণ শেষ করতে তোমার আজ্ঞা মত আমি ঘরেই থাকবো বটে, তবে আমার স্থূল শরীরটা একটা ঘোড়ায় উঠে নগরের মধ্যে ভ্রমণে বেরিয়ে যাবে। কাজেই একটু ত্বরান্বিত হয়ে একটা ঘোড়ার কথা বোলে দাও, তাড়াতাড়ি সাজিয়ে যেন এখনই নিয়ে আসে। তারপর ভোজনের কথা।

তাহার মনটা স্থির ছিল না ; বিশেষতঃ প্রবীর বর্ম্মার শেষের কথাগুলি সে পরিহাস বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। তাহাকে ফেলিয়া নৌবিহারে যাইবে গানপৎ, একি কখনও সম্ভব ? তাড়া দিয়া সে ভৃত্যকে পুনরায় বলিল,—যাও কপিমুণ্ড ভল্লুকশরীর যাও, দেরী কোরো না, বনমৃগের গতি ধরে যাও।

তবুও সে যায় না, দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রুষ্ট বাক্যেই পুনরায় বলিল,—মুখখানাকে বরাহের মত করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও।

ভৃত্য বলিল,—আজ তো আপনার অবসর ছিল তা সত্ত্বেও সারাদিন পরে ক্লান্ত হয়ে এইত এলেন, এখন কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করলে হোতো না ? কুপিত হবেন না প্রভু !

শুনিবামাত্র অধিক মাত্রায় চঞ্চল হইয়াই খণ্ডী বলিল,—হাঁ, হাঁ, কর্ব্বুর বদন,

তোমার মুণ্ডটি জলযোগ করে আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমাবো? কেমন? বেশ তাই-ই হবে। যাও দেখি এখন আগেই ঘোড়ার ব্যবস্থাটা করে তারপর কিছু খাদ্য আমার জন্য নিয়ে এসে এখানেই দাও, ভিতরে ঢোকায় আমি যাবো না। যাও গজরাজ এখন গমন করো, দোহাই তোমার, ছন্দটা দ্রুত করো একটু—

অত্যন্ত দ্রুত চারিখণ্ড ঘৃতসিক্ত পরোডা এবং পালকশাকের সঙ্গে বিবিধ মসলাযুক্ত ময়ূর মাংসের একটি সুস্বাদু উপকরণ, দুইখণ্ড ক্ষীর কোন রকমে গলধঃকরণ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল! তারপর কপালে চন্দন ও কুঙ্কুমের ফোঁটা লাগাইয়া সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, প্রান্তে সুবর্ণখচিত উত্তরীয় উড়াইয়া, চপ্পল পায়ে, সূক্ষ্ম রেশম উষ্ণীষ মাথায় অপরূপ নাগর বেশে ঘোড়ায় উঠিল। ভিতর হইতে যখন রজতপাত্রে মুখশুদ্ধির জন্য তাম্বুল লইয়া ভট্টদাস আসিয়া প্রাঙ্গণে পৌছিল তখন খণ্ডী বর্ম্মার ঘোড়া নগরের পথে অনেকটাই চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা বহুক্ষণ হইয়া গেলেও তাহার কোন অসুবিধাই হইল না। পথের দোকানগুলিতে দীপ উজ্জ্বল ছিল। কাল প্রাতেই নগরে রাজদর্শন উৎসব। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাজসজ্জা চলিবে। রাজপথের ধারে ধারে প্রত্যেক গৃহের ত বটেই, যে সকল গৃহ রাজপথপার্শ্বে নয় তাহাতেও সজ্জার অভাব নাই। রাত্রেও আজ সহরটি যেন জাগ্রতই আছে।

মহাকালের মধ্য দিয়া সে রাজপথে পড়িল তারপর কতকটা যাইয়া দক্ষিণে প্রশস্ত এক গলি-পথে প্রবেশ করিল। এই স্থানেরই নাম পুষ্পতোরণ, তাহাদের আড্ডা। সারি সারি অনতিউচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী অতি পরিপাটি দারুময় কারুপূর্ণ প্রত্যেকখানি। এই অঞ্চলে নটিগণ বাস করে। নিম্নতলে তাম্বুল এবং গন্ধ বিক্রেতা, তাছাড়া বস্ত্ররঞ্জনকারিগণের দোকান আর দ্বিতল ত্রিতলে গৃহ অধিকারিণীরা থাকে।

খণ্ডী বর্ম্মা ধীরে ধীরে যেখানে অশ্বরশ্মি সংযত করিল তাহার সম্মুখেই এক-খানি অতীব মনোহর, সুসজ্জিত অট্টালিকা, তাহার তলে কোন দোকানই নাই। দ্বার বন্ধ ছিল। দ্বারস্থ বলয় নাড়া দিতেই এক বয়স্থা শীর্ণা নারীমূর্ত্তি বর্ত্তিকা হস্তে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। খণ্ডীকে দেখিয়াই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; খণ্ডীও তাহাতে কতকটা সঙ্কুচিত হইল। খণ্ডী বর্ম্মার দীর্ঘ স্থূল দেহখানি দেখিলেই তার ভয় হইত, কারণ এই গৃহের অধিকারিণী হইলেও সে দৈব-দুর্ব্বিপাকে চির দুর্ব্বল,—ক্ষীণ শরীর। সে চম্পার অভিভাবিকাও বটে। এখন তাহার নতমস্তকে এই ভীরু অভিবাদন, খণ্ডীর গ্রহণ করিবার সময় ছিল

না। তাই লক্ষ্য না করিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল,—ভদ্রে! চম্পা, কণকা এরা সব কোথায়? উত্তর দিতে তাহার বাধিয়া গেল, ভয়ে ভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে,—তারা সবাই আজ গানপতের নিমন্ত্রণে নৌ-বিহারে গিয়াছে। শুনিয়াই খণ্ডি চিন্তিত হইল। খণ্ডী যে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না, জানিবার সম্ভাবনাও তাহার ছিল না, তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেই সে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই এখন খণ্ডীকে ভাবিতে দেখিয়া সে অপরাধিনীর ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—অবশ্য আর্য্য বর্ম্মা! আপনি গত দুইদিন কর্ম্মান্তরে ছিলেন কারো পক্ষে আপনার তত্ত্ব, গতাগতি জানার সম্ভাবনা ছিল না বলেই আপনাকে জানানো হয়নি। তারা এখনই আসবে, সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে রথ গিয়েচে তাদের আনতে; এক দণ্ডের মধ্যেই আসবে আশা করি। উপরে বসবেন আপনি? এখন খণ্ডী বুঝিল, তাহার জ্যেষ্ঠ, রথপতি আর্য্য প্রবীর বর্ম্মা তাহাকে নাচাইতে পরিহাসচ্ছলে যা তা বলেন নাই—নৌ-বিহারের কথাটা সত্যই। সে আর কোন কথাই শুনিল না, বলিল,—আচ্ছা আমি একটু ঘুরেই আসছি, তুমি দরজা বন্ধ কোরো না এখন, কেমন? শুনিয়া সে একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াই বলিল—আর্য্য খণ্ডী বর্ম্মা যা আজ্ঞা করেন। অবশেষে মাথা নীচু করিয়া সে বিদায় নমস্কারটা জানাইল কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার সময় খণ্ডীর ছিল না; সে ততক্ষণে পথে আসিয়াই ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল এবং রাজপথের দিকে চালাইয়া দিল।

অন্তরের বিষম চাঞ্চল্যে সে হয়ত তখনই মহাকালের পথে গঙ্গাতীরেই ছুটিত কিন্তু তাহা করিতে হইল না, রাজপথে পড়িয়া অশ্বের মুখ দক্ষিণে ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত রথ সেই মুহূর্ত্তেই গলিপথে প্রবেশোদ্যত দেখিতে পাইল। রথখানি গানপৎ দামোদরের সখের রথ। এ-রথ আর কারো হইতেই পারে না;—খণ্ডী ঠিকই চিনিয়াছিল। সারথীর সঙ্গে একাসনে একজন যুবা পুরুষ বসিয়াছিল, সেও খণ্ডীকে দেখিতে পাইয়াছিল। ভিতরে যাহারা বসিয়াছিল, তিনটি অনির্ব্বদ্যসুন্দরী লিচ্ছবী নারী ও একজন পরম সৌখীন যুবা নাগর।

এখন ভিতরের যাত্রীরা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—দেখো দেখো, খণ্ডী বর্ম্মা! বোধহয় আমাদের খুঁজতেই বেরিয়েছে—বলিয়া পার্শ্বস্থ যুবাপুরুষের কাঁধে কোমল হাতখানি স্থাপন করিল ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বাহুতে একটু টিপিয়া দিল। তাহার বাহ্যজ্ঞান যেটুকু ছিল তাহার প্রভাবেই

সে বলিল, এঁ্যা! তাই নাকি? ততক্ষণে খণ্ডী নিকটস্থ হইতেই ধুন্ধু বলিল,—আরে বন্ধু খণ্ডী, এত রাত্রে এ পথে কেন?

খণ্ডী বলিল—গরু খুঁজতে বেরিয়েছি,—এখন পেয়েছি, চলো। রথের ভিতর হইতে খিল্ খিল্ হাসির শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর আসনে অব্যবস্থিত গানপৎ বলিল,—না, না, গরু কখনই নয়,—কুরঙ্গিণী বরং—রথের গতিতে আর কিছু শুনা গেল না।

যথাস্থানে আসিয়া সবাই উপরে উঠিয়া প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। গানপৎ সমস্ত সোপান ধুন্ধুর কাঁধের উপর ভর করিয়াই উঠিয়া আসিল। এখানে উপস্থিত হইয়াই যেন কত সহজ অবস্থায় আছে এই ভাব দেখাইতে সে বিরলে একখানি আসনে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সকলেই বুঝিল যে তাহার শুইলেই ভাল হইত। কিন্তু খণ্ডীর সাম্‌নে সে তুর্ব্বলতা দেখাইবে না যেহেতু খণ্ডী তাহাপেক্ষা তুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ। তা বলিয়া কোন বিষয়ে আড্ডার মধ্যে কোন কাজেই বাধা বলিয়া কিছু ছিল না, প্রণয়ও গভীর ছিল তু'জনের মধ্যে। তাহার ব্যাপার দেখিয়া কণকা, কাৰ্ব্বি, চম্পা সবাই,—আমরা ভিতর থেকে আসছি বলিয়া তুদ্দুড় শব্দে ভিতরে চলিয়া গেল। খণ্ডী উপবেশন করিয়া ঘোড়ার চাবুকটি হাতের তুইটি আঙ্গুলের মধ্যে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে গানপতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এটা কি রকম হোলো, বলতো? শুনিয়া গানপৎ হেঁট মুখে জড়িতকণ্ঠে বলিল,—আমি নিরুত্তর। তারপর সে চুপ করিয়াই রহিল?

তখন ধুন্ধু বলিল,—ওকে আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করোনা বন্ধু! আজ এত বেশী পরিমাণেই মধুপান করেছে—ওর কাছ থেকে কিছুই পাবেনা শুনতে। আমার কাছেই শোনো যা শোনবার। আরও কয়েকটা কথা শুনিয়াই খণ্ডী একবার গানপতের দিকে চাহিয়া দেখিল। সত্যই সে এখন বিশ্রাম-কাতর। খণ্ডী বলিল,—ওকে শুইয়ে দাও না কেন?

ধুন্ধু বলিল,—এখানে আজ ওর শোয়া হবে না, রাত্র যাপনও চলবেই না। কাল শোভাযাত্রায়, অশ্বারোহী সেনার নায়ক, ওর একটি স্থান আছে। এখনিই ত ওকে পিতা মহাবলাধিকৃত আৰ্য্য বলভদ্র দেবের কাছে গিয়ে জেনে নিতে হবে যে ওর স্থানটি কোথায় হয়েচে শোভাযাত্রার মধ্যে। কিন্তু এখন ওর অবস্থা ত দেখচো? যেমন করেই হোক ওকে এখন বাড়ী গিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আর আমাকেও এখনই আৰ্য্য মহামাত্যের গোচর করতে

হবে সকল খবর, সেই নৌকায় আমাদের পদার্পণ থেকে যা কিছু ঘটেছে। শুনিয়া খণ্ডী অবাক হইয়া গেল,—মহামাত্যের সঙ্গে তোমাদের নৌবিহারের সম্বন্ধটাই বা কি তা আমি কিছুতেই ইতি করতে পারচিনা বন্ধু!

তবে শোন, সকল কথাই বলি,—বিষ্ণুরত্নকে জান তো? খণ্ডী বলিল,—নগর-শ্রেষ্ঠী তো? ধুন্ধু বলিল,—হাঁ, মহারাজের জন্মদিন আর রাজদর্শন উপলক্ষে তাঁকে একখানি নৌকা উৎসর্গ করেছিলেন। অপূর্ব্ব ঐ নৌকাখানি, আজ প্রায় ছ'মাস ধরে শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী করেছে। পরশুদিন রাজসভায় কথা হয়েছিল যে নগর প্রদক্ষিণের পর বৈকালে মহারাজ সপরিবারে ঐ নৌকায় সান্ধ্যবিহার করবেন। আর্য্য মহামাত্য এই সংবাদে আদেশ পাঠালেন যে ঐ নৌকা প্রথমেই মহারাজকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। নগর প্রদক্ষিণের পূর্ব্বদিনে একদল রাজপুরুষ ঐ নৌকায় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করে সকল অবস্থা তাঁর গোচর করবার পর তবে তিনি বিবেচনা করবেন ঐদিন মহারাজ ঐ নৌকায় সান্ধ্য ভ্রমণ করবেন কিনা। আর নৌকাখানি আর্য্য বলভদ্রদেবের অধিকারেই থাকবে। আর যে যে রাজপুরুষ ঐ নৌকায় ভ্রমণ করবেন তাও মহাবলাধিকৃতই স্থির করে দেবেন। শুনিয়া খণ্ডী সবিস্ময়ে কহিল,—এতক্ষণে বুঝলাম, তাই বলো বন্ধু, উঃ, তাহলে গানপৎকেও খুব তপস্যা করতে হয়েছিল নৌকাখানা যোগাড় করতে?

ধুন্ধু বলিল,—তা মনে কর বাপের হাতে চাবি থাকলেই কি ছেলেতে লোহার সিন্দুক খুলতে পারে? অনেক কিছুই চাতুরী করতে হয়েছিল তাকে। আর্য্য মহামাত্যের কাছে পর্য্যন্ত ধরণা দিতে হয়েছিল। কি জানি আর্য্য চাণক্যের ওর সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা আছে, ওর কোন আবদার তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। ঠিক বাগিয়ে নিয়ে এলো অনুমতিটা। কেবল একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, ভ্রমণ শেষে গানপৎ নিজে,—একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে সকল খবর দিয়ে আসবে ঐ নৌকা সম্বন্ধে, যা তিনি তার কাছে জানতে চাইবেন। খণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল, তারপর,—এখন কি? ধুন্ধু বলিল,—এখন আমিই খবর দিয়ে আসি, অথচ এসব খবর গানপতেরই দেবার কথা ছিল তাঁর কাছে। ওকে আবার সামলাতে হবে তো এ অবস্থায়! শুনিয়া খণ্ডী বলিল,—তুমি যাও তাঁর কাছে, আর গানপৎকে তারই রথে তুলে নিয়ে আমিও যাই তার বাড়িতে, তারপর আর্য্য বলভদ্রের কাছে খবর নিয়ে নেবো কাল শোভাযাত্রায় ওর স্থান কোথা হয়েছে। কেমন? শুনিয়া ধুন্ধু বলিল,—তাই

করো বন্ধু,—উঃ সত্যই তুমি না এলে যে কি হোতো তাই আমি ভাবছি। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে আর্য্য মহামাত্যের কাছে যেতে পারবো তাঁর প্রশ্ন তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে, তারপর যদি ডুবে না যাই তাহলে বাড়ি যাবো।

খণ্ডী বলিল,—তাহলে,—নিশ্চিন্ত মনে যাবার আগে আমাকেও একটু নিশ্চিন্ত করে যাও তুমি আমার ঘোড়াটি নিয়ে,—তারপর কাল যখন ইচ্ছা পাঞ্চির আশ্রমে পাঠিয়ে দিও, আমার নামে, কেমন ?

ধুন্ধু স্বীকার করিল,—তুমি তা হলে আজ ওর কাছেই থাকবে ত ?

খণ্ডী বলিল,—হাঁ নিশ্চয়ই তা হলে,—নমস্তে—ধুন্ধু—নমস্তে! ধুন্ধুও বলিল, নমস্তে !! নমস্তে !!!

দশ

সযত্নে গানপৎকে রথে লইয়া খণ্ডী বর্ম্মা যখন আর্য্য বলভদ্রের নিকেতনে তোরণ অতিক্রম করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল তখন রাত্র প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হয় নাই, অর্দ্ধ প্রহর কাল গত হইয়াছে। তারপর যখন শুনিল আর্য্য মহাবলাধিকৃত রাজপুরস্থ সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, ইহাতে খণ্ডী অনেকটাই আশ্বস্ত হইল। পরিচারকের সাহায্যে গানপৎকে বাহিরেই তাহার আপন বসিবার ঘরেই শয্যা রচনা করাইয়া শয়ন করাইল,—তারপর আর্য্য বলভদ্রদেবের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। গানপৎ ঘোর নিদ্রার কোলে শয্যায় অচৈতন্য জড়বৎ পড়িয়া রহিল।

যেখানে খণ্ডী বসিয়াছিল তাহার সম্মুখেই কিছু দূরে অন্তঃপুর প্রবেশ-পথের প্রশস্ত গৃহভিত্তিতে বহুবিধ প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র সাজানো রাখা আছে দেখিতে পাইল। দীর্ঘ ঐ পথের উপর একটি উজ্জ্বল পিত্তল নির্ম্মিত পঞ্চবর্ত্তিকা তিনটি শিকলে ছাদ হইতে ঝুলিতেছিল। তাহাতে যে আলো হইয়াছে সে আলোতে ভালরূপ দেখিতে না পাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে সে উঠিয়া উহার নিকটে গেল।

প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাষ্ঠফলকে প্রত্যেক অস্ত্রটি এমন ভাবেই আঁটা যাহাতে পড়িয়া যাইবার যো নাই, আবার সহসা কেহ গ্রহণ করিতেও পারিবে না। সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভূষুণ্ডি, পরশু, পানা, তোমরাদি অনেক প্রাচীন ব্যবহার্য্য অস্ত্রসমূহ ছিল, তাহার মধ্যে একটির উপর তাহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। তখনকার পক্ষে সে একটি বিশেষ আকর্ষণেরই বস্তু। সেটি প্রাচীনকালের একটি অস্ত্র,—মহাভারতের যুগেই তাহার ব্যবহার ছিল। দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াই ছুঁড়িতে হইত। খণ্ডী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল তাহার নামটি, এখন সেই তুর্ব্বা স্বচক্ষে দেখিল। অনেকটা তন্তুবায়গণের মাকুর মতই দেখিতে কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, মধ্যস্থলে মুষ্টিস্থানটী অত্যন্তই স্থূল এবং গোলাকার—আগাগোড়াই উৎকৃষ্ট লৌহনির্ম্মিত এবং অতীব মসৃণ ও উজ্জ্বল। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় এক হাতেরই কিছু কম হইবে অথবা মুষ্টিবদ্ধ এক হাত হইবে। খণ্ডী কি ভাবিয়া উহা স্থানচ্যুত করিতে গেল কিন্তু তাহা মোটেই সহজ বোধ হইল না। এখন, লোভনীয় এই অপ্রচলিত অস্ত্রগুলির উপর গৃহকর্ত্তার বিশেষ যত্ন

আছে যাহাতে উহার কোনটাই খোয়া না যায়—বুঝিয়া খণ্ডী চমৎকৃত হইল। সে আরও একবার বলপ্রয়োগ করিয়া দেখিতে গেল ; ইত্যবসরে রথের ঘর্ঘর

এবং দ্রুত অশ্বপদশব্দে বুঝিল মহাবলাধিকৃত আসিতেছেন, সে আসিয়া নিজস্থানে বসিল।

অল্পক্ষণেই ভৃত্য আসিয়া খণ্ডীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আর্য্য বলভদ্র

তখনও দাঁড়াইয়া—পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। খণ্ডী আসিলে সম্ভাষণাদির পর প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,—গানপৎ কোথা ?

খণ্ডী বলিল,—আজ আর আপনার সঙ্গে তার দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তাতঃ ! তার স্থান শোভাযাত্রার মধ্যে কোথায়, এইটুকু আপনার কাছে জেনে নিতেই এসেছি আমি। কাল যথাসময়ে যথাস্থানেই সে উপস্থিত হবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন আপনি।

বলভদ্র বলিলেন,—যতদূর জানি আজ নৌবিহারের আমোদের মধ্যে তুমি ত ওদের মধ্যেই ছিলে না। তাছাড়া বোধ হয় কিছুদিন থেকেই তুমি তোমার নিজ স্থানেও নেই, আজ হঠাৎ একেবারে মক্ষম খবর—এ্যাঁ ? খণ্ডী তখন প্রবীর বর্ম্মার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার গৃহরক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিল প্রায় একপক্ষ কাল,—আজ প্রভাতেই মাত্র তিনি ফিরিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত বলিতেই তিনি সকল কথাই স্মরণ করিয়া বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, ও খবর তো আমি জানি। এই সন্ধ্যায় যে তিনিও আমাদের সভায় ছিলেন। ঠিক সময়েই তিনি এসে পৌঁছেছেন আমাদের মধ্যে। আজ আর কলহনগড়ির কথা কিছু শোনা হোলো না তাঁর কাছে,—কাল সম্রাটের নগর প্রদক্ষিণের ব্যাপার নিয়েই সব সময়টাই কেটেছে। থাক এখন সেসব—গানপৎ কোথা ? সে কি ঘরে ফিরে আসতে পেরেছে, না এখনও—পুষ্পতোরণে,—

—সে ত বাড়িতেই রয়েছে, এই মাত্র তার কাছ থেকেই ত আমি আসছি। শুনিয়া বলভদ্র বলিল,—ও হোঃ, তাহলে সে বড় ভাল ছেলে দেখছি, আমিত এই আশঙ্কাই করেছিলাম যে আজ রাতে হয়তো আমি আর কোন খবরই পাবো না তার। যাক্ এখন আর্য্য চাণক্য খবরটা পেলেন কিনা তাতো জানিনা,—তার যে খবরটা পাবার কথা সবার আগে ;—সেই খবরের উপর কাল মহারাজ ঐ নৌকায় সান্ধ্যবিহারে যাবেন কিনা সেইটা নির্ভর করছে।

খণ্ডী বলিল,—বহুক্ষণ পূর্ব্বেই ধুন্ধু গিয়েছে তাঁকে খবর দিতে, এ সংবাদও আমি জানি।

বেশ, বেশ, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে—খণ্ডী, আমি জানি তুমি সর্ব্বকর্ম্মেই উপযুক্ত—কিন্তু ঐ গানপৎ,—তোমাদের সবার তুলনায় ও কত অলস,—পুষ্পতোরণ, আর মধু এই দুইটিতেই ওর যা কিছু আকর্ষণ। তোমাদের যে সংযম আছে, ওর তা নেই,—

খণ্ডী বলিল,—কিন্তু তাতঃ, কোন কাজের বেলা ওকে ত কখনও অলস

দেখলাম না। বলভদ্র বলিলেন,—সেইটিই কি একটা বড় গৌরবের কথা হোলো, খণ্ডী? এখন থেকেই ও এত আরামপ্রিয়—এ আমি বাপ হয়ে কি করে সহ্য করতে পারি। ওর মা যিনি, তিনিই দায়ী ওর জন্য। ঐ একমাত্র পুত্র বলে ওর মুণ্ডটী চিবিয়ে খেয়েছেন ছেলেবেলা থেকে। তুমি জানো, সম্রাটও যেমন আর্য্য মহামাত্যও তেমনি অলস, কর্ম্মকুণ্ঠ, আরামপ্রিয় লোককে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আজও মহারাজ সভায় দুজন নূতন মৈথিলী কর্ম্মচারীকে বিতাড়িত করলেন,—আমার রাজ্যে অলস, আরামপ্রিয় লোকের স্থান নেই, তোমরা মহাবীরের আশ্রমে প্রবেশ করোগে, এই বোলে। কিছুতেই ক্ষমা করলেন না ব্রাহ্মণ বোলে।

খণ্ডী বলিল,—নিশ্চয়ই আগে তাতঃ, আর্য্য মহামাত্যই তাদের তাড়িয়েছিলেন? শুনেছি তাদের আরও অন্য গুরু অপরাধও ছিল। শুনিয়া মহাবলাধিকৃত বলিলেন,—হয়তো তাই, কিন্তু তুমি ত জানো, আর্য্য মহামাত্য লোক চিনতে কেমন দক্ষ। তিনি বলেন, মূর্খ ব্রাহ্মণ সকল সমাজের শত্রু বটে কিন্তু আরামপ্রিয়, কর্ম্মকুণ্ঠ অলস যারা—তারাই সবার বড় শত্রু, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বসমাজের। যাক এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়? খণ্ডী বলিল,—আজ আমি রাত্রে গানপৎএর সঙ্গেই থাকবো, কাল দুজনেই একসঙ্গে যাত্রা করবো মার্ত্তণ্ড মন্দিরে।

ওদিকে অন্তঃপুরে আর্য্য বলভদ্রের সহধর্ম্মিণী দেবী বিম্বা,—শৈবী নামে তাঁহার এক পরিচারিকার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। কতক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাদের রথে করিয়া গানপৎকে যে অবস্থায় খণ্ডী বর্ম্মা লইয়া আসিয়াছে সেই সকল সংবাদ সে অত্যন্ত অস্থিরচিত্তেই জ্ঞাপন করিতেছিল। দেবীও উৎকণ্ঠিত আগ্রহ সহকারে এ সকল সংবাদ শুনিতেছিলেন—এখন ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি শৈবিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—এখন সে কোথা? শৈবী বলিল,—অন্তঃপুর দ্বারপথের ধারেই বাইরের ঘরে, আর্য্য খণ্ডী বর্ম্মা তাঁর কাছেই আছেন। শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আমি যাবো এখনই তার কাছে। কাল তাকে ভোরে উঠতে হবে যে। আমায় নিয়ে চল্। শৈবী বলিল,—আমি তাহলে আগে খবর দিয়ে আসিগে? শুনিয়া জননী বলিলেন,—আগে খবর আবার কি দিবি তুই, খণ্ডীকে কি আমি চিনি না? না খণ্ডী বর্ম্মা আমায় চেনেন না?

তবে চলুন বলিয়া শৈবী, একটী মশালধারীকে ডাকিল। মশাল আসিলে একখানি উত্তরীয় জড়াইয়া দেবী বিম্বা চলিলেন পুত্রের অবস্থা দেখিতে।

প্রাঙ্গণ পার হইয়া তাহারা যখন চত্বরে উঠিয়া পড়িল তখন যে ঘরে গানপৎ শয়ন করিয়াছিল সোজা পথের মধ্যে দিয়া সেই ঘর দূরে স্বমুখেই দেখা গেল। শৈবী বলিল,—ঐ যে ঐ ঘরে। তখন খণ্ডী ছিল না, আর্য্য বলভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত পুত্রকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া মস্তকে একবার ও ললাটে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন, তাবপর শৈবীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কৈ, খণ্ডী কোথা? মাতৃস্নেহের এই অভিব্যক্তি শৈবী পাষাণ পুত্তলিকার মতই স্থির দাঁড়াইয়া যেভাবে অগ্নিপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিল অপর কেহ দেখিলে তাহাকে উন্মাদ ভাবিত। কিন্তু কেহ দেখে নাই। এখন দেবীর কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি কেমন একটী অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল,—বোধ হয় বাহিরে কোথাও গিযেছেন,—আর্য্য এসেছেন, হয়ত বা তাঁরই কাছে গিয়েছেন। বলিয়া শৈবী বাহিরের পথে অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদেই অগ্রসর হইল। এমন সময় খণ্ডী প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে দেবীকে দেখিয়াই প্রণত হইল। দেবী বলিল,—

খণ্ডী! গতকাল ও পরশু এই দু'দিন এখানে তুমি ছিলেনা, কোথায় গিয়েছিলে? শুনলাম কোথায় এক দুর্গ অধিকার করতেই যেন গিয়েছিলে? শুনিয়া খণ্ডী বলিল,—দুর্গ অধিকার? হায়, হায়, দেবী মহাবীর রক্ষা করুন। শুনিয়া দেবী বলিল,—তা নয়, তবে কি?

খণ্ডী বলিল,—দেবী বিদ্রার সঙ্গেই ত গিয়েছিলাম গর্গশীলায়, সেখানে প্রবীর বর্ম্মার দুর্গে তাঁর পার্ব্বত্য শৈব প্রজারা একটা উৎসব করেছিল। তিনি তো কলহনগড়িতেই ব্যস্ত ছিলেন তাই বিদ্রাদেবীকেই যেতে হোলো আর আমাকেই নিয়ে যেতে হোলো তাঁকে, রক্ষক হয়ে।

ও—এই-ই কথা—এদের কাকে বলে যাওনি কিনা তাই গর্গশিলা দুর্গের উৎসব ব্যাপারের বদলে দুর্গ অধিকার করতে গিয়েছে এই কথাই রটিয়েচে। তা তুমি ফিরে এলে কবে, বিদ্রাও এসেছেন ত?

কাল সন্ধ্যার একটু আগেই এসে পৌছেচি, আর আজই প্রাতে আর্য্যও ফিরে এলেন কলহনগড়ি থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মহামাত্যের কাজের চাকা ঘোরা আরম্ভ হয়ে গেল, এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আজ আর কারো নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর ছিল না। সন্ধ্যার পর ছুটী পেয়েছিলাম, তাই আমাদের আড্ডায় গিয়ে দেখি এই সব ব্যাপার, বলিয়া নিদ্রিত গানপতের দিকে দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিল, তাহার ভাবটী এই যে, এখন আজ রাত্রের মত একে ফেলে ত যাওয়া যায় না এ অবস্থায়।

তখন গানপতের জননী বলিল,—কাল নগর প্রদক্ষিণের ব্যাপার, তাই না? মহামাত্য কেন যে ওকে নৌবিহারে অনুমতি দিলেন, তুমি যখন ছিলে না সঙ্গে, তা জানি না। খণ্ডী বলিল, বন্ধু ধুন্ধু সহদেব যে ছিল। দেবী বলিলেন,—তা হলে তুমি আজ যদি এখানেই থাকো তবেই আমার শান্তি। ভোরে দুজনে একসঙ্গে—এই কথাটী তাঁহার মুখে শেষ হইবার পূর্ব্বেই অতীব চঞ্চলা শৈবী তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া দেবীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—কেন দেবী, আর্য্য খণ্ডীবর্ম্মাকে এখানে থাকতে হবে,—আমরা কি তাঁকে ভোরে তুলে দিতে পারবো না? তাহার কথা শুনিয়া দেবী বলিল,—তুই থাম শৈবী, সব কথায় তুই কেন কথা বলবি? শোন খণ্ডী, তুমি তাহলে থাকো এখানে,—ভোরে উঠে দুজনে যেও। আমি তা হলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি ত রাজী আছি থাকতে, আর সেই উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম,—কিন্তু শৈবী তো দেখছি তাতে রাজী নয়—মৃদু হাসিয়া খণ্ডী এই কথা বলিয়া নিকটস্থ আসনের দিকে অগ্রসর হইল! দেবী তখন শৈবীর উপর রুষ্ট হইয়া বলিল,—শৈবী, তুই দূর হ' এখান থেকে, আমি দেখছি আমার সকল বিষয়েই তুই আগে এসে কথা কোস—চলে যা এখান থেকে। বলিয়া রোষপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

এবার খণ্ডী তৎপর হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল,—দেবী, এ অবস্থায় গানপৎকে সেবা-যত্নে সুস্থ করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না মনে করেই কথাটা বোলে ফেলেছে,—এ কথা কি আপনি জানেন না? শুনিবামাত্রই লজ্জা ও অপমানে অস্থির হইয়া দুই হাতের করতলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে শৈবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সেখানেও রক্ষা পাইল না।

অটবী নামে দেবীর অপর এক দাসী ছিল—যে দুর্ব্বলতা শৈবীর ছিল গানপৎ সম্বন্ধে অটবীরও সেই দুর্ব্বলতা পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিম্বা দেবীকে শৈবী গানপতের ঘরে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার পক্ষে এ লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইল; কাজেই, সেও আসিয়াছিল এবং সবার অলক্ষে উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। এখন শৈবী যখন দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত চিত্তে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল অমনি সে তাহার পিছু পিছু আসিয়া বলিল,—কেন তুই চাঁদে হাত বাড়াতে গেলি,—সখি,—আ—হা—,

শৈবী অটবীকে এখানে দেখিবে আশাই করে নাই, এখন সে তাহার

দুর্গতিটাও দেখিতে পাইয়াছে—দেখিয়া ক্রোধে তাহার গা জ্বলিয়া গেল,—সে অশ্রুধারা সিক্ত মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া তাহার দিকে রোষকশায়িত নয়নে অগ্নিময় একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—ডাইনী! তোর লজ্জা নেই—? এখানে রঙ্গ দেখতে এসেছিস,—তুই দূর হ'য়ে যা রাক্ষসী! তোরও একদিন আসছে।

মনে মনে নয়, অটবী একেবারেই জোর গলায় বলিয়া দিল,—সেও ভাল, সেদিন আমার আসুক না, তোর ঐ মুখে ফুল চন্দন পড়ুক না, সখী!—তবুও একটু জীবন সার্থক হবে তো!

এগার

সেই রাত্রেই,—সংসারের করণীয় সকল কিছুই শেষ করিয়া দেবী বিদ্রাঙ্গী পরিচারক, পরিচারিকা ও দাসীদের বিদায় দিল। তারপর উৎকৃষ্ট গৃহিণীর যাহা কর্ত্তব্য, যথাস্থানে সকলেই শয়ন করিল কিনা, গৃহের সকল স্থান দেখিয়া সর্ব্বশেষে শয়নের পূর্ব্বে বস্ত্র ও অলঙ্কার উন্মোচন করিতে যখন একবার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল তখন রাত্র প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি,—চাঁদ উঠিতে এখনও অনেক দেরী। শরৎকাল, তেমন ঠাণ্ডা পড়ে নাই, তখনও তাহাদের বাহিরে প্রশস্ত বারান্দায় শয়নই চলিতেছে। শয়ন কক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত চত্তরেই শয়নের খাট দুখানি, তার উপর বিছানা পাতা। সামনেই অন্দরের উদ্যান প্রাঙ্গণ; সুতরাং প্রচুর হাওয়া। দাসী ও পরিচারিকাগণ প্রাঙ্গণের ঠিক অপর অংশেই থাকে ও ভৃত্যবর্গ বহিরাঙ্গনেই শয়ন করে। তস্করাদির উপদ্রব তখনকার দিনে মোটেই ছিল না, দরিদ্রজনেরও আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর ছিল;—কাজেই গৃহস্থ, ধনী, নির্ধন সবাই রাত্রে ঘরের বাহিরে নিরুদ্বেগে ও সুখেই নিদ্রা যাইত।

এখন দেবী বিদ্রা, শয়নের পূর্ব্বে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্তিমিত দীপালোক উজ্জ্বল করিয়া দিল; তারপর প্রথমে বাহুসংস্থিত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া গজদন্ত নির্ম্মিত পেটিকা মধ্যে রাখিল। কণ্ঠহার এবং মণিবন্ধ হইতে গুরুভার কঙ্কণও খুলিয়া পেটিকাজাত করিল। তারপর বক্ষের মূল্যবান শিল্পখচিত, পৃষ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত বিচিত্র উরাভরণ দাসীর সাহায্য না লইয়াই খুলিয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত গজকাষ্ঠে রক্ষা করিল। শেষে পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া হালকা একখানি কার্পাসবস্ত্র কটিদেশে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া শয়ন স্থানে গেল।

স্বামী-স্ত্রী একত্র শয়নের ব্যবস্থাই ছিল। সারাদিবসের শ্রমে ক্লান্ত প্রবীর আগেই শয়ন করিয়াছিল; প্রায় তিন দণ্ড গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, এখন তাহার নাক ডাকিতেছিল। বিদ্রা যখন আসিয়া নিজ শয্যায় উপবেশন করিল, পা দুখানি তখনও উঠায় নাই, এমন সময় দুখানি কাঠে ঠোকাঠুকি হইলে যেমন শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উদ্যান প্রাঙ্গণের দিক হইতেই তাহার কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল, দূরে যেন একটি মানুষ মূর্ত্তি বোধ হইল। সে ফিরিয়া পাশের বিছানায় একবার দৃষ্টিপাত করিল যেখানে নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে ক্লান্ত প্রবীর, চিৎ হইয়া শুইয়া হাত দুখানি তাহার বুকের উপর রাখা। ঐ

সময়েই, যেমন বিদ্রা উঠিতে যাইবে প্রবীরের কণ্ঠ হইতে একটা ভয়মিশ্রিত কাতর স্পন্দনের মত বিকৃত শব্দ বাহির হইল। শুনিয়াই বিদ্রা তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হাত দুখানি বুক হইতে নামাইয়া স্কন্ধে হাত দিয়া সযত্নে পাশ ফিরাইয়া দিল। প্রবীর পাশ ফিরিয়া শুইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল, আমি কি কেঁদে উঠেছিলাম, বিদ্রা? বিদ্রা বলিলেন, অনেকক্ষণ চিৎ হয়ে বুকে হাত রেখে শুলে ঐ রকম হয়। হয় তো কিছু ভয়ের স্বপ্ন দেখে থাকবে;—ও কিছু নয়, তুমি ঘুমাও—আমি একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দি।

না, না, না, দোহাই তোমার,—তা হলে আমি মোটেই আর ঘুমাতে পারবো না। তুমি শোও বরং, আমি ঘুমাই।

বিদ্রা শুইল।—আজ প্রবীর অতিশয় ক্লান্ত,—কাল তাহাকে ভোরে উঠিয়াই মার্ত্তণ্ড মন্দিরে যাইতে হইবে, সুতরাং দীর্ঘকাল অদর্শনের পর আজিকার রাত্রি তাহার পক্ষে সুখের না হইলেও আগামী প্রভাতের রাজদর্শনাদি আনন্দের আশায়, নানা ভাবের চিন্তায় এবং উত্তেজনায় বিদ্রার ঘুম আসিল না, ইহা ব্যতীত যে লোকটী ঐ শব্দ করিয়াছিল, তাহার কথাও মনে আছে। অল্পক্ষণেই প্রবীর আবার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

বিদ্রা যখন দেখিল প্রবীর ধীরে ধীরে সুস্থভাবেই নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন সে যেন আর একবার সেই শব্দের অপেক্ষা করিল। অল্পক্ষণেই উহা আবার শুনা গেল। তখন প্রবীর বেশ ঘুমাইয়াছে। ধীরে ধীরে বিদ্রা উঠিল, আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পেটিকা হইতে কি একটা লইল তারপর দেওয়াল হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা উত্তরীয় মধ্যে গোপনে লইয়া বাহির হইল, এবং নিঃশব্দেই প্রাঙ্গণে অবতরণ করিল।

যে ব্যক্তি শব্দ করিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লাঠিহাতে কতকটা কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রণামান্তর,—দেবী ঐ দিকে চলুন, বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। বিদ্রা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কুঞ্জবনে প্রবেশ পথে একটি অনতি উচ্চ দারুনির্ম্মিত তোরণ ছিল, তাহার দুই দিকেই যে দুইখানি পাষাণময় আসন ছিল তাহারা সেইখানে আসিয়া পৌছিলে বিদ্রা একখানিতে উপবেশন করিল। সে ব্যক্তি কতকটা ব্যবধানে দাঁড়াইয়াই রহিল, বসিল না। বিদ্রা বলিল,—আগে বল তুমি খোঁড়াও কেন?

সে বলিল,—জানুর উপরেই একটু আহত হয়েছিলাম। বিদ্রা জিজ্ঞাসা করিল,—কলহনগড়ীতে কি যুদ্ধ হয়েছিল? সে বলিল, যুদ্ধ মোটেই নয়,—দলপতিকে ধরবার সময় কয়েকজনে কতকক্ষণ হাতাহাতি হয়েছিল মাত্র। সে কথা পরে শুনবেন দেবী,—এখন আপনাব কথাটা শীঘ্র শুনে যদি আমায় মুক্তি দেন, আমি অত্যন্ত অবসন্ন।

বিদ্রা বলিল, তুমি বোসোনা ঐখানে?

সে বলিল, না, দেবী, সাধ্য থাকলে ঐখানে বসতাম কিন্তু আমি তা পারি না; অস্ত্রের আঘাতটা এমন জায়গায় যে এক দাঁড়াতে পারি, না হয় শুতে পারি, বসবার যো নেই। শুনিয়া বিদ্রা সস্নেহে বলিল,—বলো, তাহলে তোমার কথা;—বলিয়া উৎসুকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সে বিনম্রাবনত কণ্ঠে বলিল, আপনার অনুমান সম্পূর্ণই সত্য, দেবী, সেই ভুজঙ্গিনী আপনার স্বামীর পিছনে পিছনে অত দূরেও গিয়েছিল এবং বরাবরই ছিল।

বাধা দিয়া বিদ্রা বলিল,—সেই কলহনগড়ীতে, ঐ একপক্ষকাল পর্য্যন্ত সে ছিল?

সে বলিল, হাঁ দেবী,—যতদিন আর্য্য মহারথী ওখানে ছিলেন, ততদিনই ছিল।

শুনিয়া বিদ্রা জিজ্ঞাসা করিল,—দুজনে নিভৃতে দেখাশুনো হয়েছিল কি? উত্তরে সে বলিল,—দুবার হয়েছিল, প্রথমে সে লিপি পাঠায়, তারপর সেই লিপি পাইয়া আর্য্য তাহার স্থানে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় বারে তিনি আপনিই গিয়েছিলেন। শুনিয়া বিদ্রাঙ্গী অনেকক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। পরে প্রশ্ন করিল,—তাদের আলাপ শুনেছিলে কিছু? সে উত্তর করিল,—সামান্য শুনেছিলাম, ব্যবধানটা বেশী ছিল বোলেই বিশেষ কিছুই বুঝতে পারিনি। তাছাড়া, এই আঘাতটা বাধা দিয়েছিল প্রথম। তারপর দ্বিতীয় বাধা,—

বিদ্রা বলিল, দ্বিতীয় বাধা কি? সে বলিল,—মহামাত্যের গুপ্তচর ছিল তাঁদের ও আমার মাঝে। শুনিয়া বিদ্রা চমকিত হইয়া বলিল,—সর্ব্বনাশ, সে কি করতে গিয়েছিল সেখানে?

বোধ হয় আর্য মহারথী এ ব্যাপারে কতকটা অপরাধী তাই মহামাত্যকে জানাতে চায়। রাজকার্য্যের মধ্যে এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে নারী সঙ্গে রাখা অপরাধ ত? আমার বোধ হয় এ ব্যাপারটা সে হঠাৎ সেখানেই আবিষ্কার

করে থাকবে, তারপর সত্য যেটুকু তাহাই মহামাত্যের গোচর করবে বোলেই গিয়েছিল সেখানে। শুনিয়া বিদ্রা জিজ্ঞাসা করিল,—সে তোমায় দেখেছিল নাকি? উত্তরে সে বলিল,—না, আমি তাকে আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তাই সাবধান হতে পেরেছিলাম, সেই কারণে খুব কাছ থেকে তাদের কথা শুনতে পাইনি। তবে এইটুকু স্থির তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি যে, আর্য্যরথীর অজ্ঞাতেই সে গিয়েছিল, সে এখনও তাঁর স্নেহ বা তাঁর প্রেমের প্রতিদান পায় নি। তিনি এখনও তাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন নি, কারণ প্রসঙ্গ ক্রমে তাকে তিনি একবার, ছদ্ম ডাইনী, বলেই সম্বোধন করেছিলেন। আসলে সেই নারী মহা সাহসিনী,—একেবারে যেন মরিয়া। ঐটুকুই তার কথা জানি?

—আচ্ছা, ওখানকার কর্ম্মক্ষেত্রে, বিদ্রোহ দমনে দক্ষতার কি কোন অভাব আর্য্যরথীর কর্ম্মে ছিল যাতে আর্য্য মহামাত্যের গুপ্তচর এতটা অনুসন্ধানী হয়ে তাঁর পিছনে লেগেছিল?

সে বলিল,—গুপ্তচরের কাজটা বড় কঠিন দেবী; বিশেষতঃ ওখানে যে লোকটী ছিল সে আর্য্য মহামাত্যের কর্ম্মপন্থা খুব ভালই জানে। কোন মিথ্যা, অতিরঞ্জিত খবর তার পক্ষেই বিপদজনক একথা আর্য্য মহামাত্যের গুপ্তচরেরা যেমন জানে এমন বোধ হয় আর কেউ নয়। কাজেই, সমস্ত কলহনগড়ীর ব্যাপারটা, আর্য্যরথীর সেখানে পৌছানো থেকে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত বাস্তবিক যা যা ঘটেছিল তা ছাড়া আর কিছুই বলবার অধিকার ত নেই তার। তবে ঐ পুষ্পদত্তার কথা, আর্য্যরথীর পিছনে পিছনে তার ধাওয়া। এটা সেখানে যাবার পর সে আবিষ্কার করলে,—তার পক্ষে নূতন সংবাদ এটা। কাজেই, উভয়ে যে কথা হয়েচে, তা যদি ঠিক ঠিক শুনতে পেয়ে থাকে তবেই সে ঠিক জানতে পেরেছে—রাজকার্য্যের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নেই, তাই আমি মনে করচি; হয়তো এ ব্যাপার সে আর্য্যগুরুর গোচরে নাও আনতে পারে। গুপ্তচরদের উভয় সঙ্কট কিনা···

—আচ্ছা তুমি চেনো আর্য্য মহামাত্যের গুপ্তচরটিকে? বিদ্রা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে সে বলিল,—সে তো আর্য্যরথীর নিজ বিভাগের অধীনস্থ একজনই। গত বৎসর এমনই সময়েই সে একটা বিশেষ ব্যাপারে নিজ দক্ষতায় আর্য্য মহামাত্যের কাছে গুপ্তচরের শপথ গ্রহণ করেচে। শুনিয়া বিদ্রা বলিল,—তুমি মহামাত্যের গুপ্তচরদের চেনো? সে বলিল,—আমার সাধ্য কি, তবে একে ঐ কলহনগড়ীতে আমি সেই রাত্রেই চিনেছিলাম একবার একই ক্ষেত্রে কাজ

করেছিলাম বোলেই—তা ছাড়া চিনতে পারলেও অপরিচিতের মতই থাকতে হবে—এই নিয়ম।

—আচ্ছা, তুমি গুপ্তচরদের ব্যাপার এতটা খুটিনাটি জানলে কি করে?

—কোন একদিন আর্য্য মহামাত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত হতে পারবো, তাঁর অনুগ্রহ পাবো, এই আশায়।

আচ্ছা, এখন তোমার আঘাত পাবার কথাটা বলে চলে যাও; সংক্ষেপেই বোলো। তোমার আঘাত কি গুরুতর? সে বলিল,—না দেবী, গুরুতর হলে কি আজ আসতে পারতাম এখানে? হয়েছিল কি,—বিদ্রোহীদের দলপতিকে ধরতে গিয়ে সামান্য সংঘর্ষ বেধেছিল। তাতেই পায়ের উপর দিকেই একটি ভল্লের চোট লাগে মাংসপিণ্ডের উপর,—অস্থি চূর্ণ হয়নি।

বিদ্রা বলিল,—কটিদেশের নীচে আঘাত করলে সে? দ্বন্দ্বনীতি জানে না এমনই মূর্খ তারা।

সে বলিল,—মূর্খ সে নয় দেবী, এমন বেকায়দায় তাকে ফেলেছিলাম যে তার প্রাণ যায় তখন, আমায় কোনরকমে আঘাত দিয়ে সে সামলাবার চেষ্টা করেছিল, তাই ঐ আপৎকালে আঘাৎ সম্বন্ধে অতটা ন্যায় বিচার করতে পারেনি।

বিদ্রা বলিল,—আচ্ছা, এখন তুমি যাও,—এই নাও তোমার পুরস্কার,—বলিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার সদ্য-প্রসারিত হস্তে একটি বস্তু, বোধ হয় যেন স্বুবর্ণ নিস্ক পূর্ণ থলি ফেলিয়া দিল।

গ্রহণ পূর্ব্বক সে প্রণাম করিল এবং ধীরে ধীরে অপসৃত হইল।

সে ব্যক্তি আর্য্য মহারথী প্রবীর বর্ম্মার অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ পার হইয়া যেভাবে আসিয়াছিল সেইভাবেই উদ্যান প্রান্ত অতিক্রম করিয়া প্রথমে চারিদিক দেখিয়া ধীরে ধীরে পথে পড়িল। সে গুটি গুটি বড কষ্টেই চলিতেছিল। পথের সে দিকটায় খণ্ডী বর্ম্মার বাসস্থান, তাহার কক্ষগুলি, প্রাঙ্গণ প্রান্তে ভৃত্যবর্গের স্থান, তারপর অশ্বশালা প্রভৃতি। পথে পড়িয়া যখন সেই স্থানটি অতিক্রম করিতেছিল এক ব্যক্তি পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়াই দৃঢ় এবং সবল হস্তে তাহার মণিবন্ধ মুষ্টিগত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিল,—কে তুমি?

উভয়েই দাঁড়াইয়া গেল।

আমাদের আহত পথিকটিও বলবান কম ছিল না। তবে বল অপেক্ষা বুদ্ধিই তাহার মধ্যে ছিল বেশী প্রখর। এখন সে, মুহূর্ত্তেই এ ক্ষেত্রে তাহার কর্ত্তব্য

স্থির করিয়া লইল এবং উত্তরে বলিল,—কেন বন্ধু! আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ জিজ্ঞাসার কিছু দরকার আছে না কি?

সে বলিল,—তুমি ত দেখছি একজন পাকা চোর; ভারি চালাক তো, আমায় বন্ধু সম্বোধন করো কোন্ সাহসে?

পথিক বলিল,—সহজে তুমি সতীর্থকে এক দৃষ্টিতেই চিনে ফেলছ দেখচি! ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—চাতুরী রাখো, এখন হয় পরিচয়টি দাও, না হয় চলো আমার সঙ্গে। পথিক বলিল,—কোথায় নিয়ে যাবে মিত্র, এতটা রাত্রে?

উত্তর হইল,—নগরপালের স্থানে। শুনিয়া পথিক বলিল, সে তো অনেকটা দূর, তার চেয়ে কাছে পিঠে কোথাও নিয়ে যেতে পারো না বন্ধু! এত রাতে কেন তিনটি মহাপ্রাণকে কষ্ট দেবে, এতে লাভ কি তোমার?

তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল,—কোথায় যেতে চাও তুমি?

—তোমার ঘর কোথা, কাছে না দূরে?

—খুব কাছে এইখানেই, কেন বলতো?

—তা বলচি, তার আগে একটা প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেবে? অবশ্য যদি প্রসন্নমনে উত্তর দাও ত বলি?

—কি বলতে চাও, শঠরাজ, বলেই ফেল না, এত ভণিতা কেন?

—তোমার কি কোন প্রণয়িনী আছে, অথবা তুমি কি কৃতদার?

—না, আমি এখনও কুমার, কেন বলতো?

—বেশ, আমি বলছিলাম কি, যদি একান্তই তুমি এখন আমায় না ছাড়তে

চাও তাহলে চল না ভাই আজ এক সঙ্গেই দুজনে রাতটা কাটিয়ে দি, তারপর কালকে প্রাতে যা ভাল বিবেচনা কর তাই করবে।

—তা মন্দ বলোনি ; আচ্ছা তুমি এখানেই থাকতে চাইছ কেন বলতো ?

—তাহলে আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে।

—বলেই ফ্যালোনা, তুমি একটি বড়ই ধোঁকা-বাজ লোক দেখছি ?

—তোমার এখন বয়সটা কি চল্লিশ পেরিয়েছে, চোখে চালসে ধরেনি তো ? উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—না, না, এই বৎসর আশ্বিনেই আমার চব্বিশটি শরৎ পূর্ণ হল, কেন, কেন ?

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—কেন কেন, আবার প্রশ্ন করচো, দেখছ না আমি আহত। শুনিবামাত্রই দ্বিতীয় ব্যক্তি হাতটা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল, বলিল, আমি ঠিক ভেবেছিলাম যেন তুমি ভান করেই ভগ্ন পদের অভিনয় করেছিলে। আহা ! ভাই অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে, আমায় ক্ষমা কর তুমি, চলো বন্ধু !—কাছেই আমার ঘর। এখন সে তার দিকে ডান হাত বাড়াইয়া দিল, ধরো বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও দিল তাহার কাঁধটা। তখন সে তাহার কাঁধে ভর দিয়া চলিল।

চলিতে চলিতে আশ্রয়দাতা জিজ্ঞাসা করিল,—এখন বলবে তুমি কে ?

—আগে তুমিই বল না কেন তোমার পরিচয়টা, সেই তো হবে ঠিক ভদ্রতা, তাছাড়া আমিও তাহলে ভরসা পাই।

—আমি আর্য্যবীর খণ্ডীবর্ম্মার কিঙ্কর, এখানে ভট্টদাস নামেই পরিচিত, তুমি ?

—আমি আর্য্য মহারথী প্রবীরবর্ম্মার অধীনস্থ একজন রথসৈনিক, নাম আমার রামবাণ।

—এত রাত্রে এখানে এসেছিলে কেন, কি প্রয়োজনে বলতে কি বাধা আছে ?

—সে একটা বিশেষ গোপন কথা, ধরো একটা খবর দিতে এসেছিলাম। এবার বল তুমি এখানে কি করছিলে ?

—আমি ত রোজ প্রভুর আশাপথ চেয়েই জেগে থাকি। শুনিয়া রামবাণ বলিল,—তোমার প্রভুভক্তি আদর্শ বটে, কিন্তু কাল সম্রাটের নগর প্রদক্ষিণ, পুণ্য শোভাযাত্রার মধ্যে তাঁর বিশেষ একটি স্থান ত নিশ্চয়ই আছে, আর তা সত্ত্বেও আজ এখনও তিনি বাইরে ? এবার ভট্টদাস বলিল, আমার প্রভু কুমার,—সুতরাং নিশাচর, রাত্রে নিজ ঘরে, নিজ শয্যায় তাঁর ত ঘুম হবার কথা নয় বন্ধু। কুসুমপুরের কুসুম তোরণ ত তাঁদের জন্যই, একথা কি জানোনা ?

উভয়ে যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিলে ভট্টদাস, রামবাণকে তাহার শয্যায় বিশেষ

যত্নপূর্ব্বক শোয়াইল, কারণ সে বসিতে পারিবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে তাহার ভোজন হইয়াছে কিনা এবং আহত স্থানে প্রলেপ পড়িয়াছে কিনা? সে বলিল,—সে সব ঠিকই আছে মিত্র, এখন চাই কেবল বিশ্রাম। এসোনা দুজনেই শুয়ে পড়ি। ভট্টদাস বলিল—বন্ধু, এখন তুমি শোও আমার অন্য কাজ আছে।

রামবাণ বলিল,—প্রভুর জন্য অপেক্ষা, তাতো বিছানায় শুয়েই হতে পারে,—আমরা তো এখনই ঘুমিয়ে পড়ছিনা? যদিই বা তা হয়, দরকার হলে তিনিই ডেকে তুলবেন। ভট্টদাস বলিল,—না ভাই, শুধু তা নয়, তাছাড়াও অন্য কাজ আছে। শুনিয়া রামবাণ চিন্তিতভাবেই বলিল,—এতরাত্রে অন্য কাজ? আসল কথাটা কি খুলে বলই না, বন্ধু। রামবাণের কথায় ভট্টদাস কিছুক্ষণ চুপটি করিয়া রহিল, শেষে তাহার হাতখানি রামবাণের বুকের উপর কোমল ভাবেই রাখিয়া বলিল,—একান্তই শুনবে যদি বন্ধু, তাহলে চুপি চুপি বলি, শোন, বলিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া বক্তব্য নিবেদন করিল। শুনিতে শুনিতে তখনকার মত আঘাত যন্ত্রণা ভুলিয়া, অন্তরে সুখী রামবাণ হাসিয়া বলিল,—তাহলে সব প্রাণটাই প্রভুকে দাওনি, কেমন?

বারো

আজ মহারাজের নগর প্রদক্ষিণ। এই শুভ দিনে ঠিক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুভ এবং পবিত্র মূহূর্ত্তে মহারাজ রাজপথে প্রজাসমষ্টিব নয়নগোচর হইবেন। নগরের শোভা, রাজপথের দুই পার্শ্বে সমবেত জনপদবাসিগণের উল্লাসমুখর রাজপথের বিচিত্র ছবি, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বতোমুখী অভিব্যক্তি, দিগন্তে বিস্তৃত বিভিন্ন বস্তুর বর্ণ-বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই যে প্রজা সাধারণের চক্ষে মহারাজের প্রকাশ, সেই পুরুষোচিত পরম রূপবান, প্রকট রাজমূর্ত্তি দেখিবার আগ্রহ মহানগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। কখনও রথে, কখনও গজে, কখনও বা অশ্বারোহণে বাহির হইতেন, কিন্তু মহারাজ এবার চতুর্দ্দোলে বাহির হইবেন। কতদিনের আকাঙ্ক্ষা এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য নগরবাসী একপক্ষ পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া অপেক্ষায় রহিয়াছে। রাজপথের দুই পার্শ্ব এবং অট্টালিকা শ্রেণীর সম্মুখের বাতায়ন, অলিন্দ্য প্রভৃতি নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের উৎসবের অলঙ্কার, বেশভূষা, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র ও নয়নবিমোহন উত্তরীয় সকল তীব্রভাবেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। রাজপথের দুই পার্শ্বে যেন বিচিত্র উষ্ণীষশোভিত মস্তকের সমুদ্রবিশেষ। যেদিকে চাহিবে সেই দিকেই সকল বয়সের অসংখ্য নগরবাসীর সমাবেশ। অপরূপ সুন্দরী পুরনারীগণ, কোমল হস্তে পুষ্পমালা, কুঙ্কুম এবং অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত নানাবিধ উপহার বিবিধ আধারে লইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে মহারাজের চতুর্দ্দোলের অপেক্ষা করিতেছিল।

রাজপথের উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ এবং তৎসন্নিহিত অট্টালিকা শ্রেণী বিবিধ পতাকা এবং বহুবিধ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে এবং পদ্মপুষ্পপত্রে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করা হইয়াছে, কিছুরই অভাব নাই। আমাদের দুই বন্ধু যথাকালে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত পুরঙ্গনাগণের ভীড় দেখিয়া তাহারা দ্বিতল হইতে নিম্নতলে আসিয়া অলিন্দের একটি স্তম্ভের কোলেই দাঁড়াইল। এইক্ষণেই মহাকাল হইতে শোভাযাত্রা, রাজপথে তাহাদের দৃষ্টির গোচরে আসিয়া পড়িল।

শোভাযাত্রার আরম্ভে, তাহারা বিস্ফারিত নয়নে দেখিল, সর্ব্বাগ্রে শ্বেতবর্ণের নানালঙ্কারভূষিত অশ্বে এক সুসজ্জিত অশ্বারোহী রাজপুরুষ এক হস্তে অশ্বরজ্জু

পৃষ্ঠেবদ্ধ দণ্ড পতাকা, তূর্য্যধ্বনী করিতে করিতে গর্ব্বিত অশ্বের পৃষ্ঠের আসন সগর্ব্বে অধিকার করিয়া, তুরঙ্গের গতিছন্দে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কি চমৎকার স্বুবর্ণমণ্ডিত কারু-খচিত দণ্ড, তাহার উর্দ্ধদেশে রক্তবর্ণ পতাকা বায়ুবেগে উড়িতেছে। তাহার পর একদল বাদ্যকর। বিশাল জয়ঢক্কা, এক একজন দীর্ঘ, বলিষ্ঠ শরীর, বিচিত্র উষ্ণীষ ও বস্ত্রশোভিত বাহকের পৃষ্ঠে সংযোজিত এক সার, ঠিক তার পশ্চাতেই দুই হাতে দুইটি দণ্ডদ্বারা তালে তালে পিটিতে পিটিতে মহা উৎসাহে বাদকশ্রেণী চলিতেছে। সে শব্দ যেন বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কানে তালা লাগাইয়া দেয়। তার পরেই আবার এক সার বিশাল বাদ্যভাণ্ড কোটিদেশে বদ্ধ, দুই হাতে বেত্রদণ্ডদ্বারা অগ্রবর্ত্তী জয়ঢাকের তালে তালে পিটিতে পিটিতে যাইতেছে। তাহার পশ্চাতে ধামার মত আকৃতি একপ্রকার চর্ম্মবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আর একদল। প্রথমেই প্রায় শতাধিক বাদ্যবাদক, রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল। তারপর দীর্ঘাকৃতি সানাই ক্রমশঃ সরু হইয়া মুখের কাছে সরু আর চেপ্টা, ফুৎকারে নানা গ্রামে স্বর ছড়াইতে ছড়াইতে একদল অগ্রসর হইতেছে। সেই দলটি পার হইয়া গেলে কতকটা ব্যবধানে পশ্চাতে পতাকা ও দণ্ডধারী একের পর একটি দল, চারিটি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ, রণবাদ্যের তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে পঞ্চাশটি সার দিয়া চলিয়াছে।

তাহার পর আবার কতকটা ব্যবধান। এবার বিশাল রাজকীয় গজারোহী যোদ্ধগণ মিলিত-বাহিনী, ধীরে ধীরে গজপৃষ্ঠ বিলম্বিত ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। সে গজবাহিনীর কি অপরূপ শোভা। গজদল, শিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত, তাহার উপর তাহাদের প্রত্যেকের অলঙ্কারের আড়ম্বরও কম নহে। মুণ্ডের দুই পার্শ্বে কর্ণমূল হইতে মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় এক প্রকার অলঙ্কার আপাদলম্বিত, পদক্ষেপের তালে তালে দুলিতেছে। মস্তকে লৌহময় শিরস্ত্রাণ; তাহাতে স্বুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত নানা অলঙ্কার-খচিত। পৃষ্ঠে নানা রত্নালঙ্কারভূষিত আরোহী বীরগণ স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হাওদার আসনে উপবিষ্ট। হাওদার চারিদিকে চারিটি দণ্ড রোপ্যমণ্ডিত, উপরে বিচিত্রবর্ণের বহুমূল্য বস্ত্রের প্রান্তদেশে মণিমুক্তার ঝালর। প্রত্যেক গজে চারিজন বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে স্বুসজ্জিত ক্ষত্রিয় বীরাসনে উপবিষ্ট। এইরূপ পঞ্চাশটি শ্রেণীবদ্ধ গজারোহী সেনার পশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যশ্রেণী। কাম্বোজ, কেকয়, সিন্ধু, গান্ধার, ইরাণ, আরব হইতে সংগৃহীত শ্বেত, নীল, লোহিত, কৃষ্ণবর্ণের নানা জাতীয় যুদ্ধ অশ্ব সকল গর্ব্বিত বীর আরোহিগণকে পৃষ্ঠে ধরিয়া সগর্ব্বে গ্রীবা উন্নত করিয়া নানা ছন্দে

অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। সুসজ্জিত বাজীগণের কি অপরূপ গতি-ভঙ্গিমা! আরোহী ক্ষত্রিয় বীরগণের মস্তকে সুবর্ণখচিত লৌহ কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নময় সুবর্ণ হার, বক্ষে উরস্ত্রাণ, বাহুতে কবচ, নিম্নে বলয়, মুষ্টিতে অঙ্গুলিত্র। পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তুণীর, এক পার্শ্বে খেটক, কটিবন্ধের বামে তরবারি ঝুলিতেছে। বাম হস্তে রজ্জু এবং দক্ষিণ হস্তে শাণিত ভল্ল সূর্য্য-কিরণে বিদ্যুৎ বৈচ্ছুরণ করিতেছে।

মগধের ক্ষত্রিয়কুলতিলক, যবন বিজয়ী মহাবীর মৌর্য্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে কোনও প্রাচীন রাজবংশের এরূপ সুশিক্ষিত মহাশক্তিশালী অশ্বারোহী এবং বিচিত্র পদাতিক বাহিনী গঠন সম্ভব হয় নাই। এই প্রকার অশ্ব ও অশ্বারোহী সেনা-নির্ব্বাচন, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি, বিবিধ প্রহরণ-কুশলতা, সজ্জাবৈচিত্র্য, তাহাদের সংগঠন ও সময়োচিত সমাবেশ নন্দরাজগণের সময়ে চিন্তার অতীত ছিল। তাই এই সংস্কৃত, সুনির্ব্বাচিত অশ্বারোহীর বলেই মহারাজাধিরাজ বিখ্যাত গ্রীক্ সেনাপতি সেলুকাসকে বিপর্য্যস্ত এবং বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই সৈন্যবল সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল। যদি উত্তর ভারতের সেই সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে দেখা যাইত, যুদ্ধসংক্রান্ত সৈন্যপরিচালন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি উত্তর ভারতের মহাবলবিভাগের যে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন,—শিবির সন্নিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যূহ রচনা, সৈন্য সমাবেশ, এক কথায় মৌর্য্য রণনীতি, তখনকার ভারতের সর্ব্বত্রই যুদ্ধবীরগণের নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। সেই উন্নত সামরিক পদ্ধতি ও নিয়মাবলী পরবর্ত্তী যুগে বহু শতাব্দী বিশেষতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতের আদর্শরূপে চলিয়াছিল।

আজ অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রে অপূর্ব্ব বীরবেশে, সুবর্ণখচিত জালাময়ী লৌহবর্ম্মে সজ্জিত ঐ যে বীরমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, ইনি কোন সৈনিক? সেই গণপৎ দামোদর; গত রাত্রে যার মধুপানে সংজ্ঞাহীন দেহ খণ্ডীবর্ম্মা কুসুমতোরণ হইতে নিজ গৃহে আনিয়াছিল। আজ এ মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে গত নৌবিহারের নায়ক গণপৎ, যাহার জন্য বন্ধু খণ্ডীবর্ম্মার সারারাত্র উদ্বেগে কাটিয়াছে এবং জননীরও উদ্বেগের সীমা ছিল না। বীরত্বব্যঞ্জকমূর্ত্তি তাহার, উৎকৃষ্ট আরবটির উপর বহুমূল্য আসনে বসিবার ভঙ্গী দেখিলে সবার মনে একটা গভীর সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। এমনই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি বুঝি এই বাহিনীর মধ্যে আর কাহারও নহে। লক্ষ্য কোনদিকে নাই, কেবল সম্মুখে, নিজ গন্তব্য পথেই

নিবদ্ধ। অলিন্দ হইতে কত নবীনা, বোধ হয় শত শত রূপবতী ঐ মূর্ত্তির পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিল, যেহেতু গণপৎ এখনও কুমার—বহু সম্ভ্রান্ত কুমারীর আকাঙ্ক্ষার ধন, কিন্তু তাহার দিক হইতে এখনও কোনও প্রকার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই যাহাতে এমন বুঝা যায় যে, কুসুম তোরণের একজন ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি তাহার নিষ্ঠা আছে। যাহা হউক এখন এই শোভাযাত্রার মধ্যে অপূর্ব্বদর্শন অশ্বারোহী সেনার আবির্ভাব বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পাঁচশত শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী তালে তালে ঘুঙুর-মিলিত অশ্বপদশব্দে রাজপথ মুখরিত করিয়া অগ্রে চলিয়া গেল। তারপর কতটা ব্যবধান, এইবারে আসিল বিচিত্র কারুখচিত সুদৃঢ় ও নানাবর্ণে প্রভূতভাবে চিত্রিত শতাধিক যুদ্ধরথ। সে সকল রথ-মধ্যে বিবিধ আয়ুধ যথাস্থানে সংবদ্ধ, বিচিত্র বর্ণে ও অলঙ্কারে সুসমৃদ্ধ সেই যুদ্ধরথে গান্ধার দেশীয় সুপুষ্ট অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত প্রবীর বর্ম্মার রথখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মনোহর। রথগর্ভে দুই ধারে দুইজন বর্ম্মচর্ম্মে সুসজ্জিত পৃষ্ঠরক্ষক বীরমূর্ত্তি, সম্মুখেও সেইরূপ বর্ম্মচর্ম্মে সুসজ্জিত দীর্ঘশরীর সারথি। প্রবীর বর্ম্মাই অদ্য চতুরাশ্বরথে প্রথমেই ছিলেন। ইহার পরেই যুগ্মঅশ্ব সংযুক্ত রথশ্রেণী, খণ্ডীবর্ম্মাই ইহার প্রধান। কিন্তু তাহার মধ্যে কোনও উত্তেজনা ছিল না। সদা প্রফুল্ল রসিক নাগর বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। আজ তাহার মুখে কিন্তু তাহার অভাব বোধ হইতেছিল। একটা অসাধারণ গাম্ভীর্য্যে তাহার আসল রূপকে যেন ঢাকিয়াছিল।

ইহার পরেই খড়্গ, খেটক এবং সুদীর্ঘ ভল্লধারী পদাতি সেনা, বাহু মূলে ধনু সংবদ্ধ। তাহাদের মস্তকে উষ্ণীষ, বাহুতে কবচ ও অলঙ্কার, কটীতে বদ্ধ ভিন্দিপাল (ভোজালে), দীর্ঘ শরীর বলদীপ্ত, উজ্জ্বল চাহনি। প্রত্যেকেই শক্তিমান, মদগর্ব্বে অগ্রগামী বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে তূরীধ্বনি করিতে করিতে প্রায় শতাধিক ভল্লধারী পদাতি। আবার কতটা ব্যবধান। শঙ্খ, বিষাণ, জগঝম্প, বিশাল কাংস্যময় করতাল, নাকাড়া, দামামা, ঢক্কা মিলিত শতাধিক বাদক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহারোলে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া নৃত্যচ্ছন্দে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের উল্লাস দর্শকগণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাদেরও নাচাইয়া তুলিতেছিল।

এই বাদক সম্প্রদায়ের পর অল্প শূন্য ব্যবধান। তাহার পর বিশালবাহু, গুরুভার-রজতমণ্ডিত দণ্ডধারী, নানা-বর্ণের উষ্ণীষ শোভিত মস্তক, উদ্ধত দৃষ্টি পঞ্চাশ জন চলিয়া গেল। তারপর মহারাজের পুরুষ দেহরক্ষী পদাতিগণ অগ্রে

সেনাপতি বীর নৃসিংহ বলভদ্র দেব শ্বেতবর্ণ অপূর্ব্ব একটি গর্ব্বিত আরব-বাহনে, উৎসাহদীপ্ত বদনমণ্ডলে শ্রমজল ঝরিতেছে। এখন ঠিক তাঁহার পশ্চাতে কতক ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে, তাঁহার-সেবাদল অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে উভয় পার্শ্বস্থ জন-সমুদ্র হইতে হর্ষসূচক চাঞ্চল্য এবং একটি আনন্দের মৃদুরোল উঠিয়া একদিক হইতে সারা রাজপথ মুখরিত করিয়া অপর প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। একশত দেহরক্ষী পার হইয়া গেলে আবার কতকটা ব্যবধান। তারপর দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দে অধীর করিয়া স্বয়ং মহারাজের আরোহণের প্রিয় গজ,—মহেন্দ্র, দেখা দিল। তাহার বিশালাকৃতি মুক্তামালাঙ্কিত সুদীর্ঘ দন্তদ্বয়, বর্ণানুলেপন পারিপাট্য, আর অলঙ্কার সমাবেশের কথা কি বলিব! ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় হেলিতে দুলিতে আসিতেছে। পৃষ্ঠে সিংহাসনে উপবিষ্ট যুবরাজ বিন্দু, পশ্চাতে চামরধারিণী। চারিধারেই পুষ্পমালা ও শীর্ষে ছত্রটি ধরা আছে। স্বর্ণখচিত বর্ম্ম চর্ম্ম শোভিত যুবরাজের মুখে প্রসন্ন গাম্ভীর্য্য।

ইহার অল্প ব্যবধানে মহারাজের নির্ব্বাচিত নারী শরীর রক্ষীদল দেখা গেল। আবার একটা ঘন আনন্দের রোলে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। যেই মাত্র এই নারীসেনা অগ্রে শ্রেণীবদ্ধ বিচিত্র যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক তালে পদক্ষেপ করিতে করিতে সুমুখে আসিল, অমনি শ্রাবণের ভরা নদীতে বানের মত রাজপথ আলোড়িত করিয়া যেন হর্ষ কোলাহলের বান ডাকিয়া গেল। একদিক হইতে মহারাজের তটস্থ আবির্ভাবের এই সঙ্কেত অপর দিক পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল। সমগ্র দর্শকের দৃষ্টি সেই দিকে স্থির হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই একটা উত্তেজনাপূর্ণ দর্শনাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল।

এই নারী-দেহ-রক্ষী সাধারণের চক্ষে তখনকার দিনে এক বিস্ময়ের বস্তু এবং ইহার গৌরব সারা এশিয়াখণ্ড জুড়িয়া ছিল। সুদৃঢ় দীর্ঘ শরীর রক্তগৌরবর্ণ, ভ্রূকুটিপূর্ণ ঘন ভ্রূ, উজ্জ্বলচক্ষু এই নারীরক্ষিগণের প্রত্যেকেই সুন্দরী, পূর্ণ লাবণ্যময়ী, যৌবনোচিত সুকুমার অথচ দৃঢ় ভাবোদ্দীপক মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠে বেণী বিলম্বিত, মস্তকে উজ্জ্বল লৌহময় শিরস্ত্রাণ, সম্মুখে কতকাংশ স্বর্ণালঙ্কৃত, কর্ণে সুবৃহৎ স্বর্ণকুণ্ডল দুলিতেছে। বাহুতেও উজ্জ্বল লৌহময় কবচ, প্রান্তে স্বর্ণ রেখাঙ্কিত। নিম্ন বাহুতে কবচবদ্ধ স্বর্ণ বলয়। পীন-বক্ষে সূক্ষ্ম কারুখচিত চক্রাকার স্বর্ণসংযুক্ত উজ্জ্বল লৌহময় উরস্ত্রাণ। পার্শ্বে দক্ষিণ কটিতে বদ্ধ তীরগুচ্ছপূর্ণ চর্ম্ম-তূণীর, তাহাও হীন কারুকৌশলপূর্ণ নহে। বামে কোষবদ্ধ অসি ঝুলিতেছে। পৃষ্ঠেও চর্ম্মতূণীর, উহা বিষাক্ত বাণপূর্ণ এবং বক্ষের সঙ্গে

বাঁধা, অপর পার্শ্বে প্রকাণ্ড চর্ম্মখেটক, তাহারও কারুকার্য্য অপূর্ব্ব, দেখিলে ঢালের পরিবর্ত্তে একটা দানবের মুখমণ্ডল বলিয়া ভ্রম হয়। বামবাহুতে জ্যা-রোপিত সুদৃঢ় হ্রস্ব ধনু গোধালঙ্কৃত মুষ্টিতে ধরা আছে। দক্ষিণ-হস্তে তীক্ষ্ণশাণিত সুদীর্ঘ অসি সূর্য্যালোকে ঝলকিত হইতেছে। কটি হইতে আজানুলম্বিত সম্পূটিকা স্থূল পশুলোমে নির্ম্মিত, গাঢ় রক্ত ও পীত বর্ণে রঞ্জিত স্বর্ণালঙ্কৃত চর্ম্মবেষ্টনীতে আবদ্ধ। পদতল স্থূল বিনামালঙ্কৃত। সকলেই মাথায় সমান, চারিজনের এক একটি সার, এই ভাবে দশটি সারি সমান্তরালে,—অগ্রগামী বাদ্য সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে, আর দর্শকগণের প্রাণের মধ্যেও সেই ধ্বনির স্পন্দন বোধ করি প্রত্যেকেরই অনুভূত হইতেছে।

ইহার পরেই মহারাজের দোলা। তাহার দুই পার্শ্বেও দুইজন করিয়া নারী-রক্ষীর পাঁচটি সার রাজদোলার সাথে চলিতেছে। পশ্চাতে ঐরূপ অগ্রবর্ত্তী রক্ষকদলের ন্যায় দশটি সারি বর্ত্তমান থাকিয়া রাজশরীর রক্ষা করিতেছে।

যে চতুর্দ্দোল রাজশরীর ধারণ করিতেছে তাহার শোভার কথা আর কি বলিব! বিচিত্র উষ্ণীষ, পীত মিলিত লোহিতবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত শরীর, অগ্রে ও পশ্চাতে ত্রিশজন মহাবলবান বাহক সম্রাটের দীর্ঘ, অপূর্ব্ব অলঙ্কার-শিল্পে সমৃদ্ধ চতুর্দ্দোল বহন করিতেছে।

পীত, লোহিত ও নীল, কারুশিল্পের উপর এই তিনটি রং; তাহার উপর যে ভাবে স্বর্ণালঙ্কার ছন্দ এই বিচিত্র দোলার সর্ব্বাংশ অলঙ্কৃত করিয়াছে, দেখিলে মনে হয় যে, ইহা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, বিশেষতঃ সাধারণ শিল্পীর এ প্রকার কল্পনাই হইতে পারে না। ইহা প্রস্থে বিন্যস্ত তিনটি স্থূল দণ্ডদ্বারা বাহিত। সম্মুখের স্থূল দণ্ড, যাহা দশজন বাহকের স্কন্ধে রহিয়াছে—তাহার উপর-প্রান্তে এক প্রকাণ্ড সরীসৃপের মুণ্ড মুখব্যাদান করিয়া রাজশিল্পীর রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। মধ্যস্থলে বিস্তৃত স্থূল সুখকর আসন, ইহার রচনা অতুলনীয়। ঊর্দ্ধে মুক্তামণ্ডিত ঝালরসংযুক্ত রাজছত্র, তাহার উপর মহামূল্য চন্দ্রাতপ। পৃষ্ঠে পুষ্পালঙ্কৃত বেণী, অপরূপ লাবণ্যবতী দুইটি নারী-মূর্ত্তি দুই পাশে ব্যজন করিয়া রাজ-অঙ্গে মক্ষিকাদি বসিতে দিতেছে না।

চন্দ্রগুপ্তের মূর্ত্তিতে এখনও যৌবনের দীপ্তি এবং লাবণ্য, মুখমণ্ডলে বর্ত্তমান প্রৌঢ় বয়সের কোন রেখাই পড়ে নাই যদিও গত কার্ত্তিক হেমন্তে তাঁহার জন্মতিথির দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষোৎসব ঘোষিত এবং সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনও কেশ, শ্মশ্রু গুম্ফের কোথাও গাঢ় পিঙ্গল ব্যতীত পরিণত পক্ক কেশের আভাস

নাই। ক্ষৌরকারের খুর সংস্পর্শে বদনের সর্ব্বত্র মসৃণ, চিবুকের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র গহ্বরটি পর্য্যন্ত সুন্দর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুখে এক অপরূপ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। ভ্রূর নীচে ঘন পল্লবালঙ্কৃত চক্ষু দুটি গাঢ় নীল বর্ণের তারকা, রক্তাভ ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ; উহা কখনও স্থির নহে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নানা দৃশ্য-পথে ধাবিত হইতেছে।

মহারাজ সুখাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার স্বভাবতঃই গম্ভীর বদনে নানা ভাব খেলা করিতেছে। মস্তকে উষ্ণীষ-সংযুক্ত লঘু মুকুটের উপরে একখণ্ড বজ্রমণি আর নিম্নে ললাটে একখণ্ড কপোত-ডিম্বের আকৃতি মুক্তা দুলিতেছে। জনতার দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিয়া সম্রাট অভিবাদন গ্রহণের সুযোগে প্রসন্নভাবে মস্তক অবনত করিতেছিলেন, তাহাতে কর্ণে মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছিল। গলে একগাছি-মাত্র মুক্তমালা, তাহাতে সংবদ্ধ একখণ্ড বৃহৎ চক্রাকার মাণিক বক্ষের উপর প্রকাশিত রহিয়াছে। বামস্কন্ধ হইতে লম্বিত একখানি মাত্র উত্তরীয় কটিদেশ বেড়িয়াছে, এবং কটিতে বদ্ধালঙ্কারের সঙ্গে তাহা জড়িত রহিয়াছে। বামে মণিময় কোষেবদ্ধ একখানি কারুখচিত ক্ষুদ্র কিরিচ মাত্র। দীর্ঘ সুদৃঢ় বাহু-উর্দ্ধে রত্নময় কবচ, তাহার নীচে কেয়ুর, নিম্নবাহুতে রত্নবলয় মাত্র,—অনামিকায় একমাত্র সুবৃহৎ বজ্রমণিসংযুক্ত অঙ্গুরীয়ক। দক্ষিণ-বাহু আসনের দক্ষিণ বাহু-প্রান্তে মুষ্টিবদ্ধ। প্রশস্ত ললাট চন্দনে অনুলেপিত, মধ্যে কুঙ্কুমের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু। নিম্নাঙ্গে একখানি রক্তবর্ণ বারাণসী বস্ত্র পরিধেয়, চরণে লঘু পাদুকা। যোদ্ধবেশে মহারাজের সৌন্দর্য্যের যে খ্যাতি, তাহা তখনকার দিনে কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু এখন উৎসবের দিনে অনাড়ম্বর এই বেশে ও ভূষণে মহারাজকে দেখিয়া প্রত্যেকেই মুগ্ধ হইতেছিল।

মাঝে মহারাজ, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতেছিলেন, বিকৃত দৃষ্টিতে কেহ তাঁহার দিকে দেখিতেছে কিনা। গুরু চাণক্যের বাণী মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, উৎসবের মধ্যেও রাজার সর্ব্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে, মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের বিন্দু থাকিতে পারে। একজন শক্তিমান নরপতির শত্রু চারিদিকেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, দোলায় বসিয়াও একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আজিকার এই উৎসবময় নগর পরিক্রমার দিনে মহারাজ কোন অস্ত্রধারণ করেন নাই। আজ দ্বিসহস্রাধিক এই পূর্ণ বর্ম্মচর্ম্ম, বহুবিধ প্রহরণধারী শরীর-

রক্ষকের মাঝে, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকারে দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা যাঁহার অস্ত্র বহন করিতেছে, তাঁহার অস্ত্রধারণের সার্থকতা কোথায় ?
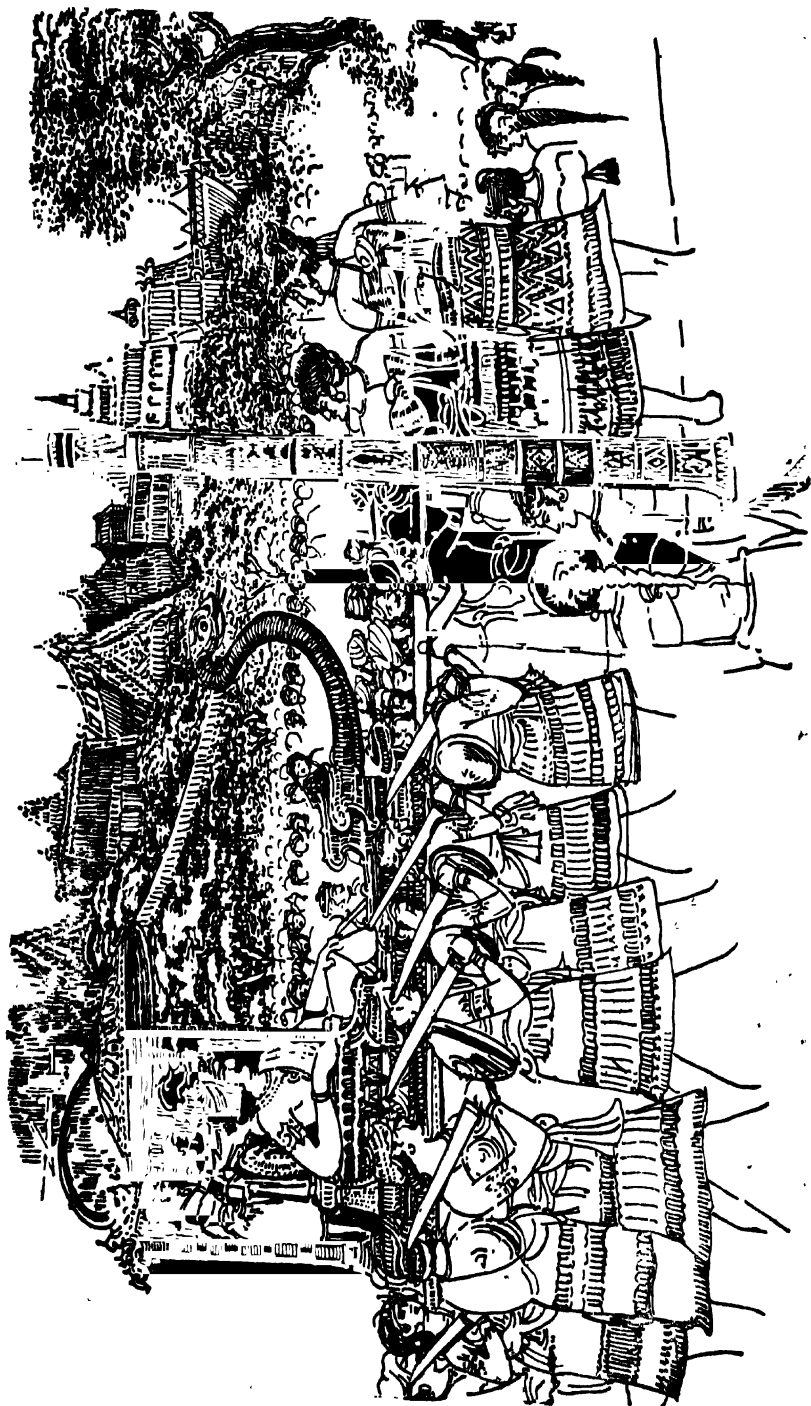
মহারাজের দোলা দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া যেন হর্ষ ও উল্লাসের একটা প্লাবন বহিয়া গেল। সে উল্লাস বর্ণনার ভাষা নাই। সুধু জয়ধ্বনিতেই শেষ নয়—বামে দক্ষিণে পশ্চাতে যুগপৎ শঙ্খরোলে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত হইতে লাগিল ;—সেই ঘোর রোলে যেন কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। তারপর শঙ্খ রাখিয়া পার্শ্বস্থ অট্টালিকা অলিন্দ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট বিচিত্রবর্ণ বস্ত্র ও অলঙ্কার শোভায় উজ্জ্বল, লাবণ্যময়ী পুরসুন্দরীগণের বদনমণ্ডলে পূর্ণ চাঞ্চল্য লক্ষ্যের বিষয় হইল। আনন্দে যেন উন্মত্ত হইয়াই তাঁহারা দুই দিক হইতেই পুষ্পমালা বর্ষণ সুরু করিলেন। অলক্ষিতে দোলায় উপবিষ্ট রাজশরীর পুষ্পভারে আচ্ছন্ন হইল। পার্শ্বরক্ষী ঝটিতি সে সকল সরাইয়া রাজপথের দুই পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আবার পূর্ণ হইতে লাগিল, এইভাবে চলিতে লাগিল কতক্ষণ। পথের উপর লাজ অর্থাৎ খইয়ের স্থূল একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে ; তাহার উপর পুষ্পমালার স্তূপ দুইপার্শ্বে জমিতে লাগিল। আবার শঙ্খরোলে বুঝি শ্রবণ বধির হইবার উপক্রম! যেখানে প্রধান রাজপথ ও মহাকাল মিলিয়াছে, সে স্থানে আসিয়া উতোল শঙ্খরোলের মাঝে চতুর্দ্দোল স্থির হইল।

প্রত্যেক বাহকের হাতে স্কন্ধ-প্রমাণ উচ্চ দণ্ড, উপরদিকে দোলার দাঁড়াটি রাখিবার মত ব্যবস্থা আছে। যখন কোথাও দীর্ঘকাল দাঁড়াইবার প্রয়োজন হইত, বাহকেরা তাহাদের কাঁধ হইতে সেই দণ্ডাসনের উপর দোলার মূল দাঁড়াটি স্থাপন করিত, তাহাতে ত্রিশটি দণ্ডের উপর দোলাটি নিশ্চল, বহুক্ষণ সমভাবে স্থির থাকিত।

এইখানে আসিয়া চতুর্দ্দোল স্থির হইলে মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নগরের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় গোধূম ও দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর ক্ষত্রিয় প্রধান কয়েকজন, তারপর প্রধান নগর-শ্রেষ্ঠী অগ্রসর হইয়া মহারাজের ললাটে কুঙ্কুমের ফোঁটা পরাইয়া সুবর্ণ থালে রত্ন উপঢৌকন নিজ নিজ হাতে নিবেদন করিয়া দিল, তারপরে শ্রদ্ধাভরে আভূমিনত মস্তকে প্রণাম করিয়া একের পর একজন সরিয়া যাইতে লাগিল। তারপর সুবর্ণ থালে নির্ম্মিত— বিচিত্রবর্ণে উদ্ভাসিত শ্রী লইয়া মহানগরের নটী, প্রধানা নৃত্যকী আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াই উদ্দেশে বরণ করিয়া চরণে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া গেল।

মহারাজ তারপর প্রসন্নমনে সকলকার শুভ সংকল্প ও রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া নিজ আসনে উপবেশন করিলে আবার শঙ্খরোলে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। পুষ্পমালায় রাজপথ স্থূল হইয়া উঠিল। বাহকেরা পুনরায় দোলার দাঁড়া স্কন্ধে লইয়া প্রস্তুত হইল এবং রাজানুমতি প্রাপ্তি মাত্র ধীর গতিতেই অগ্রসর হইল। বিবিধ যন্ত্রের সঙ্গে বাদ্যধ্বনি, সানাই তখনকার খুব বড় হইত, তাহার সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্র মিলিয়া যে ধ্বনি হইত তাহাকে মঙ্গল বলিত। সেই মঙ্গল তখন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

মহারাজের দোলার পর পশ্চাতে নিকটতম যে দলটি ধীরে ধীরে চলিতেছিল, সেটি মহারাজের অশ্ববাহিনী, তাহাদের অধ্যক্ষগণকে অগ্রে করিয়া চলিতেছে। প্রতি সারে চারিজন, এইরূপ পঞ্চাশটি সার, প্রত্যেকেই অশ্বে উপবিষ্ট উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে গতিশীল ; অগ্রে নগর রক্ষক সর্ব্বদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন। তারপর কিছু ব্যবধানে প্রথমেই গজপৃষ্ঠে রাজপুরোহিত। তাঁহার পার্শ্বে অমাত্য প্রধান রাক্ষস, তাহার পর একটি সুসজ্জিত মাতঙ্গ-বাহনে মেগাস্থিনিস যবনদূত,—তখনকার যবন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। প্রত্যেকের পার্শ্বে একজন রাজপুরুষ রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কোশল প্রতিনিধি বীরভদ্র কৌন্দক চলিয়াছেন। তারপরই কএকটি সুসজ্জিত গজ, বীরাসনে উপবিষ্ট তিনজন বিশিষ্ট ধনুর্ধারী যোদ্ধা হেলিতে দুলিতে তাহাদের পৃষ্ঠে হাওদার উপর চলিতেছে। তাহার পশ্চাতে ধানুকী পদাতি সেনাপতিকে অশ্বারোহণে তাহাদের অগ্রে রাখিয়া চলিয়া গেল। তারপর সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে দশজন প্রাড়্বিবাক্, যাহারা পাটলীপুত্রের বিচার-বিভাগের গৌরব বলিয়া খ্যাত,—তাঁহারা চলিয়াছেন। ইহার পর পার্ষদ, তারপর সভ্য, স্থপতি, যন্ত্রবিদ এবং বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ ও নানা বিদ্যাবিশারদগণ, তারপর দূতগণ, এবং অপরাপর রাজপুরের অধিবাসী রাজানুচরগণ—তারপর রাজকীয় নানা বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ অশ্বারোহণে চলিতেছেন দেখা গেল। কিন্তু মহারাজের দোলা অতিক্রম-করিবার পর এ সকলের আর তেমন আকর্ষণ ছিল না। সর্ব্বশেষে ধ্বজা ও দণ্ডধারী অশ্বারোহীর দল বিষাণ বাজাইয়া চলিয়াছে, তারপর নাগরিক জনস্রোত।

এই ভাবে মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের নগর প্রদক্ষিণ শেষ হইল,—নদীতীর ঘুরিয়া যখন ইষ্টমন্দিরের সম্মুখে মহারাজের দোলা স্থির হইল তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়, মধ্যাহ্ন উপাসনার সময় হইয়াছে। মহারাজ দোলা হইতে অবতরণ করিয়া

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই অপরাপর সকলেই অবতরণ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। দেবদর্শনের পর মন্দির হইতে সকলে মহারাজের অনুমতিক্রমে যে যার স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইভাবে তখনকার দিনে পর্ব্ব, উৎসব, অথবা যুদ্ধজয়ের পর মৌর্য্যকুলতিলক ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার রাজধানীর সাধারণ প্রজাবর্গের গোচর হইতেন।

আমাদের দুইজন প্রবাসী নাগরিক আজ পাটলীপুত্রের তুলনীয় যে উৎসব ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইল, তাহাদের প্রতিষ্ঠানপুরের উহা যে কত মহান, কতটা বিপুল গভীর ভাবোদ্দীপক তাহা অনুভব করিতে করিতে তাহারা নিজ স্থানে উপস্থিত হইল। বিক্রম বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু অদ্রী সংযত ছিল।

অনেকক্ষণ, বাসায় পৌঁছিয়া দুজনেই নীরবে আজিকার এই প্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, শেষে বিক্রমের বড়ই গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অদ্রী একটু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—বন্ধুবর, ব্যাপার কি? বিক্রম বলিল,—বন্ধু, আমার সঙ্গে এখন তুমি যদি কিছুক্ষণ কথা না কও তা' হ'লে ভাল হয়, আমার অন্তর এতটা ভরে আছে—

বাধা দিয়া অদ্রী বলিল,—বুঝেছি, বুঝেছি—থাক, এখন কোন কথায় কাজ নেই।

কিন্তু অদ্রী থামিলেও বিক্রম আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে অন্তরের যা কিছু উগারিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। অদ্রী এত কথা বিক্রমকে পূর্ব্বে কখনও বলিতে শুনে নাই।

তের

শিবিরোদ্যানে আসিয়া দুজনে স্নানাহার শেষ করিয়া নানা বিষয় আলোচনায় বৈকাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল। বিক্রমের প্রশ্ন,—অদ্রীর উত্তর। আলোচনার মূল কথাই হইল, এই মৌর্য্য রাজধানীর ঐশ্বর্য্য। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কিছুরই মীমাংসা অদ্রীর কাছে না পাইয়া অধীর বিক্রম বলিল, আচ্ছা এমন একজনকে পাওয়া যায় না, যে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? অদ্রী বলিল,—সময়ে নিশ্চয়ই পাবে সে লোক, আমার এ বিশ্বাস আছে তাই বলছি। কিন্তু একটা বিষয়ের শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রমকে শান্ত করা সহজ নয়, সুতরাং নিরস্ত না হইয়া বিক্রম পুনরায় বলিল,—আচ্ছা অদ্রী, নন্দরাজাদের সময় কি কুসুমপুর এতটা বড়, এতটা ঐশ্বর্য্যশ্রীমণ্ডিত ছিল?

ধননন্দই শেষ সমৃদ্ধিশালী নন্দরাজা ছিলেন একথা জান ত? যতদিন তিনি বৃদ্ধ হন নি ততদিন সবদিকেই রাজধানীর সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বাড়াতে পেরেছিলেন, নগরকেন্দ্রে ঐ মার্ত্তণ্ড মন্দিরই তাঁর শেষ কীর্ত্তি। ভারতের নানা স্থান থেকেই দক্ষ কারুশিল্পীরা এসেছিল শুনেছি। ঐ কাজটি শেষ হতে হতেই তিনি বুড়ো হয়ে পড়লেন। প্রায় সাতটি বৎসর লেগেছিল বিশাল ঐ মন্দিরটি সম্পূর্ণ আর ঐ চারদিকে চারটি তোরণ তৈরী করতে। তারপর আরম্ভ হল তার ছেলেদের রাজত্ব। শেষ অবধি উত্যক্ত হয়ে কুসুমপুরের প্রজারা না কি সিদ্ধ তান্ত্রিক এনে গোপনে গোপনে জ্যেষ্ঠপুত্র বলানন্দকে হত্যা করতে মারণ-যজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছিল। প্রজারাও আর শান্ত থাকতে পারেনি, বিদ্রোহের আয়োজন যখন সম্পূর্ণপ্রায় করে এনেছিল এমনই সময়ে ক্ষেত্রে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের পাদক্ষেপ, অবশ্য পরে চন্দ্রগুপ্তের সোজা হস্তক্ষেপ।

বিক্রম বলিল,—আচ্ছা অদ্রী তুমি বিশ্বাস কর, একজন মন্ত্রবলে একজনের প্রাণনাশ কর্ত্তে পারে? অদ্রী বলিল,—তুমিও কি করনা? বিক্রম বলিল,—ঠিক যে করি তা বলতে পারি না, যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান কিছু একটা চক্ষের সামনে দেখে বুঝতে পারছি ততক্ষণ হাঁ বা না কিছুই বলা যায় না। তবে জানতে একটা কৌতূহল আছে এইটুকু বুঝতে পারি। উত্তরে অদ্রী কিছুই বলিল না; সে কি যে ভাবিতেছিল কে জানে। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিক্রম পুনরায় বলিল,—অদৃষ্ট বলে আমাদের প্রত্যেকেই জীবনে কর্ম্মফল ঘটিত

যে একটা ভাল-মন্দর হিসাব আছে, তা ছাড়িয়ে যে বাহিরের প্রভাবে আবার একটা কিছু ঘটবে আমার উপর, সেটাও বিশ্বাস করা কঠিন।

অদ্রী বলিল,—এ ব্যাপারে আমরা একটা সিদ্ধান্ত কিম্বা সন্তোষজনক মীমাংসা কখনও কর্ত্তে পারব না, আমার জন্মগত সংস্কার একরকম, শিশুকাল থেকে যেমন ভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়েছে তার সঙ্গে হয়ত তোমার সংস্কার কিম্বা বুদ্ধির মিলন হবে না, তবে, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ কথাটাকে সহজভাবে বুঝাবার পক্ষে তোমায় সাহায্য করতে পারি। ধরো, একটা সমশক্তিমান লোককে তুমি নির্ব্বিচারে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করতে পার কি না? পারতো? এ যেমন অস্ত্রবলে হত্যা, আর ওটা হ'ল মন্ত্রবলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা হত্যা, কেন হবে না? বিক্রম বলিল,—তা সম্ভব হতে পারে, তবে কাজটা কোথাও কখনও অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি, আর কেমন করেই বা হয়, তাও জানি না, তাই সংশয় হয় না কি? আমি তোমার মত অতটা সবল বিশ্বাসী নই সেই জন্যই তোমাতে আমাতে বিশ্বাস নিয়ে এ পার্থক্য থাকবেই। তা কি আমি জানি না? আমি অস্থির, চঞ্চল, আর তুমি স্থির, শান্ত স্বভাব, আমি অসংযত, অনেক সময় অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু তুমি বাল্যকাল থেকেই সংযত আর,—বাধা দিয়া অদ্রী বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক এখন আর তুলনামূলক দোষগুণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই বন্ধু,—প্রায় তৃতীয় প্রহর হল। ঐ যে শেখর আসছে কি খবর দেখ, বলিয়া অদ্রী বিক্রমকে সতর্ক করিয়া দিল। শেখর প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহামাত্যের আজ্ঞাবাহী আপনার দর্শনপ্রার্থী। অদ্রী কুমার বিক্রমকে বলিল, কুমার—চল যাই, আমরা প্রস্তুত আছি।

উভয়েই অশ্বারোহণে শিবিরোদ্যান হইতে বাহির হইয়া পথে আসিতে আসিতে অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। দুইজনেরই ভাবনা পৃথক হইলেও একটা বিষয়ে তাহাদের একতা ছিল; সেটা এই যে, আজই তাহাদের উদ্বেগের অবসান।

তাহারা যখন আর্য্য মহামাত্যের উদ্যান তোরণে প্রবেশ করিল তখন তৃতীয় প্রহরের অর্দ্ধাংশ গতপ্রায়, বড় বড় গাছগুলির মূল হইতে উদ্যানের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া রচনা করিয়াছে।

চারিদিকের শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষে জল সিঞ্চন চলিতেছিল। পথিপার্শ্বেই গাঢ় হরিৎ তৃণ বিস্তৃত ক্ষেত্রের চারিদিকেই জাতি, যূঁথী, মল্লিকা, বেলা, চামেলী, মালতী, চাঁপা ফুটিয়া উদ্যানটি আলোকিত করিয়াছে। পথের দুইধারে বকুল

গাছের সারি, তুইবন্ধু সেই পথে আসিয়া আর্য্য মহামাত্যের গৃহস্থ সোপানের নিকট অশ্ব হইতে অবতরণ করিবামাত্রই এক বালক দ্রুতপদে আসিয়া অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দৌবারিক আসিয়া নমস্কারপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল এবং তাহাদের লইয়া সম্মুখস্থ অলিন্দ্যবেষ্টিত চত্তর অতিক্রম করিয়া মহামাত্যের কক্ষদ্বারে উপস্থিত করিল। দ্বার-পার্শ্বেই তুই দিকে তুইজন মুক্ত তরবারি হস্তে সবল প্রহরী চিত্র পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া,—দেখিয়া ভয়ের উদ্রেক করে। সসম্ভ্রমে তাহারা প্রবেশ করিল।

অগ্রে অদ্রীই ছিল। ঘরে সে মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না কিন্তু দ্বিতীয় বৃহৎ কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় প্রসন্নমুখ যেন তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিতে উন্মুখ। এই দৃশ্য দেখিয়াই চমকিত অদ্রী তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং গরুড়াসনে উপবিষ্ট হইয়া আগে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি স্বস্তিক মুদ্রা দেখাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পরে উত্তোলন-পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

—দীর্ঘজীবী হও বৎস, চিরদিনই তোমার কর্ম্ম এমনই সর্ব্বাঙ্গ সুসংগত হোক। বিক্রম অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, প্রথম দৃশ্যে একেবারেই যে মহামাত্যের সঙ্গে দেখা হইতে পারে, এ কথা সে ভাবে নাই—একে মাঝের ঘর কতকটা ছায়াচ্ছন্ন বলিয়া আলো হইতে বিক্রম স্পষ্ট দেখিতে পাইল না আর কতকটা দূর বলিয়াও তাঁহার কথাগুলি সে কিছুই শুনিতে পাইল না। ইনিই যে আর্য্য চাণক্য তাহা সে প্রথমে ভাবিতে পারে নাই। রাজপুরোহিত মনে করিয়া শনৈ শনৈ অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় আর্য্য মহামাত্য কিছু গোপন আদেশ দিবার জন্যেই বোধ হয় দৌবারিকের দিকে অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তাহার সহিত কথায় নিবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অদ্রী দ্রুত বিক্রমের নিকটে আসিয়া বলিল, —বিক্রম! ইনিই মহামাত্য চাণক্য, এসো প্রণাম কর, শুনিবামাত্র তখন বিক্রম নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে গেল, কিন্তু তিনি তাহা করিতে দিলেন না; তিনি বলিলেন,—যাহার উপর আদৌ শ্রদ্ধা জন্মিল না, অবস্থান্তরে সৌজন্যতার দায়ে তাকে প্রণাম করা অভিনয় মাত্র, নয় কি? এখন এসো, তোমাদের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি, বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন,—তারপর উপবিষ্ট হও, বলিয়া তাহাদের আসন দেখাইয়া দিলেন। বিক্রমের মনটা খারাপ হইয়া গেল, কোমলের মধ্যে এতটা কঠোর ব্যবহার সে পূর্ব্বে কখনও পায় নাই। এ ব্যবহার তাহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। নিজেকে

অপরাধী মনে হইতে লাগিল। মুখে তাহার যে বিষন্ন ভাবটি ফুটিয়া উঠিল তাহা মহামাত্যের দৃষ্টি এড়াইল না। অদ্রীও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহাতে সেও মনে মনে একটু কাতর হইল।

যাহাহউক, উপবেশনান্তর আর্য্য মহামাত্য কিছুক্ষণ স্থির হইয়া আত্ম-সমাহিত অবস্থায় রহিলেন। তারপর বিক্রমের মুখমণ্ডলে একবার তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এ সেই দৃষ্টি, দেহস্তর ভেদ করিয়া অন্তঃস্থলে পৌছিয়া নাড়া দেয়। বিক্রমের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল সেই দৃষ্টির প্রভাবে। এইবার চাণক্য কথা কহিলেন।

—কুমার বিক্রমজিৎ, প্রতিষ্ঠান রাজ্যে অশান্তির অগ্নি উৎপন্ন করেছ। তাঁহার বাক্যের মধ্যে ঐ সকল অপরাধের পরিণামে যেন অবশ্যম্ভাবী কঠিন দণ্ডবিধির ইঙ্গিত স্পষ্ট রূপেই বর্ত্তমান ছিল।

অপরাধের অবশ্যম্ভাবী দণ্ড কল্পনায় যাহা সাধারণ একজনের অন্তরে অন্তরে আতঙ্ক জাগায়, তাহা অনুভব করিলেও কুমার ভীরু ছিল না, সর্ব্বপ্রকার ফলাফলের জন্যই আজ সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। উত্তরে নতশিরে, দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল—আর্য্য মহামাত্য! বিদ্রোহী ছিলাম একথা যেমন সত্য, এখন আর সে অপরাধ আমার নাই, এ কথাও আজ তেমনই সত্য। এই তিনটি দিন, আর তিনটি রাত্রি রাজধানী বাসের ফলে আমার মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—, পিতৃদ্রোহিতার দণ্ড আমি নিজেই গ্রহণ করিব, আর পূর্ব্বকৃত রাজদ্রোহিতার দণ্ড আপনি বিধান করুন্—আমি হাসিমুখে তা গ্রহণ করব। কিন্তু তাত! অদ্রী তো কোন—

আর্য্য মহামাত্য তখন গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, প্রসন্ন বদনে বিক্রমের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এ রাজ্যে দোষীর সঙ্গে নির্দ্দোষ দণ্ড লাভ করেছে, এমন কখনও শুনেছ কি ?

শুনিবামাত্রই বিক্রমের মুখের ভাব লাবণ্যময় হইয়া উঠিল।

তাহার প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আর্য্য মহামাত্য বলিলেন,—অদ্রীর মুখে শুনেছ কি, এ সম্বন্ধে কোন কথা ? বিক্রম বলিল,—আপনার গুণ-গরিমায় তার চিত্ত যেমন সর্ব্বক্ষণই পরিপূর্ণ, ভাষণেও সেইরূপ, আপনার মহিমা-কথা ব্যতীত তার মুখে অন্য কথা শুনিনি।

আর্য্য চাণক্য ধীরে ধীরে বলিলেন,—তোমার স্নেহময় পিতা প্রতিনিধির মুখে শুধুই যে বিদ্রোহের খবর দিয়েছেন তা নয়, সেই সঙ্গে তোমার সংশোধনের

ভারও অর্পণ করেছেন আমাদের হাতে। এ ক্ষেত্রে তোমায় কৌশলপূর্ব্বক এখানে আনা হয়েছে—কেন, তা জান কি? কুমার বলিল,—জানি, একটা অশান্তিকর সংঘর্ষ এড়াবার জন্যই। অবশ্য আগে আমি কোন প্রকারেই এ রহস্য ভেদ করতে পারিনি। এখন পথে আসবার কালে, আপনার কর্ম্ম-কৌশল অদ্রী আমায় কিছু কিছু জানিয়েছিল এবং তার ফলে আমায় আপনার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেছে।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন, তোমার এ আনুগত্য কেন? কুমার উৎফুল্ল গদ গদ কণ্ঠে কহিল,—যেমন ভাবে বিন্দুমাত্র শক্তি অপব্যয় না করে আপনি কঠিন, জটিল, কর্ম্ম সকল বিচিত্র কৌশলে সম্পন্ন করেন—তাতে কে না আশ্চর্য মানে?

মহামাত্য এখন যেন সস্নেহে বলিলেন,—সর্ব্বদাই তোমার কল্যাণকামী ঐ মিত্রকে সহায়রূপে পেয়েই এ কাজ সহজ হয়েছে আমার পক্ষে।—অশান্তি-বিগ্রহ এড়াতে আমি এই ভাবেই কর্ম্ম ক'রে থাকি। তোমাব পরিবর্ত্তন দেখে এখন আমি সুখী বটে,—কিন্তু আমাব কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, বৎস!—সত্য বলবে, প্রতিশ্রুত হও।

কুমার বলিল,—আপনার মহত্ব পরিমাপের শক্তি আমার নাই, তথাপি, মহত্বের নামে শপথ করছি আমি আপনার কাছে সত্য কখনও গোপন করিব না।

—সাম্রাজ্য স্থাপনের পর, রাজ্যের সর্ব্ব বিভাগেই শাসন-প্রণালী নির্দ্দোষ এবং কল্যাণপ্রসূ যাতে হয়, প্রজাসমষ্টি সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপনে সংসার আশ্রমকে সার্থক করতে পারে, যাতে সমাজ জীবন উন্নত হয়, সেই জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, এবং প্রাণশক্তির প্রতি কণা ক্ষয় করেছি,—যিনি সুবিচারের দ্বারা এ ব্যবস্থার দোষ দেখাতে পারেন তিনি আমার শত্রু নয় পরন্তু পরম মিত্র জানবে। সেই মৈত্রীর দাবীতে আমি তোমার কাছে জানতে চাই, বল বৎস,—এই শাসন-প্রণালীর মধ্যে এমন কি দোষ, মহৎ অনিষ্টকর রন্ধ্র দেখেছ যার জন্য বিদ্রোহ সৃষ্টি করে উচ্ছেদের প্রয়োজন তুমি অনুভব করেছিলে,—অকপটে প্রকাশ করো, আমি যথার্থই সুখী হব।

প্রশ্ন শুনিয়া অদ্রী যতটা, বিক্রম তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল, কিছুক্ষণ তাহার মুখে বাক্য সরিল না। এমন সোজা সরল ও মর্ম্মভেদী প্রশ্ন সে জীবনে আর কখনও শুনে নাই। কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে বলিল,—

বাল্যাবধি আমি একমাত্র রাজপুত্র, সকলকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; প্রতিষ্ঠানে আমার অপ্রতিহত আধিপত্যই, আর্য্য প্রভু! আমায় বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। আত্ম-অভিমান মাত্র সম্বল, আবাল্য অস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন মৃগয়াদি, বিবিধ কলা বিদ্যা, আমার যাহা কিছু শিক্ষা হয়েছে এমনকি কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত আমার মধ্যে কোনও শুভফল উৎপন্ন করে নি। রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা, সুনিয়ম, প্রজা সাধারণের কল্যাণের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আমার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে স্থান পায়নি। তার পরিবর্ত্তে শৌর্য বীর্য্যের নামে কুটিল ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রতিহিংসাই অন্তরে উত্তর উত্তর বেড়েই উঠেছিল। সুতরাং, রাজ্য শাসন শৃঙ্খলার অভাবে যে বিদ্রোহ আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই; কারণ, আপনি এখন বুঝেছেন আমি ঐসকল মহৎ চিন্তারও অযোগ্য। বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ যা নিবেদন করছি, তাও আপনার অজানিত নয়। তবুও সত্যের জন্যই বলতে বাধ্য, তাই বলছি, বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ, নন্দ বংশের উচ্ছেদ দূরস্থ এক শ্রেণীর প্রজা এখনও সহ্য করতে পারেনি, পারছেও না। তাদেরও এই কর্ম্মের মধ্যে কোনও যুক্তি বা মহৎ চিন্তা নেই,—সকল বিষয়েই কেবল পুরাতন-গতানুগতিকতা, যা দৌর্ব্বল্যের আনুগত্যের নামান্তর। আমার জননী নন্দ বংশেরই কন্যা, সুতরাং রাজবংশের ভক্ত, তাঁর প্রভাবেই আমার এই মৌর্য্য বিদ্বেষ। এখন এই সুযোগে আমি হব তাদের নায়ক, এই অহংকারেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলাম। আমার দুর্ব্বল চিত্ত এতটা পর্য্যন্ত গণনা করেছিল, যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস করে মৌর্য্য বংশ স্থাপিত হয়েছে, আমি মৌর্য্য বংশ ধ্বংস করে কোশল রাজ বংশ মগধে স্থাপন করবো। আমার হীন দম্ভ ও দুরাশা, অলস মুহূর্ত্তে এমনি অনেক কিছু কল্পনা করেছিল। গত বৎসর পিতৃদেব আমার শিক্ষার জন্য, কিছুদিন এই কুসুমপুরে রাখবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। হায়, হায়, তখন যদি আমি তাঁর উপদেশ মত এখানে আসতাম তাহলে আর রাজদ্রোহের পাতকে লিপ্ত হতে হত না। আপনার মহৎ কৌশলে এবং পরমবান্ধব অদ্রীর মধ্যস্থতায় এখন এখানে এসে এই তিনটি দিনেই আমার চৈতন্য হয়েছে। এখন আমি সচেতন হয়েছি, বুঝেছি, আমি কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়, কতটা অজ্ঞান। আমায় দণ্ড বিধান করুন, আমি প্রায়শ্চিত্ত কোরব, সেই দণ্ড বহন না করলে, আমি কোন মতে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। তারপর জীবিত থাকলে তখন পিতৃদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত—

মহামাত্য বলিলেন,—তোমার দণ্ড পূর্ব্বেই স্থির করেছি, যথাকালে গ্রহণ

করবে। এখন তোমার প্রধান কর্ত্তব্য তোমার পিতৃবন্ধু সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সে ব্যবস্থা যথা সময়ে হবে, পরে তুমি তা জানতে পারবে। এখন শোন অদ্রী! তোমাদের বিদায়ের পূর্ব্বে কুমারকে এখানে আনা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে পরামর্শ হয়েছিল,—এখন সে রহস্য ভেদ কর, উপযুক্ত ক্ষণ উপস্থিত। বৎস! বিক্রমের এখন সব কিছু জানা প্রয়োজন।

অদ্রী তখন বিক্রমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—সেদিন তোমাকে এখানে আনবার দায়িত্ব নিয়ে আর্য্য অমাত্যদেবের আদেশে আমি প্রতিষ্ঠান যাত্রা করি, সেই দিনের কথা মাত্র। এখন ঘটনাটি বলছি। আমাকে নিভৃতে আহ্বান করে একটি বড়ই কঠিন প্রশ্ন করলেন,—এমনই একটি সহজ পন্থা নির্ণয় কর যাতে কুমারের বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রসরমান বিদ্রোহ অগ্নি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয়।

আমার পক্ষে এই গুরুতর ব্যাপারের যথার্থ মীমাংসা তৎক্ষণাৎ সম্ভব হোল না দেখে, তখন নিজেই এই চমৎকার প্রস্তাবটি করলেন, কুমারকে, কোন কৌশলে যদি কুসুমপুরে আনা যায় তাহলে কি ঐ জটিল ব্যাপারের সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান হয় না?

রাজকুমারের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত বিদ্রোহ অগ্নি নির্ব্বাপণের এই অপূর্ব্ব কৌশল, শ্রবণমাত্রই আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম! সত্যই অন্ধকারে যথার্থ ই আলোক পেলাম। তবে যে কৌশলে তোমাকে এখানে আনতে হবে, আর্য্যদেব আমাকেই তা উদ্ভাবনের ভার দিলেন। তাতেই আমি কুসুমপুরের মিথ্যা বিদ্রোহ বার্ত্তা এবং কাল্পনিক চক্রান্ত সকল উল্লেখ করে তোমায় প্রলোভিত করেছিলাম। আরও আচার্য্যদেবের উপদেশেই এটাও স্থির নিশ্চিত ধারণা করতে পেরেছিলাম, একটি সর্ব্বনাশকর ব্যাপক অশান্তির আগুন নিঃশেষে নির্ব্বাপণের জন্য একটি মিথ্যা-ভাষণ পরম কল্যাণকর। এ দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারতেও আছে। আমার পক্ষে তোমাকে এখানে আনবার এর চেয়ে সহজ উপায় উদ্ভাবনের শক্তি ছিল না—এ জন্য আমায় ক্ষমা কর বন্ধু!

বিক্রম তাহাকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।

বিক্রম গদ গদ কণ্ঠে বলিল,—হে আর্য্য, অপ্রতিহত আপনার কৌশল, ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবেই ঘটেছে। আমার এই পরিবর্ত্তনে অবাক হয়েছি; আপনার এই মহান কৌশলের পরিচয় পিতৃদেব যখন শুনবেন এবং তার ফলাফল লক্ষ্য করবেন, তিনি যে কতটা সুখী হবেন তার পরিমাপ হয় না।

মহামাত্য ঘন ঘন দ্বারপথে দেখিতেছিলেন, ইহাতে অদ্রী বুঝিল, তাঁহার সংবাদবাহী গুপ্তচর সমূহ প্রয়োজনীয় বিষয় গোচর করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! কাল নষ্ট হইতেছে, এখন তাহাদের বিদায় লওয়াই কর্ত্তব্য। অদ্রী প্রণাম করিয়া প্রস্তুত হইলে মহামাত্য বিক্রমের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—প্রিয়তম বৎস! মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ছিলে মহাশত্রু, তোমার মধ্যে এখন যাঁর কৃপায় এই বিপরীত পরিণাম এসেছে তাঁকে নমস্কার কর। এখন তুমি মিত্র, আর অতি নিকট ভবিষ্যতে হবে পরম সহায়, এই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। বৎস! আজ মুক্ত প্রাণেই তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করছি পূর্ব্বে এ কথা কাহাকেও বলিনি। আমি দিব্য চক্ষে দেখছি এই শাসন-পদ্ধতির প্রভাবেই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত মহা উজ্জ্বল। মহা গৌরবের মুকুট আপন শিরে ধারণ করে ভারত ধন্যা হবেন। তখন আমি থাকব না, তোমরাও হয়ত থাকবে না, কিন্তু এর বার্ত্তা দূর পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হবে। এই সম্রাটবংশের বংশধরের প্রভাবে দেবলোক পর্য্যন্ত এই সসাগরা ধরার পানে আকৃষ্ট হবে। এখানকার প্রজাবর্গের মুক্তির আনন্দস্পন্দন সর্ব্বত্র অনুভূত হবে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ পথে। এক ধর্ম্মকেন্দ্রিক শাসন পদ্ধতির ধারায় এই ধরণী প্লাবিত করবে। আমি দিব্য দৃষ্টিতেই দেখছি সেই ধর্ম্মঘন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব, যার প্রভাবে উচ্চ-নীচ, আর্য্য-অনার্য্য, দম্ভ-দৈন্য শূন্যে মিলিয়ে যাবে। সে প্লাবনে ক্ষুদ্র কিছুই থাকবে না, যা থাকবে তা মহান্, সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বকাল উপযোগী ধর্ম্মপ্রবাহ। এখন হ'তে যাতে রাজ্যের মূলনীতি অটুট থাকে, তার জন্যই তো নবীন কর্ম্মীর প্রয়োজন। দুর্ব্বল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দ্বারা কিছুই হবে না। তাইত প্রকৃতি তোমাদের মিলিয়েছেন। ক্রমে সেই মূলনীতি বুঝে নিয়ে সাম্রাজ্যকে তোমাদের আপন করে নাও। সাম্রাজ্য কখনও এক ব্যক্তির নয়, এক ব্যক্তির দ্বারা কখনও পরিচালিত হতে পারে না। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে মধ্যে বা কেন্দ্রে একজনকে রেখেই তার মাথায় ছত্র ধরতে হয়। তিনিই হন রাষ্ট্রের নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতীক। তা চালাবে কর্ম্মিগণ রাষ্ট্রময় প্রজাসাধারণকে আপন করে গড়ে নিয়ে। দুর্দ্দান্ত স্বভাব চন্দ্রকে আমি প্রতি পদে পদে এই কথাই বুঝিয়েছি যে বাহুবলটাই সব নয়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকলকার মন, বুদ্ধি এবং শরীর পর্য্যন্ত একই নিয়মের বশে চালিত হবে, তবেই না সেই সাম্রাজ্য আদর্শ হবে? একখণ্ড ভূমি অধিকার এবং গণ্ডীবদ্ধ করে নিজকে ক্ষুদ্র সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে কি লাভ? বৎস! এই সাম্রাজ্য হতেই আত্ম অধিকার বিস্তারের সম্যক অর্থ

প্রণিধান করতে পারবে, যাহার শেষ কথা জীবন-মুক্তি, জগৎ-সমাজকে আত্মসাৎ করে জন্ম, জীবন ও মরণকে সার্থক করা। যাও বৎস ! মহাবীরের প্রসাদ লাভ করে মহাবীর হও। ভবিষ্যতে বীর বংশের ধারা বজায় রাখতে সকল শক্তি নিয়োগ কর। ক্ষুদ্র মত ও পথের গণ্ডী ভেঙ্গে দাও।

প্রণামান্তর আশীর্ব্বাদ লইয়া তাহারা চলিয়া আসিতেছিল, দৌবারিক আসিয়া জানাইল, মেগাস্থিনিস প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল অপর প্রকোষ্ঠে অপেক্ষায় আছেন। ইনি গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস ; অদ্রী কিম্বা বিক্রম পূর্ব্বে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই তবে শুনিয়াছিল, রাজধানীতে তাঁহার নাম ছিল যবন দূত স্থানিস। যাহা হউক, দৌবারিকের দিকে দক্ষিণের হাত দেখাইয়া আর্য্যদেব অপেক্ষা করিতে সঙ্কেত করিলেন এবং বিক্রমের পানে দেখিলেন যেন কিছু আরও বলিবেন, তারপর বিদায় দিবেন।

মুগ্ধ অদ্রী ও বিক্রম আর্য্য মহামাত্যের মধ্যে যে বস্তু দেখিল, তাঁহার কথায় যাহা পাইল, তাহাতে বুঝিল,—আজ তাহাদের মহাসৌভাগ্যের যোগেই উহা পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্ত্তির মধ্যে এক মহাশক্তির উৎস ক্রিয়াশীল, যে শক্তি তাহারা অনুভব করিল আজ তাহাদের জীবনে এই প্রথম ; যে শক্তির সন্ধান তাহারা আজ পাইল তাহাতে তাহাদের জীবন ভরিয়া গেল। অফুরন্ত সেই শক্তি,—বিশ্বাস হইল জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে। তাহারা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল,—তারপর প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে যখন প্রসন্নচিত্ত মহামাত্যকে প্রণাম করিতে গেল তিনি বলিলেন,—বৎস! তোমরা মনোমত কিছু বর প্রার্থনা কর, আজ কোশলের সকল জটিল প্রশ্নের সমাধানে আমি নিশ্চিন্ত,—আমায় বড় আনন্দ দিয়েছ, ভবিষ্যতের আশা তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের কোন সাধ পূর্ণ করি, কিছু গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করো, বৎস !

বিস্ময়ে উভয়েই এমনিই স্তব্ধ হইয়াছিল মুখে বাক্য সরিল না। তখনকার রাজপ্রথা উভয়েই ভালরূপ জানিত তত্রাচ তাহারা নির্ব্বাক রহিল। দেখিয়া আর্য্য চাণক্য পুনরপি বলিলেন,—সঙ্কোচ কেন বৎস ? তোমাদের কি প্রার্থনীয় কিছুই নাই ? বিক্রম বলিল, দেব, আর্য্য,—সত্য সত্যই আজ আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য, আমাদের প্রার্থনীয় কিছু থাকতে পারে, তা বর্ত্তমানে কিছুতেই স্মরণে আসছে না। তবে একটি বিষয়ে আমার একান্ত অভিলাষ—

বল, বল বৎস, এখনই বল। বিক্রম অদ্রীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল

তাহার কথায় সে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তাহার মুখে সেই চিহ্ন সুস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও সে বলিল,—ভগবন্! আমরা লোক মুখে নন্দবংশ উচ্ছেদের গল্প যা শুনে থাকি তা যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধিতে ধারণা করতে পারি না। আমাদের উপর আপনার যদি এতই অনুগ্রহ, তাহলে আপনার নিজ মুখে ঐ সত্য ইতিহাস পূর্ব্বাপর বর্ণনা শুনে ধন্য হতে চাই। বলিয়া বিক্রম আবার অদ্রীর মুখের দিকে দেখিল,—তখন তাহার মুখ সহজ ভাবেই প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিস্ময় মহামাত্যেরও কম হয় নাই। তিনি বলিলেন,—তোমাদের অদেয় কিছুই নাই, বৎস! আমি অত্যন্তই সুখী হয়েছি, এ প্রার্থনা তোমাদের উপযুক্তই হয়েছে, আচ্ছা আগামী অমাবস্যার দিন আমার অবসর, ঐ দিনই আমি দ্বিপ্রহরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো, ঐ দিনেই তোমরা সব কিছুই শুনতে পাবে, কেমন?

চৌদ্দ
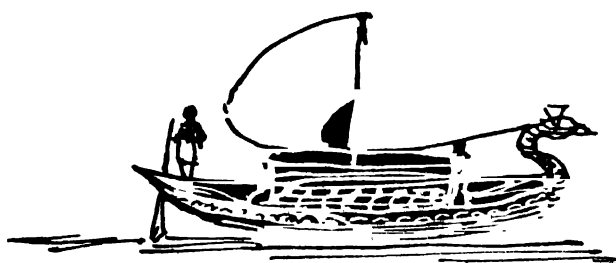
অদ্রী এবং বিক্রম বাহির হইয়া গেলে পর যবন রাজদূত প্রবেশ করিল। নতমস্তক এবং দুই বাহু উর্দ্ধে রাখিয়া মেগাস্থিনিস্ প্রবেশ করিতে করিতেই আর্য্য মহামাত্যকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্ব্বক স্থির ধীর গতিতে নির্দ্ধারিত আসনে উপবেশন করিল। চাণক্যও অর্দ্ধোত্থিত ভাবে তাঁহার অভিবাদন গ্রহণ করিলেন এবং উর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা দেখাইয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। তখনকার রীতি অনুসারে কুশল প্রশ্ন এইরূপ হইল,—আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো? জীবনযাত্রার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে নাই তো? আপনার শরীর মন সুস্থ আর গৃহে শান্তি আছে তো? ইত্যাদি,—উত্তরে যবন দূতও ঠিক ঐ ভাবেই শিষ্ট এবং কুশল বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর শিষ্টাচার শেষ হইলে মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইক্ষণে এ কুটীরে মান্যবর ভবান স্থানীশের শুভাগমনের কারণ জানতে উৎকর্ণ হয়ে আছি, আর্য্য দূতপ্রবর! আমি আপনার কোন্ আজ্ঞা পালনে কৃতার্থ হবো জান্তে পারি কি?

যবন দূতকে দেখিতে দীর্ঘ কলেবর, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে একটা প্রতিষ্ঠার ছাপ, গাল দুটিতে লালের আভা স্পষ্ট, চক্ষু দুটি মধ্যমাকৃতি, নীলবর্ণ তারকা শ্বেত ক্ষেত্রলোহিতাভ, আসব পানের ফল। ঘন ঘন মস্তকের কেশ কাঁচা-পাকায় মিলিয়া ধূসর এবং পরিপাটি সজ্জিত। মস্তকের উষ্ণিষ ভারতীয় বিচিত্রবর্ণ রেশমের প্রস্তুত,—একখানি বিশালায়তন শ্বেত কার্পাসে প্রস্তুত উত্তরীয় বিচিত্র ভাবে বেষ্টিত, দুই বাহু ব্যতীত সর্ব্ব অঙ্গ ঘোরতর আচ্ছাদিত। চরণে স্থূল পঞ্চনদে প্রচলিত চপ্পল, উহা গৃহদ্বারে রক্ষিত।

যবন দূত স্থানীশ অত্যন্ত বাক্যবীর না হইলেও বাক্যপ্রিয় বলা যাইতে পারে; তাঁহার প্রকৃতিগত এ দুর্ব্বলতার কথা আর্য্য চাণক্য ভালই জানিতেন এবং কিছুটা প্রশ্রয়ও দিতেন, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পর-সমাজে বাস করিতেছেন বলিয়া। মহারাজ দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না, অতীব দূর ব্যবধান রাখিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই করিতেন এবং দূতবরকে সামলাইতে মহামাত্য উপস্থিত থাকিতেন। সেই জন্য দেখাসাক্ষাৎ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার খুব কমই ঘটিত,—আর্য্য চাণক্যের স্থানেই তাঁহার

গতাগতি ছিল বেশী। আরও এই ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই তাঁহার মৌর্য্য রাজসভায় সুখে এবং স্বচ্ছন্দে থাকা সম্ভব হইয়াছিল।

তাঁহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল ;—তিনি রাজপুরীর সকল শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দৌবারিক পর্য্যন্ত কর্ম্মচারিগণের প্রত্যেকের সঙ্গেই গায়ে পড়িয়া কথাবার্ত্তা কহিতে এবং ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে অত্যন্তই ভালবাসিতেন এবং সে বিষয় তৎপর ছিলেন। রাজপুরুষগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে মহারাজ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা,—তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য,—তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। রাজপুরীর অনেকেই, বেশীর ভাগই-যাহারা মহারাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ,যেহেতু নিয়মিত বাহ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মহারাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ একজন বহিরঙ্গ বিদেশীর কাছে মহারাজের দৈনন্দিন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে রাজপুরুষ একজনের পক্ষে নিজ অজ্ঞানতা স্বীকার করা যায় কি ?—কাজেই কাল্পনিক অনেক কিছুই প্রচারিত হওয়াই স্বাভাবিক। আবহমান কাল হইতেই ইহা চলিতেছে,—কাজেই যবনদূতের সঙ্গে যাহাদের ব্যবহার ছিল, আলাপাদি চলিত, রাজপুরী মধ্যে মহারাজ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বিকৃত কল্পনা তাহারা করিত এবং ঘনিষ্ঠ আলাপ কালে ঐ সকল মিথ্যা বেশ মনোজ্ঞ ভাবেই যবনদূতকে বলিত আর যবনদূতও তাহাই বিশ্বাস করিতেন। নিন্দা বস্তুটি সাধারণত প্রত্যেক মানুষের মুখরোচক, বিশেষতঃ তখনকার রাজপুরীতে মহারাজের কঠোর ব্যবহার এবং দণ্ডনীতির কথা লইয়া রাজকর্ম্মচারীর অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে নানা কঠোর কাল্পনিক মত পোষণ এবং যবন দূতের গৌরব করিত।

মেগাস্থিনিস্ প্রফুল্ল মুখে, গম্ভীর স্বরে কহিল,—আর্য্য মহামাত্য ! অল্প কিছুদিনের জন্য একবার মাতৃভূমি দর্শনে যাব স্থির করেছি, আমার বন্ধু দিমিত্রিয়স্

(ডিমিট্রিয়াস) কাল এসে পৌছেছেন ওখান থেকে আমাদের প্রধানের আজ্ঞাপত্র নিয়ে, আমার পরিবর্ত্তে তিনিই এখানে ঐ কয় মাস থাকবেন, যতদিন না আমি ফিরে আসি। কাল তাঁকে এনে আর্য্য মহামাত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। বলিয়া হাত বাড়াইয়া যবনরাজের পত্রখানি দিলেন।

চাণক্য এ খবর জানিতেন। পত্র পাঠান্তর বলিলেন,—এটি অনুবাদ করলে কে? আমিই করেছি,—বলিয়া দূত একটু হাসিলেন। তখন মহামাত্য বলিলেন,—অতি শুভ সংবাদ মহাশয়, আপনি স্বদেশ যাবেন। অতি আনন্দের কথা। স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদেই আপনি আপনার স্বজনগণের মধ্যে পৌছাবেন, যাঁরা দীর্ঘকাল আপনার বিরহ দুঃখ সহ্য করছেন। অতঃপর আজ্ঞা করুন।

স্থানীশ—অনুগৃহীত হলাম, আর্য্য! আপনার ভালোবাসাই আমার এখানকার কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য ও সকল সৌভাগ্যের কারণ। এখন আরো একটি কথা আছে, নিবেদন করতে চাই।

চাণক্য—আপনার সঙ্গে যে সকল বহুমূল্য জিনিষপত্র থাকবে বোধ করি সে সকল উপযুক্ত ভাবে স্থানান্তর, আর সেই সকল মহামূল্য দ্রব্যসমূহের জন্য পথে নিরাপত্তার কথাই বলছেন তো?

স্থানীশ—আর্য্য চাণক্য কি দৈবশক্তিসম্পন্ন, অন্তর্য্যামী!

চাণক্য—এতে অন্তর্য্যামিত্বের অথবা দৈবের কোন্ প্রয়োজন দূতগরিষ্ঠ? সহজ বুদ্ধিতেই দেখা যায় বর্ত্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধ। আর তারই সঙ্গে পরবর্ত্তী ঘটনার যোগাযোগ, এগুলি যদি ঠিকমত ধরা যায় তা হলেই ফলাফল বলা তো সহজ! তা ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা, উদ্দেশ্য, বক্তব্য ব্যবহারক্রমে অনুসরণ করলেও বেশ ধরা যায় যে, এরপর এই কথা আসাই সম্ভব। নয় কি?

স্থানীশ—তা সত্য, কিন্তু আমরা নাকি অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত, সেইজন্য সেই অবস্থা বা চিন্তার ক্রমটি ধরতেই পারি না, অনুসরণ তো দূরের কথা, বিশেষতঃ সেটা যখন আবার অপরের সম্বন্ধে হয়। এ বিষয়ে ভারতীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত। একটু চিন্তা করিয়া তারপর যবনদূত আবার বলিলেন,—যাই হোক, এতাবৎকাল রাজানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ যে সকল উপহার, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেছি, এখন সেই সব গৌরবের জিনিষগুলি দেশে পৌছালেই না আমার ভারত সম্পর্কীয় কর্ম্মজীবনে স্বার্থকতার পরিচয় পাবে আমাদের দেশবাসী।

চাণক্য—সেই সকল দ্রব্য সমুচয় সুশৃঙ্খলায় পাঠাবার ব্যবস্থা তো হবেই,

তা ছাড়া বিদায় কালে রাজ উপহার এবং রাজ্ঞীর আরও কিছু বিশেষ উপহার থাকতে পারে পিতৃসন্নিধানে পাঠাবার।

স্থানীশ—বর্ত্তমানে যা আছে আমার, সেইগুলি কেমন করে নির্ব্বিঘ্নে অক্ষত অবস্থায় এখান থেকে নিয়ে যাব দেশে, সেই উদ্বেগ ভোগ কর্চ্ছি, তার উপর আবার,—

চাণক্য—সে সব চিন্তা আপনার নয়, উদ্বেগও ভোগ কর্ত্তে হবে না আপনাকে। আপনাকে নিরাপদে সসম্মানে আপনার অধিকৃত সকল বৈভব সঙ্গে করে ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌছে দেবার ভার রাজার,—কোন চিন্তা নেই, সকল দিকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যবনদূত অত্যন্ত আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মহামাত্যকে যেন প্রসন্ন করিতেই বলিলেন,—আপনার কর্ম্মপদ্ধতি, রাজ্যশাসন-শৃঙ্খলা আদর্শ-স্থানীয়। আজ সাতটি বৎসর লক্ষ্য করেছি, কোথাও কোন তস্কর বা দস্যু-দলের লুণ্ঠন সংবাদ পাইনি। কোন বিশৃঙ্খলার খবরও পাইনি। আর্য্য! এমনটি আমাদের পশ্চিম রাজ্যে সম্ভব নয়, একথা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করি।

দূতবরের ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া রহস্যপ্রিয় মহামাত্য মৃদু হাস্যের আবরণে আপন ভাবকে ঢাকিয়া অতীব কোমল কণ্ঠে এই বলিয়া তাঁহাকে আপন যশোভাগ প্রত্যর্পণ করিলেন,—দূতেশ্বর! আপনার পদার্পণের পূর্ব্বে প্রাচীন কাল হতেই এ রাজ্যে দস্যু তস্করের পীড়ন সর্ব্বত্রই ছিল, অসহায় পথিকের উপর অত্যাচার বড় কম ছিল না, আর কোন প্রকার রাজদণ্ডই তাদের কোন ক্রমে বশীভূত করতে পারেনি, কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখন থেকে আপনার পদার্পণে এই মগধ ধন্য হয়েছে তখন থেকেই দস্যু বা তস্কর-বৃত্তির কথা কারো কর্ণগোচর হয় নি।

কথাগুলির প্রভাব কিপ্রকার হইল তাহা ঠিক বুঝিতে বেশীক্ষণ গেল না। শুনিবামাত্র মেগাস্থিনিস্ আত্মপ্রসাদজনিত একটা ভাবের আবেগে উচ্চ হাস্যে, গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—আর্য্য মহামাত্য! এ বিনয় আপনার অপূর্ব্ব, আমার প্রতি যে সততা দেখালেন, এ আপনারই যোগ্য। এই বলিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর সমীচীন হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদের স্ফূর্ত্তিতে এমনি নিঃসঙ্কোচ উচ্চ হাস্যের দমকে ঐ স্থান আলোড়িত করিলেন, যাহাতে মহামাত্য বলিতে বাধ্য হইলেন,—মেগাস্থিনিস্! প্রিয় দূত মহাশয়! স্থিরোভব, বন্ধুবর! স্থিরোভব। আমার এই ক্ষুদ্র আশ্রমটির দুর্ব্বল ছাদটি ফাটিয়ে বিপন্ন করবেন না।

মেগাস্থিনিস্; আচ্ছা, আচ্ছা বলিয়া ধীরে ধীরে সংযত হইয়া, পরে আবার বলিলেন,—আর্য্য মহামাত্য! আমার আর একটি কথা আছে।

চাণক্য—অবিলম্বে প্রকাশ করুন মহাশয়।

তখন মেগাস্থিনিস্ বলিলেন,—রাজবৈদ্যের সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন আছে, বিশেষ প্রয়োজন। শুনিয়া মহামাত্য বলিলেন,—কিছু মূল্যবান বনৌষধির প্রয়োজন বোধ হয়?

দূতবর একটু হাসির সঙ্গে গাম্ভীর্য্য মিশাইয়া বলিলেন,—সত্যই তাই,—গুটি-কয়েক ঔষধ সঙ্গে নিতে চাই যা দুষ্প্রাপ্য,—আমাদের দেশে মোটেই পাওয়া যায় না। মহামাত্য বলিলেন,—সম্প্রতি রাজবৈদ্য এখানে নেই, আগামী পূর্ণিমার মধ্যেই এসে পৌছাবেন। খুব সম্ভব আপনার যাত্রা কালের পুর্ব্বেই পৌছাবেন, তবে সত্যের জন্যই আমায় একটি কথা বোলতে হবে।

এই কথা শুনিয়া দূতবর যেন একটু চিন্তিত ভাবেই বলিলেন,—আর্য্য চাণক্য, যা বলবেন, আমি নিশ্চয়ই তাতে উপকৃত হব, জানি।

আর্য্য চাণক্য বলিলেন,—আমাদের শাস্ত্রে এটা আছে যে,—যে দেশে লোক সমাজে যে যে রোগের প্রাদুর্ভাব,—প্রাকৃতিক নিয়মেই সে সকল রোগের ঔষধ বা ভেষজ সেই দেশের চারিদিকে বনস্থলির মধ্যে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। কেবল সেটা চিনে নেওয়া ব্যবহারে দক্ষ লোকেরই অভাব। তাই আপনার দেশের রোগের ঔষধ দেশে পাওয়া যায় না, এ কথা ঠিক নয়।

উত্তরে যবনদূত এবারে মুখে হাসি আনিয়া প্রফুল্ল ভাবেই বলিলেন,—একথা হয়তো সত্য, যদিও কথাটা এই প্রথম শুনলাম। একথা আরও সত্য যে, প্রকৃতির অনেক গুহ্য আপনাদের এই ইন্দ পণ্ডিতগণের আবিষ্কার।

এমন সময় রাজপুরী হইতে সম্রাটের প্রিয় ভৃত্য, নামটি তার শার্দ্দূল, আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, আর্য্য চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি সংবাদ শার্দ্দূল! মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

বিনা অনুমতিতে কাহারও মহামাত্যের আশ্রমের মধ্যে আসন সমীপে প্রবেশ অধিকার ছিল না। কেবল রাজভৃত্য এবং কোন বিশেষ প্রয়োজনে নিযুক্ত ঘনিষ্ঠ দুজন গুপ্তচর সব সময়েই বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত। অবশ্য বিজ্ঞাপন লিখিয়া নিষেধ ছিল না কিন্তু ব্যবহার পরম্পরায় ইহা আপনি নিয়মিত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এখন শার্দ্দূল বর্ম্মণ আসিয়া এই সংবাদ দিল যে, সম্রাট পুনরায় শয়ন কক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে চান।

যবনদূত পূর্ব্বে একটা কাল্পনিক এবং মিথ্যা জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, মহারাজ নাকি প্রতি রাত্রে শয়ন কক্ষ পরিবর্ত্তন করেন, এখন এ কথা শুনিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইলেন এবং যে কথা শুনিয়াছিল তাহা সমর্থিত হইল, মনে করিলেন কিন্তু কিছু না বলিয়া মহামাত্যের উত্তর বাক্য লক্ষ্য করিয়া রহিল।

সংবাদবাহীকে আর্য্য চাণক্য বলিলেন,—বলতো শার্দ্দূল, মহারাজ কত রাত্র বর্ত্তমান শয়নকক্ষে কাটিয়েছেন? শার্দ্দূল বিনীতভাবে বলিল,—মনে হয় এবারে মহারাজ একটি মাসকাল এই কক্ষে কাটিয়েছেন। এখন কিছু মশার উপদ্রব বেশী হয়েছে মনে হয় সেইজন্যই আর থাকতে চান না। তখন আর্য্য বলিলেন, তৃতীয় তলের উপর, প্রাসাদ শীর্ষে, ছাদের উপরে কোনও কক্ষে শয়ন করবেন কি? এই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। যদি তা হয়, তাহলে সেই মত ব্যবস্থা করতে পারি।

শার্দ্দূল চলিয়া গেল। যে ঘনিষ্ঠতার ফলে যবনদূত একথা শুনিবার অধিকারী হইয়াছিলেন তাহারই সুযোগ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর্য্য মহামাত্য! ব্যাপার কি? চাণক্য বিরক্ত হইলেও কথায় প্রকাশ না করিয়া শুধু সরল ভাবেই এইটুকু বলিলেন,—মহারাজের জন্য অল্প দিন ব্যবধানে একখানি নূতন শয়ন স্থান রচনা করিতে পারিলেই ভাল হয়।

যবনদূত যখন মহামাত্যের নিকট আসিতেন তখন খানিকটা মহামাত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভাবে নানা কথা-বার্ত্তা আলাপ-আলোচনা এবং গুরুতর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্যই আসিতেন। কারণ তাঁহার নিকট রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল কথা এবং রাজ্য পালন নীতি সংক্রান্ত সংবাদ পাইতেন, তাহা অন্যত্র কোথাও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে মহামাত্যও তাঁহার কাছে সুদূর পশ্চিমোত্তর ভূমি, অর্থাৎ উরোপীয় নানা যবনেতর রাজ্য সংক্রান্ত অনেক সংবাদ শুনিতেন। উভয় পক্ষেই অবশ্য চতুরে চতুরে যেমন হইয়া থাকে বন্ধুত্বের আবরণে যথাক্রমে উভয়েই নিজ নিজ গুহ্য সামলাইয়া কথা কহিতেন। আজ এই রাজভৃত্য আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্ভাবনা রহিল না। কারণ মেগাস্থিনিস আবার, কেন মহারাজ একঘরে দীর্ঘকাল থাকেন না জিজ্ঞাসা করিলে, মহামাত্য বলিলেন,—দেখুন, মহারাজের বাল্য জীবন হ'তেই রাজপ্রাসাদে নিশ্চিন্ত ভাবে কোন সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে সুখ শয্যায় আরামে রাত্র যাপন বা বিশ্রাম করবার সুযোগ বহুকাল ঘটেনি। বৈমাত্র ভাইদের অবিচার ও অত্যাচারে চঞ্চল হয়ে তাঁকে নানা স্থানে নানা অবস্থার মধ্যে কাটাতে

হয়েছে। তারপর যৌবন কাল থেকে রণক্ষেত্রে দীর্ঘকালই তাঁর জীবন কেটেছে। চারিদিকে প্রাচীর তোলা উপরে ছাদ ঢাকা অপরিসর স্থানে শয়ন তাঁর অভ্যাস-গত নয়। মুক্ত আকাশতলে তাঁর সুখে নিদ্রা হতে পারে। কিন্তু আমরা তা হতে দিই না, দিতে পারি না। মুক্ত স্থানে শয়নের অনেক কিছু দোষ, যা তাঁর মত একজন নরপতির পক্ষে সমীচীন নয়। তাঁর জীবনের মূল্য অনেক, আর সে জীবন রক্ষার ভার আমাদেরই। কাজেই, মধ্যে মধ্যে শয়ন কক্ষ পরিবর্ত্তন করেও যদি তাঁকে রাখা যায়, সেই চেষ্টাই করতে হয়। যাহা হোক্ এখন আপনার কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা যদি থাকে তো বিলম্ব না করে ব'লে ফেলুন, কারণ সম্ভবতঃ আবার এখনই আমার ডাক আসবে, এখনই হয় ত আমায় রাজ সকাশে যেতে হবে।

তবুও গ্রীকদূত আত্মীয়তার ভাবে বলিল,—কেন আপনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বুঝি? চাণক্য বলিলেন,—আমার নয়, মহারাজের প্রয়োজনেই হয় ত রাজভৃত্য আসবে।

নাছোড়বান্দা মেগাস্থিনিস্ তবুও বলিল,—আশ্চর্য্য আপনার অনুমান শক্তি, আগে থেকে কেমন করে আপনি জানলেন?

মহামাত্য এবার তিরস্কারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রশ্নকর্ত্তার চক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিয়াই দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—এমন প্রায় ঘটে, আমার কোন উত্তর মনঃপুত না হলে অথবা অর্থবোধ না হলেই আমাকে তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে আবার সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে হয়। এবার যেন মেগাস্থিনিস কতক বুঝিল।

যবনদূত তখন তাঁহার যাহা জানিবার, সমস্তই বুঝিয়া জানিয়া লইল। পরে, উঠিবার আগে আবার শেষে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কবে নাগাদ মহারাজের সঙ্গে ডিমিট্রিয়াসের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হবে জানতে পারলে ইতিমধ্যে আমিও প্রস্তুত হয়ে থাকব তার সঙ্গে। মহামাত্য তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে,—আজই তাহা স্থির হইবে এবং যথাকালে তিনি জানিতে পারিবেন।

ঠিক ঐ সময়েই শার্দ্দূল পুনরায় আসিয়া প্রণত হইল এবং মহারাজ স্মরণ করিয়াছেন জানাইল। এবারে যবনরাজদূতকে যাইতেই হইল। কিন্তু প্রাচ্য রাজনীতি এবং চরিত্রানভিজ্ঞ যবনদূত, মহারাজের মধ্যে মধ্যে শয়ন-গৃহ পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে সন্দিহান রহিল, মহামাত্য যাহা বলিলেন, উহা অন্তরে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাহার নিজ সিদ্ধান্তেই দৃঢ় রহিল। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত আকাশ তলে শয়ন কখনই কোন সম্ভ্রান্ত, সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষতঃ রাজার পক্ষে ত একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ইহা নিশ্চয় গুপ্তহত্যা চক্রান্ত ভীতি প্রসূত ব্যাপার। তাহাদের যবনদেশে যাহা ঘটিয়া থাকে, উহা এদেশের রাজনীতির মধ্যে আরোপ করিয়া যবনদূত কতকটা স্বস্তি পাইল, না হইলে এ ব্যাপারের কোন মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া অন্তরে একটী অস্থিরতা বিলক্ষণ তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। আবার সহজ বুদ্ধিতে এটা বুঝিতে তাহার প্রাণ চাহিল না যে, চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় একজন অসাধারণ সম্রাটের প্রতিদিন আততায়ীর ভয়ে শয়নকক্ষ পরিবর্ত্তনের যুক্তি কি ভাবে সত্য হইতে পারে। যথার্থ কোন হত্যাকারীকে নিত্য নিত্য গৃহ পরিবর্ত্তনে এড়ানো সম্ভব কিনা এটাও কি তাঁহার বিচার বুদ্ধির মধ্যে আসিল না? যাহার পশ্চাতে আততায়ীর ষড়যন্ত্র আছে সে রাজা কতকাল শুধু শয়নকক্ষ পরিবর্ত্তনের দ্বারা বাঁচিতে পারে? বিশেষতঃ যাঁহারা ইতিহাস রচনা করেন তাঁহাদের সহজ বুদ্ধির অভাব অনেক সময় এই ভাবের কতই না ঘটনা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে যাহাতে সাধারণ ভ্রান্ত হয়।

পনর

রাজপুরীতে অনেকগুলি তোরণ, তাহার মধ্যে সভা মণ্ডপের পার্শ্বে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ পথে একটী। সেই উদ্যান মধ্যে এক বিস্তৃত চত্তবের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর মর্ম্মর বেদী প্রসারিত, সেখানে বৃদ্ধা রাজমাতা মূরা উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা এবং সহচরী কুসুম,—অপূর্ব্ব কারুখচিত রাজমাতার গজদন্ত নির্ম্মিত যষ্টী লইয়া বেদী নিম্নে তাঁহার পদতলে বসিয়াছিল; রাজমাতা তাহারই সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। এমনই সময়ে দ্রুতপদে ঝড়ের মত মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে দেখিতে পাইয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। চন্দ্রকে দেখিয়াই মূরা উঠিতে উঠিতে সহচরীকে বলিলেন,—চল্ কুসুম আমরা উঠি,—বলিয়া যষ্টি লইতে হাত বাড়াইয়া দিলেন দেখিয়া চন্দ্র বলিলেন—আমি কি জানি, তুমি এখানে আছ? না, না, তা হবেনা, তুমি উপবেশন করো মা, অন্য দিকে যাবো আমি। মহামাত্য আসছেন, কিনা,—তাঁরই সঙ্গে একটু কথা আছে। শুনিয়া মূরা বলিলেন,—তুমি কি আবার শয়নকক্ষ পরিবর্ত্তন করতে চাও, চন্দ্র?

—সেই কথাই বটে, বলিতে বলিতে চন্দ্র যেমন দ্রুত আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই যেন ঝড়ের বেগে চলিয়া গেলেন অন্য দিকে। উদ্যানের বিপরীত দিকে, সভাগৃহের অপর প্রান্তেও প্রশস্ত বারান্দা এবং সুচারু স্তম্ভ শোভিত অলিন্দ্যের কোলে সারি সারি সুসজ্জিত কক্ষশ্রেণী। রাজবয়স্য প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়

রাজপুরুষগণের জন্যই। সেই চত্তর অতিক্রম করিয়া কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া মহারাজ উদ্যান পথে আসিয়া পড়িলেন এবং অন্তরে অমীমাংসিত কোন বিষয় লইয়া আলোচনা কালে যেমন হয়, অত্যন্ত চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্তে উদ্যানের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পদচারণা করিতে লাগিলেন। নিম্নদৃষ্টি, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় বেগে দোলাইয়া মহারাজ এমনভাবে পাদচালনা করিতেছিলেন—ইতর জনে দেখিলে মনে করিত যেন দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। এমন সময় মহামাত্য, ঊর্দ্ধবাহুতে জয়মুদ্রা দেখাইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ ক্ষণেক স্থির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া, পরে জোড় হস্তে প্রণাম করিলেন। বলিলেন—তাতঃ, ভৃত্যমুখে আপনি যে আজ্ঞা করেছেন আমি তো তার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করতেই পারলেম না। আর্য্য চাণক্য কহিলেন,—কেন বৎস? অস্পষ্ট ভাষায় কিছু বলি নি তো!

চন্দ্র—প্রাসাদ শীর্ষে ছত্র মধ্যে রাত্র যাপনের কথায় কি বুঝবো, মহাভাগ?

চাণক্য—এই বুঝবে, যখন প্রাসাদের অন্তঃপুর মধ্যে কোন কক্ষই আর তোমার মনমত নয়, তখন প্রাসাদ শীর্ষে একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিলে মন্দ কি? মাত্র শয়ন কালেই ব্যবহার করবে। এ ছাড়া ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

চন্দ্র—এখন মনে হয় এটা সম্ভব এবং সত্যই বিবেচনার যোগ্য, তখন ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি পরিহাস করেছেন।

মহামাত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—তুমি কি আমার পরিহাসের যোগ্য, বৎস?

চন্দ্র—আর্য্য! এই রাজ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার পরিহাসযোগ্য আর কোন্ ব্যক্তি পরিহাসের যোগ্য নয় তাহা স্থির করা আর যিনি সক্ষম তিনি করুন আমার অসাধ্য।

অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—তাহলে এখন কি সত্য সত্যই আমার প্রাসাদশীর্ষের ত্রি-তলে রাত্র যাপন করতে হবে?

মহামাত্য মৃদু মধুর সংযত কণ্ঠে কহিলেন,—আসল কথা আমিই জানি, পূর্ণ দ্বাদশটি মাস ত দূরের কথা, একটি মাসের ত্রিশটি দিনও একাদিক্রমে কোন কক্ষেই তুমি থাকতে পার না। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মহারাজ অধৈর্য্য ভাবে খানিক ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর বলিলেন,—এমন একখানি ঘর দেখলাম না যে, সেখানে মশার উৎপাত নাই। আর মশা, মাছি বর্ষার পোকা তাড়াবার জন্য

পর্য্যায়ক্রমে সেবিকারা সারা রাত আমার শয়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ঘোরাতে থাকবে এটাও অসহ্য। কেন আমি এত অসহায় অবস্থায় থাকবো। চামর ধারণী কোন প্রয়োজন নাই। আমি চাইনা।

চাণক্য—সেই জন্যই তো ছাদের কথা বললাম না? প্রাসাদশীর্ষে মশকের উৎপাত থাকবে না, আর সেথায় কোন উপকরণ সজ্জারও দরকার নেই, আর যদি ইচ্ছে কর তো চামর ধারণীরাও না হয় থাকবে না।

চন্দ্র—প্রহরীও কেউ থাকবে না।

চাণক্য—না, তা হবে না, প্রহরী থাকবে, তবে উপযুক্ত ব্যবধানে থাকবে। রক্ষকশূন্য অবস্থায় রাজার থাকতে নাই।

উত্তেজিত ভাবে মহারাজ বলিলেন—কেন আমি কি বন্দী?

মহামাত্য বলিলেন—বৎস! বিপরীত ধারণা কর কেন? আমি কিছু নূতন ব্যবস্থা করিনি, করবোও না। রাজশরীর নিদ্রিত অবস্থায় অসহায় বৈকি? তখন কোন জাগ্রত বীর ঐ শরীর রক্ষা করবে, অবশ্য উপযুক্ত ব্যবধানে থেকেই, তাহাতে তোমার আপত্তি কেন?

চন্দ্র—আপনার যুক্তি অকাট্য, আমি কোনটাই কাটাতে পারি না।

চাণক্য—তাই বুঝি ক্ষোভ হচ্ছে? নিষ্প্রয়োজনে রাজশক্তি এবং রাজকোষের অপব্যয় না হয়, সেই জন্যই তো আমার থাকা। তোমায় আমি যুক্তিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করতে বা কোন প্রকার গ্লানি তোমার সন্নিকটে আসতে দেবো না, স্থির জেনো।

চন্দ্র—ভালো, আপনার যুক্তি গ্রহণ করলাম্। এখন আরো একটি বিশেষ জিজ্ঞাস্য আছে। মহামাত্য বলিলেন—বল বৎস!

চলিতে চলিতে মহামাত্য আসনের নিকটে আসিলে, উদ্দেশ্য বুঝিয়া মহারাজ বলিলেন,—তাতঃ! আপনি উপবিষ্ট হোন,—আমার পক্ষে দাঁড়ানোই ভালো। চাণক্য উপবেশন করিলেন।

চন্দ্র—শুনলাম যবনদূত যাচ্ছেন দেশে, কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে নাকি? কি মনে হয় আপনার?

চাণক্য—অবশ্যই আছে, এ বিষয়ে আর সংশয়ের অবসর কোথা? চিন্তিত মনে মহারাজ বলিলেন—কোন্ দিকে?

চাণক্য—যে দিক দিয়ে সেলুকাস্ খানিকটা তার অধিকৃত রাজ্য হারিয়েছে ঠিক সেই দিকে। মহারাজ বলিলেন—আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।

আর্য্য চাণক্য বলিলেন—তবে সে জন্য আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই।
শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন—কেন ?

মহামাত্য বলিলেন—দূতবর এখানে এখনকার স্থায়ী যে সব আয়োজন দেখে যাচ্ছেন, তাতেই অন্তত দুই পুরুষকাল সীমান্তে যবন রাজের আর মাথা তুলতে হবে না।

চন্দ্র—আচ্ছা কেন এখনও এ প্রচেষ্টা ? তাদের এখনও এ বিশ্বাস কেন হোল না যে,—

চাণক্য—আহা বৎস ! বীরত্ব, বাহুবলে পরদেশের ঐশ্বর্য্য, ধন, প্রজাবর্গের উপর অধিকার স্থাপন এবং জাতিগত স্বাধীনতার কত বড় গর্ব্ব, পাশ্চাত্ত-ভূমির যবনের দম্ভ কতটা তা তো তুমি জান ? যবন বীর আলেকজাণ্ডার, যখন এখানে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত ভাবেই পরিচয় ঘটেছিল তো ? কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁরা সদর্পে উত্তর ভারতে পঞ্চনদের কতকাংশ অধিকারও করেছিল, এ কথা তারা ভুলবে কেমন করে ? তারা এই জয় গৌরবেরই দামামা শতাব্দির পর শতাব্দি বাজিয়েই না পাশ্চাত্ত গগন ফাটাবে ? বর্ব্বর জাতি প্রথম শৌর্য্যবীর্য্যের আস্বাদ পেয়েছে, তার পর এতটা দূরে এসে বিজয়ী হওয়া, প্রাচ্য জনপদ অধিকার স্থায়ী হোক বা না হোক কিন্তু একবার কিছুদিনের জন্য অধিকার করেছিল, এ গৌরব রাখার স্থান কোথায় ? সেখানে তাদের ইতিহাসে এ ভাবের বিজয় এই প্রথম,— কাজেই, সেই গৌরব উচ্ছ্বাস ঐ ক্ষুদ্রদেশে উপচিত হবে, পরে সেভূমিতে স্থান না পেয়ে পুনঃ এই প্রাচ্যের প্রাঙ্গণেই আবার রেখে যেতে হবে যে তাদের সেই গৌরবের বোঝাটা। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ওরা প্রাকৃত নিয়ম জানেনা, পশুবলকেই একমাত্র বল মনে করে। ঐ হিংস্র পশুবলেই প্রাচ্যভূমি অধিকার করে থাকা অসম্ভব, পাশ্চাত্তের পক্ষে অসম্ভব, এটা তারা ভাবতে চায় না। তা ছাড়া আরও একটী সত্য এই যে,—আলেকজাণ্ডারের পরেও তার দলের কাছে সাম্রাজ্য জয় ও স্থাপনের লোলুপতা এখনও কমেনি। গ্রীস্ ছাড়িয়ে এখনও তাদের অধিকার বহুদূর বিস্তৃত আছে। তুমি মাত্র ভারত হতেই তাদের তাড়িয়েছ, ভারত সীমান্তের অদূরে এখনও তারা যে প্রবল। পশু-সংস্কার সহজে যায় না, বহুকাল লাগে পশু-সংস্কারমুক্ত হতে। এখন কেবল তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আর কাছে আসতে পারে না, সখ্য ভাব স্বীকার করেছে।

শুনিয়া মহারাজ মহাচিন্তিত ভাবেই বলিলেন,—এখানেই তো আশঙ্কা, এ

কথা আমি ভাবি যে, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হয়ত তারা গান্ধার জয় লালসায় আমাদের উত্ত্যক্ত করতে চেষ্টা করবে।

চাণক্য—তোমার তক্ষশীলা কেন্দ্রে আর গান্ধার প্রান্তে যতদিন মহাশক্তিশালী মৌর্য্য বাহিনী অটুট্ থাকবে, সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ শবর প্রজার আনুগত্য দৃঢ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত কখনও আসবে না। নিশ্চিন্ত থাক, বৎস! তোমার সাম্রাজ্যে তক্ষশীলা অর্থাৎ গান্ধাব প্রান্তই সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মহারাজেব কোন গুরুতর কথা যেন স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন,—ভাল কথা, আপনি প্রথমে বিন্দুকে তক্ষশীলায় পাঠাতে চান কেন? বিন্দুসারকে এখন কি ওখানে পাঠান উচিত হবে, তাত?

চাণক্য—এখন হতে তক্ষশীলার প্রত্যেক বিভাগেই তার শিক্ষা আবম্ভ হোক্, আমি তাই চাই। যে রাজকুমার তক্ষশীলার শাসন-কর্ত্তৃত্ব সবলে গ্রহণ, আয়ত্ত ও রক্ষা করতে পারবে, সেই মৌর্য্য সাম্রাজ্য শাসন করবে। তক্ষশীলার গুরুত্ব এখন হতেই তার অন্তরে গভীর ভাবে স্থান পেলে কালে সাম্রাজ্য শাসন প্রণালীর সঙ্গে যথার্থই পরিচয় ঘটবে। কর্ম্ম দায়িত্ব প্রথম হতেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া তোমার প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন? সেটা উপেক্ষণীয় মনে করচ কেন?—

শুনিয়া মহারাজ বলিলেন,—তার তো এখনও সময় যায়নি,—কিছুদিন আরও বিলম্ব হলেও ক্ষতি নেই বলেই মনে করি। সেজন্য বিন্দুকে এত শীঘ্র পাঠাবার দরকার কি? আমার মনে হয় নিকটস্থ কোন প্রদেশ বা মগধের কোন নিকট প্রান্তে আগে তাকে কিছুদিন রেখে,—

চাণক্য—বাধা দিয়া বলিলেন,—বিন্দু শুধু তোমার পুত্র নয়, সে আমারও একমাত্র প্রিয়তম সন্তান ও শিষ্য। তার প্রাণের মূল্য আমার কাছে অনেক।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহারাজের মুখের দিকে দেখিলেন, সে মুখে চিন্তার ভ্রূকুটি রেখা দেখিয়া, মহামাত্য পুনরায় বলিলেন,—বৎস! অপত্যস্নেহে অন্ধ হয়েছ? চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ যবন পরিবৃত গান্ধার প্রান্তে তক্ষশীলায় বিন্দুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা অনুমান করেই সম্ভবতঃ ভীত হয়েছ?

চন্দ্র—ভীত হয়েছি, আমি? এ কথা আপনি বললেন? শুনিয়া মহামাত্য তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—তুমি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট হতে পার, কিন্তু তুমি যে এ সংসারে গৃহস্থাশ্রমের সাধারণ মায়ামুগ্ধ একটি জীব, একথা ভুলে যাও কেন? বিন্দুকে

তক্ষশীলায় পাঠাতে অনিচ্ছা, তোমার অন্তরে তার যে অমঙ্গলাশঙ্কা এটা যে প্রচ্ছন্ন ভীতি, তথা দুর্ব্বলতারই নামান্তর নয় কি ?

শুনিবামাত্রই অধৈর্য্য দ্রুত পাদক্ষেপে কত দূর যাইয়া পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বলিলেন,—আঃ, বার বার আপনার ঐ অকাট্য যুক্তি আমায় ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছে। আপনার প্রতাপ আমার অসহ্য।

শুনিয়া চাণক্য বলিলেন,—দেখ, চন্দ্র! একদিকে তুমি সকলের কাছেই অদ্বিতীয় বীর,—রণ-দুর্ম্মদ্ সেনানায়ক, এবং তেজস্বী, ইহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর কিন্তু যখনই তোমাতে আমাতে কোন বিষয় বিচার বা আলোচনা হয়, তখনই তুমি উৎকট ক্ষত্রিয় দম্ভে উত্তেজিত হয়ে চঞ্চল বালকের মতই আচরণ কর। এই বিশাল রাজ্যের সর্ব্বেব শৃঙ্খলা বজায় রাখবার পক্ষে তোমার একাব শক্তি পর্য্যাপ্ত নয়, এটি পরীক্ষিত সত্য। আরও একটী কথা তোমায় জানিয়ে রাখি, যখনই দেখবো মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থায়ী করতে আমার আর প্রয়োজন নাই, তখনই আর আমায় দেখতে পাবে না। নিস্প্রয়োজনে মুহূর্ত্ত এখানে নষ্ট কোরব না। আমার কাজ প্রায় শেষ হয়েই এসেছে বৎস।

মহারাজ ধীর ভাবেই শুনিতেছিলেন, শেষ কথাগুলি শুনিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়াই বলিলেন,—

—তা হলে যা শুনেছিলাম তা সত্য, আপনি মগধরাজ্যের সংস্রব ত্যাগ করবেন এটী গুজব মাত্র নয় ? আর এই ত্যাগ আমার প্রতি অসূয়া পরবশ হয়েই করবেন বোধ করি ?

চাণক্য—তা কি করে হবে ? একজনের উপর রাগ করে একটা মহৎ কল্যাণের সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে আর যে পারে পারুক বিষ্ণুগুপ্ত পারে না, এতদিনে আমার সঙ্গে ব্যবহারে সে ভাবের পরিচয় কখনও পেয়েছ কি। এ যে আমার জীবন ও নীতি বিরুদ্ধ, এ সব কি বলছ তুমি বৎস ? তোমার মতামত আমায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করবে, একথা ভাবতেও পারি না যে।

চন্দ্র—তবে রাক্ষসকে এত সমাদর করে রাজস্ব বিভাগের সকল কার্য্যের ভার দিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সমর্পণের চেষ্টা হচ্ছে কেন ? জানতে পারি কি ? আজ আমি এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে চাই। তাতঃ আর আমায় অন্ধকারে রাখবেন না।

চাণক্য—নিশ্চয় জানবে বৎস! আমার অবর্ত্তমানে কাত্যায়ণ ব্যতীত এ কাজের উপযুক্ত কেউ নেই ব'লেই কাত্যায়ণকে আমি দায়িত্ব অর্পণে অগ্রসর

হয়েছি। আমি তাকে যে ভাবে পেয়েছি, মৌর্য্যবংশের মহা শুভগ্রহের যোগাযোগের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে, একথা নিশ্চিত জেনো। বৎস, একটু ভেবে দেখো।

চন্দ্রগুপ্ত একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—রাজ্যনীতি ও সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা যা বল্লেন, তা সত্য বোলেই আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমার প্রতি তাঁর প্রীতিমূলক ব্যবহার কি সম্ভব? একটি প্রবল আক্রোশ আমার উপর নাই কি তাঁর মনে?

চাণক্য—যে আক্রোশটী তুমি তোমার উপর মনে কোরছ, আসলে কিন্তু সেটী ছিল আমারই উপর, তার তখন উপযুক্ত কারণও ছিল কিন্তু আজ আর সে মনোভাব নেই তার, কারণ তার সকল যোগাযোগই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ;—

চন্দ্র—কেমন করে জানলেন আপনি? আমার সন্দেহ হয়, নন্দবংশের উপর তাঁর এখনও মনের পক্ষপাত আছে।

চাণক্য—বৎস! লোক-চরিত্র নির্ণয় তোমার কর্ম্ম নয়। নন্দবংশের উপর তার কোন মমতা নেই, কোন কালেই ছিল না। আসলে তার নিজ রাষ্ট্র-প্রতিভা বিকাশের পথে বাধা পাওয়াই সবার বড় কথা তার কাছে। তার সেই রাষ্ট্রপ্রতিভা ঐ পাপিষ্ঠদের হাতে নির্য্যাতীত হয়েছে, তাই নন্দবংশের কারো উপর তার আকর্ষণ ছিল না, বিশেষতঃ যেদিন থেকে বৃদ্ধ ধননন্দের হাত থেকে রাজদণ্ড তার মহাপাতকী পুত্রদের হাতে চলে গেল, সেই সময় থেকে তার দুঃখের পালা আরম্ভ ; এমন কি কারাবাস ইত্যাদি এ সব দুর্ভোগের কথা তো তুমি ভালোই জানো। যাই হোক এখন আমি তাকে বন্ধুরূপেই পেয়েছি। তোমার উপর তাঁর প্রীতি আগে হয় ত ছিল না, কিন্তু এখন তার অন্য অবস্থা, এখন এই নূতন মগধ রাষ্ট্র ব্যতীত আর কোথাও তার প্রতিভার আদর হবে না, বর্ত্তমানে অন্য কোনও রাষ্ট্রক্ষেত্রে তার উপযুক্ত স্থান আর নেই, একথা বিশেষ জেনেই সে তোমার আনুগত্য মনে প্রাণেই স্বীকার কোরেছে। আর তবেই না আমি তাকে আমার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে কৃত-সংকল্প। এখন আর এ সকল কথার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনীয় যদি কিছু থাকে তো বল, আমি অবহিত চিত্ত হয়ে আছি।

মহারাজ এবার স্থির হইলেন। অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাঁকে স্থির দেখা গেল, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—তা হলে বিন্দুর তক্ষশীলা যাত্রাই স্থির?

তক্ষশীলা প্রান্তের প্রজারা স্থির শান্ত কিনা, এ সকল অনুসন্ধান হয়েছে কি? তা ছাড়া—

বাধা দিয়ে মহামাত্য একটু চিন্তিত ভাবেই বলিলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সব স্থির হয়ে যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

কথাগুলি শুনিয়াই মহারাজ মাথা নত করিলেন, তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—সত্য, সত্যই বলেছেন আপনি, উৎকট ক্ষত্রিয় অভিমান, রাজ্য-পালক অভিমান, রাজ্য জয়, বৃদ্ধি ও শাসনের অভিমান, নরপতির শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানই আমার কাল হয়েছে। এই বাহুবলের গরীমা, ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার যেন কিছুতেই ক্ষীণ হতে চায়না। আপনার অগোচরে যতই কেন বিচার করিনা, সত্যের প্রভাবে স্বল্পক্ষণ মুগ্ধবৎ স্থির থাকলেও পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ মাথা তুলতে থাকে। শৌর্য্য, বীর্য্য ও বাহুবলের দম্ভ এই ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে দুর্নিবার। আমার মনে হয়, গুরুদেব! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের দ্বন্দ্ব চিরন্তন বিধাতার বিধান। সর্ব্বযুগের সর্ব্বকালের, সভ্য মানুষ সমাজের কোন না কোন এক উপলক্ষে ঐ দ্বন্দ্ব প্রকট হবেই।

চাণক্য—ক্ষত্রিয় বর্ণের জাতিগত এই স্থূল দম্ভ ও অহঙ্কারের ফলে, প্রতি রাজ্যেই সমাজের কত অমঙ্গল হচ্ছে এবং হবেও। বাহুবলের গরীমা বা তেজ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না কোন দিনই। কারণ শক্তির সাম্য হীনতা থেকেই ওর উৎপত্তি। সেই সাম্যের অভাব, সেই বৈষম্য দূর করতেই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে, ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ প্রজা মন্ত্রী এই দুইটিতেই রাষ্ট্রগত উদ্দেশ্য স্বার্থক করে, বংশগত ব্রাহ্মণদের কথা বলিনি আমি, প্রকৃত ব্রাহ্মণের কথাই বলছি। গুণগত বৈশিষ্টই জাতিতত্ত্বের গোড়ার কথা। একথা তোমায় বেশী করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। বহুবার একথা আমার কাছে শুনেছ, শিখেছ, বুঝেছ, অন্তরে স্বীকার করেছ,—তাই না আজ তুমি দাম্ভিক, দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, কঠিন দণ্ডধর হলেও সারা রাজ্যের কল্যাণের প্রতীক জগৎপূজ্য হয়েছ। কোথায় নিয়ে যাবে তোমার ঐ ক্ষত্রিয় দম্ভ শৌর্য্য, বীর্য্য বাহুবলের অহংকার যদি তোমার পিছনে সত্য কল্যাণময় নির্দ্দেশ না থাকে? ভবিষ্যতে কোন কারণেই এটি বিস্মৃত হ'য়ো না। আরও একটি কথা আছে, কাত্যায়ণকে কখনও ক্ষুদ্র ভেবোনা। দীর্ঘকাল প্রবাসী থাকায় তুমি তাকে চিনতে অবকাশ পাওনি, আর সেও তোমায় ঠিকমত বুঝতে পারেনি; যাই হোক এখন আমার অনুরোধ, তুমি তার সঙ্গে আর অত দৃঢ় ব্যবধান

রেখে চলোনা। তার প্রতি সদয় এবং বিশ্বাসপূর্ণ ব্যবহার কোরবে। সে তোমার বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র।

শুনিতে শুনিতে মহারাজ ধীর এবং শান্ত হইয়া গেলেন, কতকটা যেন চিন্তিত মনে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—তাই হবে তাতঃ, আপনার যেমন ইচ্ছা।

ষোল

পরদিন আবার সংবাদ আসিল, মহামাত্য দুই বন্ধুকে স্মরণ করিয়াছেন।

এ আহ্বানে তাহাদের উভয়েরই অন্তর উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিক্রম বিশেষভাবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। নিশ্চয়ই তাহাকে ভবিষ্যৎ কোন কল্যাণকর কর্ম্মে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই আজ এই আহ্বান। অদ্রী ভাবিল অন্যরূপ, সে কথা যথাকালেই জানা যাইবে।

তাহারা আচার্য্যের আশ্রমে পৌছিয়াই দেখিলেন, মহামাত্য আপন আসনে উপবিষ্ট আছেন। প্রণামান্তর শিষ্টাচারের পর তিনি বলিলেন,—এক নূতন বান্ধবের সঙ্গে শুভ মিলন ও স্নেহ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই আজ তোমাদের আহ্বান করেছি, বৎস! হয়তো এই পরিচয়ের ফলে উভয় পক্ষেই সম্বন্ধটা ভবিষ্যতে পরম কল্যাণকর হতে পারবে। এখন উপবেশন কর বৎস, আসনে প্রতিষ্ঠিত হও।

উভয়েই উপবেশন করিলে দ্বারপ্রান্তে ঝম ঝম শব্দ উভয়েরই শ্রবণগোচর এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা দেখিল, সুচারু বর্ম্মচর্ম্ম-শোভিত প্রায় অষ্টাদশবর্ষীয় দীর্ঘ শরীর এক অপরূপ সুন্দর যুবামূর্ত্তি কক্ষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহার দুইপার্শ্বে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দেহরক্ষীদ্বয়। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল না, বাহিরে দ্বারের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। যুবক ধীরে ধীরে সংযতপদে আসিয়া মহামাত্যের সম্মুখে বীরাসনে বসিয়া উষ্ণিষ উপরিস্থিত কিরিটিশোভিত মস্তক ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর দণ্ডায়মান হইলে মহামাত্য সস্মিত বদনে বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরম স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যেন তাঁহার আশা মিটিতেছিল না। উপবিষ্ট হইলে পর স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিলেন,—বৎস বিন্দুসার, বন্ধুত্বসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করিতেই আজি তোমাকে আমার দুটি প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে পরিচয় ও মিলন করাইয়া দিব, বলিয়া তারপর অদ্রী এবং বিক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করিতে তাহারা নিকটে আসিলে কহিলেন,—দেখ অদ্রী তোমাদের যুবরাজ; বিন্দুসারকে বলিলেন,—ইঁহারা কোশলের।

বিন্দুসার বলিল,—শ্রাবস্তীর কোশল? মহামাত্য সংশোধনার্থে বলিলেন,

—না বৎস, এঁরা প্রয়াগান্তর্গত প্রতিষ্ঠানের। কাশী, কৌশাম্বী ও প্রতিষ্ঠানেও কোশল রাজবংশের বিস্তার, তুমি তো শুনেছ? বিন্দু বলিল,—সত্য, দেব! আপনারই উপদেশে জানি, অযোধ্যার কোশল প্রাচীন কুরুবংশের শাখা। মহান ঐ কোশল রাজবংশ পরে শ্রাবস্তী তারপর দক্ষিণে কৌশাম্বী এবং কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তারপর মগধের নন্দ রাজবংশের অভ্যুদয়। মহামাত্য বলিলেন,—হাঁ বৎস, এঁরা প্রতিষ্ঠানের, মহারাজ শক্রজিৎ কোশল, তস্যপুত্র ইনিই যুবরাজ বিক্রমজিৎ। কোশলের যুবরাজ—কথাটা শুনিবামাত্র বিন্দুসার অগ্রসর হইয়া আসিলে বিক্রম দ্রুত আসিয়া মধ্যপথে উভয়ে উভয়কে বক্ষে ধারণ এবং পরে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। ইহাই ছিল তখনকার রাজবংশের শিষ্টাচার।

মহামাত্য বলিলেন—প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের কথা বোধ হয় মনে আছে; গত বৎসর তোমার পিতামহীর সঙ্গে কুম্ভমেলা উপলক্ষে গিয়েছিলে তুমি, সঙ্গমের উপরেই যে দুর্গ দেখেছো ঐটিই প্রতিষ্ঠানের দুর্গ! তারপর অদ্রীর দিকে দেখাইয়া, ইনি কোশল রাজের বীর কুমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অদ্রীহরি। তখন বিন্দুসার পুনরায় অগ্রসর হইয়া আসিলে সসম্ভ্রমে অদ্রী আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। অতঃপর মহামাত্যের অনুমতিক্রমে সকলেই উপবেশন করিলে প্রফুল্ল চিত্তে বিন্দুসার জিজ্ঞাসা করিল,—গুরুদেব! আমি শুনেছি সঙ্গমের উপরের দুর্গটি প্রাচীন ভারতের লোকবিশ্রুত মহারাজ পুরুরবার দুর্গ। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা যে কোশল দুর্গ তাহা বিল্বদেবল

আমাকে বলেননি। পরে আমার অনুরোধ সত্বেও তখন দুর্গ মধ্যে যেতে বারণ, আর যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন।

শুনিবামাত্র বিক্রমের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল; সরল অদ্রীও কিছু বুঝিল বটে, কিন্তু এমনভাবে এখানে এ কথার আলোচনায় তাহারা আসিয়া পড়িবে, কেহই কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া মহামাত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনিই ইহার সহজ গতি দিতে পারিবেন আর কারো সে সাধ্য নাই।

মহামাত্য এ সকলই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি তখন বলিলেন, বিন্দু, তখন যে তোমাকে কোশল দুর্গ দেখানো হয়নি তাহার কারণ ছিল; তোমার পিতামহী তোমায় তাঁর চক্ষের আড়াল করতে চান নাই। এখন তোমার পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়, তাহা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। যাই হোক এখন তোমার সঙ্গে বিক্রম, কোশলের যুবরাজ ও অদ্রী, কোশল কুমারের আলাপের সুযোগ উপস্থিত।

বিন্দু অতীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। এখন কিছু না বলিয়া প্রসন্নমুখে অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে বলিল,—আর্য্য বিক্রমের রথ এবং অশ্ব চালনায় ও কুমার অদ্রীহরির মল্লবীর বলিয়া খ্যাতি আছে শুনেছি। এবারে স্থানীয় অপর একটি উপযুক্ত মগধ বীরের সঙ্গে এখানে ক্রীড়ায় যদি নামেন ক্ষতি কি। গুরুদেব! আপনি অনুরোধ করুন তাঁরা সম্মত হলে আমরা সবাই দেখব। কোশলের মল্ল চিরদিন শ্রেষ্ঠ শুনেছি।

বিক্রমজিৎ কোশলের রথাশ্বচালনা সম্বন্ধে বিন্দু যে সত্যই পূর্ব্বে কিছু শুনিয়াছিল তাহা নহে; তখনকার প্রচলিত ব্যবহার এইরূপই ছিল যে, প্রত্যেক সুস্থ সবল যুবরাজ কুমারের রথ এবং অশ্বচালনা দক্ষতা অতীব সহজ সত্য বিষয় ছিল; কাজেই, তার এ প্রস্তাব কোন প্রকারেই অস্বাভাবিক তো হয়ই নাই এবং সময়োচিতই হইয়াছিল। অপর পক্ষে আরও কোশলের মল্ল সমাজের প্রতিষ্ঠার কথা সুদূরপ্রসারিত ছিল, ইহাও সত্য। যাহাহউক, যুবরাজের এই ক্রীড়ার প্রস্তাবটিতে এ ক্ষেত্রে, আমাদের দুই বন্ধু—তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহস এবং উদ্যমপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাইয়া যুবরাজের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পারিল না। আর্য্য চাণক্যও প্রসন্ননয়নে তাঁহার অনুমোদন জ্ঞাপন কবিলেন। তিনি এখন বলিলেন,—কেমন অদ্রী, এই উপলক্ষে একটি চমৎকার আনন্দ উৎসবের আয়োজন তোমাদের সম্মতির উপর নির্ভর করছে।

কুমার বিক্রম ও অদ্রী স্বীকার করিলে বিন্দুসার আর্য্যগুরুকে তৎক্ষণাৎ দিন স্থির করিতে অনুরোধ করিল। ঠিক হইয়া গেল বৈকালে পরশ্ব দিন প্রাসাদাভ্যন্তরের বাহির উদ্যানের একাংশে মল্লক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইবে ; কেবল রাজপরিবারবর্গ দেখিবেন, মহারাজ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কিনা জানিয়া আগামীকল্য মহামাত্য ঘোষণা করিবেন। পরে সকল কথা হইয়া গেলে আর্য্য মহামাত্যের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর যুগপথ আনন্দ ও উদ্বেগের স্পন্দন লইয়া অদ্রী ও বিক্রম বিদায় লইল।

এইবার চাণক্য বিন্দুসারকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বিন্দু! আমি তো তোমায় অনুরোধ করিনি, মহারাজও করেননি নিশ্চয়, আরও জানি, তোমার জননীও কখনই এটি সমর্থন করবেন না, তত্রাচ তুমি তক্ষশীলা প্রান্তে যাবার জন্য এতটা আগ্রহশীল কেন ?

মহামাত্য চাণক্যদেবের এই কথা শুনিয়া বিন্দুসার প্রথমে ঈষৎ মধুর হাসিল, তারপর তাহার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া মহামাত্যের মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিল। তীক্ষ্ণ তার কৌতুহলপূর্ণ এবং দীপ্ত চক্ষু লইয়া তাহার মুখে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য এবং সরলতা খেলা করিয়া গেল। তারপর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আচার্য্য দেব! গত দুই বৎসরের মধ্যে আপনার ব্যবস্থামত সারা উত্তর ভারতের রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি সবই আমার দেখা হয়েছে কিন্তু পশ্চিম-উত্তর গান্ধার প্রান্তে দুর্দ্ধর্ষ প্রজাগণ বাস করে শুনেছি, তারা ভয়ানক যুদ্ধপ্রিয় দুঃসাহসী, তাই এখন একান্তভাবেই তক্ষশীলা প্রান্ত দেখিবার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করছি। তাতঃ, আমি মনে মনে জানি, এতে আপনার পূর্ণ সহানুভূতি আছে ; একদিন আপনিই বলেছিলেন যে, সেইখানে আমার প্রথম রাজ্যশাসন শিক্ষার আরম্ভ হবে, এ বিধান নিশ্চয় করবেন। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, পিতৃদেব মহারাজও এতে আপত্তি করবেন না ; কারণ, সে সময়ও এসেছে। এই সব বিচার করেই আমি এতটা আগ্রহশীল।

চাণক্য বলিলেন,—বিন্দু! তুমি আমার কাছে এসো। বিন্দু নতমস্তকে নিকটে আসিল। মহামাত্য তাহাকে আপন আসনের পার্শ্বে বসাইয়া সস্নেহে তাহার স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত রাখিলেন, পরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এটাও সত্য, কিন্তু এটা বাইরের কথা, তোমার অন্তরের কথাটা বলো ; আমার কাছে গোপন কোরোনা বৎস! তুমি তো জানো, আমার দ্বারা তোমার কখনই অকল্যাণ হবে না।

এবার বিন্দুর মাথাটি আরও নত হইল, কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বিন্দু এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বলিল,—কেন গুরুদেব! আমার গুহ্যবিষয়ে আপনি হস্তক্ষেপ করতে চান? আমি—আমি চাই না বিদীশা রাজকুমারীকে বিবাহ করতে, আর সেই জন্য আরও আমি তক্ষশীলা যেতে চাইছি, একথা সত্য!

মহা—তোমার একটি ভ্রমের ফলে ভবিষ্যৎ রাজবংশের অকল্যাণ, এ কেমন করে আমি সহ্য করবো, বলো তুমি? রাজবংশের একমাত্র অবলম্বন, ভবিষ্যৎ মৌর্য্য সিংহাসনের অধিকারীর নির্ব্বিচারে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া চলে না, একথা তোমাকে বুঝতেই হবে যে।

বিন্দু—তাতঃ! এতে আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তা জানেন কি? এ জীবনে আমি সুখী হতে পারবো না, নিশ্চয় নিশ্চয়—

মহা—আচ্ছা, তোমার পিতামহী কি বলেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন তোমার সকল কথা?

বিন্দু—তিনি জানেন, কিন্তু তিনি যা বলেন তাও সম্ভব নয়, সে এক চাতুরী।

মহা—আমি জানি তিনি কি বলেন, আর আমিও তোমায় তাই-ই বলবো। সেইটাই একমাত্র উপায় রাজবংশের বিশেষতঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর পক্ষে।

বিন্দু—আর্য্য! পিতামহী বললেন, বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে।

মহা—আচ্ছা বিন্দু, আমি তোমার ত্যাগের পরীক্ষা করবো, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এই রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের বিস্তার তোমার জানা আছে?

বিন্দু—আছে দেব; আছে বোলেই বিশ্বাস করি।

মহা—বেশ ভালো কথা, আচ্ছা ভেবে নাও এই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের মহারাজ থেকে আরম্ভ করে মহামন্ত্রী, মন্ত্রণা পরিষদ, প্রাডবিবাকগণ সন্নিধাত্রি, পুরোহিত, ঋত্বিক, রাজ বয়স্য, রাজ্যের সমাহত্রি প্রদেষ্ট্রি, পৌর, কর্ম্মান্তিক, দণ্ডপাল, অধ্যক্ষগণ,—একধার থেকে সবাই, এমন কি গরীষ্ঠ প্রধানগণ, প্রধান নাগরিকগণ, শ্রেষ্ঠী এবং সাধারণ প্রজাবর্গ, তাদের যুবরাজকে বিদীশা রাজকুমারীর সঙ্গে উদ্বাহ সংস্কারে সংস্কৃত দেখতে চায়। এমন কি তারা সেইটাই আন্তরিক কামনা করে; তুমি সবার মতামত উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করে তোমার ব্যক্তিগত সুখ সম্ভোগের জন্য কোন অপাত্রীকেই অবলম্বন কোরবে?

বিন্দু—কিন্তু গুরুদেব! ক্ষমা করবেন, আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন করবো—

কেন, কেন এরা সবাই, রাজ্যের সবাই আমার সুখের পথে এমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে, এমন ষড়যন্ত্র করবে ? এতে লাভ কি তাদের ?

মহা—তার উত্তরে আমি বলবো এই যে, রাজবংশের বিবাহ সংস্কার এবং তার মধ্যে রক্তের পবিত্রতা এবং একটা অপূর্ব্ব বিশুদ্ধির বিষয় আছে। সবাই চায় তুমি যেমন এক পবিত্র রাজবংশীয় পুরুষ, তেমনই এক পবিত্র রাজবংশীয় কন্যার যোগাযোগেই লাভ করো উপযুক্ত এক বংশধর, যিনি, ভবিষ্যতের এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র রাজ্যভার বহনে সক্ষম এবং যা সাধারণ প্রজার ঘরের অশিক্ষিত এক সাধারণ কন্যার সঙ্গে প্রণয়াশক্তির ফলে ঘটা সম্ভব নয়।

বিন্দু—কিন্তু তাতঃ, একটা সংস্কৃত বিবাহের ফলেও ত ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাজবংশেও ত নিষ্ঠুর কুলাঙ্গারও জন্মায়, যারা রাজা নামের অযোগ্য।

আর্য্য মহামাত্য চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন—সত্য, অতীব সত্য বৎস, কিন্তু সেটা সংস্কৃত বিবাহের দোষে নয়, দুষ্ট অথবা বিচারহীন পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনের ফলেই ঘটে। এখানে আবার আরও বিশেষ ভাবেই একটা কথা আছে। কন্যার পিতৃকুলের চেয়েও দুর্ব্বার শক্তিশালী হল মাতৃকুল, যে মাতৃকুলের প্রভাব কোন বংশধরই এড়াতে পারে না। সেই জন্য এই নির্ব্বাচন নির্দ্দোষ হওয়া চাই বৎস !

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল—মাতৃকুলের প্রভাব পিতৃকুল অপেক্ষা প্রভাবশালী, এসব কথা কি বিচারযোগ্য ? আমার মনে হয়, এটা শাস্ত্রের বিধিমাত্র, এর মূলে কোন সত্য আছে কিনা সংশয়ের কথা। চাণক্য তখন দৃঢ় ভাবেই বলিলেন —মাত্র শাস্ত্র-বিধি যাকে মনে করছ, সেটা বিজ্ঞানসম্মত সত্য এবং সিদ্ধান্ত। এ সত্য যে প্রমাণিত তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে, তুমি নিজে বাস্তব কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখলে। তুমি তো নন্দবংশের শেষ শ্রেষ্ঠ ধননন্দের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র বলানন্দের নৃশংস ব্যভিচারী দুষ্ট স্বভাবের কথা শুনে থাকবে, যা তাদের বংশনাশের কারণ হয়েছিল। এতটা প্রজাপীড়ন ঐ রাজবংশেই অজ্ঞাত ছিল। বলানন্দের ঐ দুষ্টপ্রকৃতি এলো কোথা থেকে ? তার মাতৃকুলের ইতিহাসও তুমি শুনেছ, বিচার করে দেখো। তারপর তোমার পিতৃদেবের কথা, চন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্য, রাজ্যশাসন পদ্ধতি দেখ, তার মাতৃকুল পিপ্পলি বনের ক্ষত্রিয় রাজবংশের গুণ গরীমার কথা, সেই বংশীয়া তোমার পিতামহী দেবীর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিচয়-কথাও শুনেছ, এবার তোমার নিজ জননীদেবী এবং বৎস রাজবংশের কথা স্মরণ করো, মিলিয়ে দেখ তার

শুভফলে তোমার মত গুণবানের উদ্ভবের কারণ কিনা? এই ভাবে বিবাহের ফলাফল সর্ব্বক্ষেত্রেই বিচার করে দেখো; যদি এ সত্যের ব্যতিক্রম কোথাও পাও তা হলে আমি স্বীকার করবো শাস্ত্রবিধির নিষ্ফলতা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়তা। আমার উপদেশ প্রত্যাহার করবো তখনই।

বিন্দু অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, কতক্ষণ পর বলিল,—আমায় একটু ভাবতে দিন তাতঃ, যদিও আপনার যুক্তি গ্রহণ করলাম, প্রবল সত্য এবং সিদ্ধান্ত বোলেই স্বীকার করলাম, কিন্তু মনস্থির করতে আমায় অবসর দিন। কিন্তু…এর পরে আবার কিন্তু কেন? আর্য্য মহামাত্য জিজ্ঞাসু নেত্রে বিন্দুর দিকে চাহিলেন। বিন্দু বলিল,—আমি শুনেছি বিদীশা রাজকুমারী বিকৃতাক্ষ। মহামাত্য হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যা কথা, শত্রুপক্ষের প্রচার। আমি তোমায় প্রমাণ দিব, ঐ কথা সত্য নয়। রাজকুমারীর সুলক্ষণাক্রান্ত চক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

* * * *

মহামাত্যের নিকট হইতে ফিরিয়া যখন অদ্রী ও বিক্রম বাড়ীতে আসিল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। উভয়েই যখন স্নানাদির পর সান্ধ্যকৃত্য শেষ করিয়া ভোজনে বসিল তখন অদ্রীকে একটু গম্ভীর দেখিয়া বিক্রম বলিল,— দেখ অদ্রী! তোমার গাম্ভীর্য্য আমার উদ্বেগের কারণ, কি জানি কি ভাবছো, জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না।

হাসিয়া অদ্রী বলিল, কাল প্রাতে রাজদর্শন, এ দর্শনটা আবার কি রকম হবে তাই ভাবছি। এটা নগর প্রদক্ষিণের মত দূর হইতে দর্শন নয়, এ একেবারে রাজনৈকট্য, রাজসঙ্গ লাভ যাকে বলে তাই,—এত নিকট, যেমন তুমি আমি রয়েছি। ভাবনার কথা নয়,—কি বল? বিক্রম বলিল,—এর জন্য ভাবনা কেন বন্ধু? অদ্রী বলিল,—আছে বৈকি কিছু ভাববার কথা, তুমিও একটু ভাববে বৈকি, হয়তো একটু বিলম্বেই,—বিছানায় শুয়েই আসতো সে ভাবনাটা।

বিক্রম—কেন, কেন? তাতে ভাবনা কেন, তুমি বলবে আমায়?

অদ্রী—এ দর্শনটী ঘটাচ্ছেন স্বয়ং মহামাত্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য, কার সঙ্গে? না ভারত-সম্রাট, রাজ-রাজচক্রবর্ত্তী, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান, মৌর্য্যকুল-শিরোমণি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে, এ দেখা কি ভাব্‌নার কথা নয় বিক্রম?

বিক্রম—ওঃ এতক্ষণে বুঝেছি অদ্রী। সত্যিই ভাবনার কথা বটে তো। আর্য্য মহামাত্য এই মিলন ঘটিয়ে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন বল তো?

অদ্রী—তাই যদি বলতে পারব তাহলে আমি অদ্রীহরি বর্ম্মন কেন আর তিনিইবা চাণক্য বিষ্ণু শর্ম্মণ কেন? তবে একটা কিছু আছে যা বিশেষতঃ তোমার সঙ্গেই তার সম্বন্ধ, এ আয়োজনটা তোমাকে নিয়েই এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বিক্রম—তাহলেও তোমার সঙ্গেও কিছু সম্বন্ধ আছে বৈকি। আর্য্য মহামাত্য নিশ্চয়ই একের জন্য দুইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটাতে যাচ্ছেন না। আরও কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার পর বিক্রম আবার বলিল, এই একটা ভাবনা আমায় ঢুকিয়ে দিলে, বেশ স্ফূর্ত্তিতেই ছিলাম, অদ্রীহরি বর্ম্মন!

অদ্রী—তোমার বিশেষত্ব এই যে, যখনই একটা আনন্দের কিছু ঘটে তাতে তুমি এতটাই আবিষ্টচিত্ত হয়ে যাও যে, ভূত ভবিষ্যৎ-এর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই থাকে না তোমার।

বিক্রম—আচ্ছা ভাই, সত্যি বল ভূত ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে বর্ত্তমানের আনন্দকে ভোগ করা যায় কি? না, করতে প্রাণ চায়? যেমন ধর আমরা রাজদ্রোহের অপরাধী হয়ে আসার পর থেকে সত্যই কোন আনন্দ বা সুখ পূর্ণ-রূপে উপভোগ করতে পেরেছি, যদিও দেখতে শুনতে সাধারণ উপভোগ্য যা কিছু বাকি'ও রাখিনি। তারপর এখন আর্য্য মহামাত্যের কাছ থেকে ফিরে যে আনন্দময় একটা মুক্ত অবস্থা পেয়েছি তাতে এখন থেকে বলতে পারি সব কিছুই পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছি, এমনই সময় আজ তুমি কি না—

তাহাদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াই আসিয়াছিল। এখন বিক্রমকে গম্ভীর দেখিয়া অদ্রী বলিল,—তাইত বিক্রম তোমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখছি যে। বেশ স্ফূর্ত্তিতে ছিলে, নয় কি?

বিক্রম বলিল, সত্য অদ্রী, যতটা আনন্দের ব্যাপার মনে করেছিলাম ততটা নয়, নিশ্চয়ই আছে এর মধ্যে কিছু। আচ্ছা বলো,—তোমার কি মনে হয়? ভেবে দেখেছ সে কিছুটা কি হতে পারে? এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই একটা কিছু ভেবেছ, নয়?

—তা হয়ত ভেবেছি, কিছু ভাবিনি বল্লে মিথ্যা বলা হয়। শুনিয়া বিক্রম ধরিয়া বসিল, সেটা কি বলতে হবে।

—সেটা মূলতঃ তোমায় কোন একটা দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত করবার বিষয়েই। সেই প্রস্তাবটা মহারাজের মুখ থেকেই করাতে চান। যেহেতু,

এটাতো জানো, তোমার পিতা মহারাজ শত্রুজিৎ কোশল, বীরভদ্র কৌন্দকের হাত দিয়ে তোমার শাসনভার মহারাজের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

—তা প্রতিষ্ঠান রাজ ঠিকই করেছেন, এখন আবার অদৃষ্টে কি আছে তা জানি না।

—আমার ভয় কেবল এইটুকু যে, তিনি যে সব প্রস্তাব করবেন একটা না হলে আর একটি, এভাবে সবগুলিই যদি তুমি প্রত্যাখ্যান কর তাতে বিরক্তির কারণ হবে, ক্রোধ হয়ত তোমার প্রতি হবে না—

—আর্য্য মহামাত্য নিজেই তো বেশ শোভন ভাবেই যা আমার পক্ষে কল্যাণকর, এমন কিছু একটা প্রস্তাব করলেই পারতেন। কেন যে তিনি একেবারেই চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন তাইত ভাবনার কথা। অদ্রী বলিল,—এতেও একটা বড় উদ্দেশ্য আছে, তা আমি নিশ্চিৎ বুঝতে পাচ্ছি।

—দোহাই অদ্রী। খুলে বলো, তোমার মনের কথাটি। আমার মনে হচ্ছে আসলে তোমার চিন্তার চরম আবিষ্কারটা আমায় এখনও খুলে বলনি। ঠিক কিনা বলো?

—বললে কি ফল হবে তাই ভাবছি, অদ্রী বলিল,—সে তো একটি আন্দাজ, বন্ধু? বিক্রম বলিল—তোমার আন্দাজ যা কিছু, তা ভবিষ্যতে বরাবরই আমার পক্ষে সকল ব্যাপারেই সত্য প্রমাণিত এবং ফলপ্রসূ হয়েছে। দোহাই অদ্রী বলে ফেল, আর আমি উদ্বেগ ভোগ করিতে পারি না, এ যেন আবার একটি নতুন অপরাধের বিচারফলের অপেক্ষায় থাকা।

—সেদিন ঐ রাজদর্শনের ভীড়ের মধ্যেই একটি খবর গুজবের মতই শুনেছি; বিন্দুসার তক্ষশীলাপ্রান্ত শাসন ভার নিয়ে যাবেন।

বিক্রম বলিল,—একথা বিশ্বাস করো?

অদ্রী প্রতিবাদের স্বরেই বলিল,—কেন, অবিশ্বাসের কি আছে? বিক্রম বলিল,—ঐ অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, বিশেষ ঐ সীমান্তে?

অদ্রী বলিল—ভগবান না করুন, আজ যদি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বৈকুণ্ঠে যান, তাহলে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন করবে কে?

বিক্রম বলিল—সে ধরো আর্য্য মহামাত্য আছেন, এখন আবার কাত্যায়নও এসেছেন, তার পর মহাবলাধিকৃত আছেন,—তাঁরা তো নিশ্চয়ই থাকবেন বিন্দুসারের শাসন-কর্ত্তৃত্বের পিছনে।

অদ্রী বলিল,—তবে, তাঁরা যদি তখন থাকেন তবে এখনই বা বিন্দুসারের

পিছনে নেই কেন বন্ধু? যুবরাজের ভবিষ্যত সাম্রাজ্য শাসনের সৌকর্য্য ও উপযুক্ত শিক্ষার জন্য বুঝে দেখো,—তার তক্ষশীলা-প্রান্তে যাওয়া কিছু অসম্ভব কি?

—এখন আমার মনে হচ্ছে তা হতে পারে বটে, কিন্তু বিন্দুসার যাবেন, তার সঙ্গে তোমার আমার সম্বন্ধ কি? অদ্রী বলিল,—তুমি তো এখন কোশলে ফিরে যেতে চাওনা? বিক্রম—না, নিশ্চয়ই না, সে কথা তো আজ মহামাত্যকে জানিয়েই এসেছি।

অদ্রী বলিল—তক্ষশীলায় মহারাজকুমারের, অর্থাৎ ভবিষ্যত সম্রাটের সহচর হয়ে ঐরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রান্তে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই সুখের এবং শিক্ষার বিষয় হতে পারে না কি?

—অদ্রী, ধন্য তুমি, সত্যি, এতটা তুমি ভাবতে পেরেছ?

—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বন্ধু। আজ, এই যে যুবরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়া তার মধ্যেও ঐ উদ্দেশ্য নেই, একথা বলা যায় না। যাক্ ছেড়ে দাও ওসব কথা আমার,—ঐ তুচ্ছ একটি কথা, ভীড়ের মধ্যে পাঁচজনের মুখে, ওটা বাজে কথা হতে পারে।

বিক্রম বলিল,—এখন আর ওসব কথা শুনবো না তোমার। আশ্চর্য্য লাগে অদ্রী তোমার কল্পনানুসারি বুদ্ধির প্রসার দেখে।

একটি গুজব শুনে, তার উপর ভবিষ্যৎ জীবনের একটি কর্ম্মধারা দাঁড় করানো ঠিক মনে হয় যেমন আকাশের ওপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা। কিন্তু যতই উপেক্ষা করিনা কেন, এটা আমি এখন কোন রকমেই উড়িয়ে দিতে পারি না, বন্ধু, তোমার মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে।

অদ্রী বলিল, এখন আর ও কথা নিয়ে জল্পনা কল্পনায় কাজ নেই, কাল প্রভাতেই তো রাজদর্শন ঘটবে, সেখানেই সব ঠিক হযে যাবে,—বলিয়া দুই বন্ধু প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিল।

সতেরো
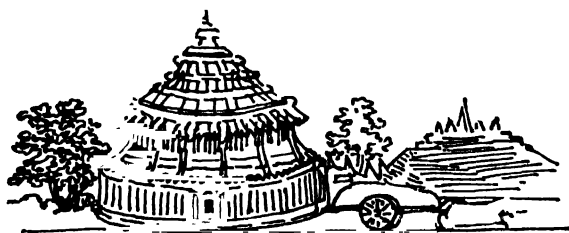
পরদিন প্রভাতে অদ্রী ও কুমারকে লইয়া যাইতে রাজপুরী হইতে বার্তাবহ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জানাইল, মহারাজ সভারোহণের পূর্ব্বেই তাঁহাদের সহিত সঙ্গোপনে আলাপ করিবেন; সুতরাং অবিলম্বেই যাওয়া প্রয়োজন। তাহারা উভয়েই প্রস্তুত ছিল। অবিলম্বেই যাত্রা করিল।

অদ্রী ও কুমার মহারাজকে নগর প্রদক্ষিণে দেখিয়াছিল, অবশ্য অদ্রী পূর্ব্বেও দুই একবার দেখিয়াছিল। এ যেন সে লোক নয়। মহারাজের সহিত প্রথম সম্ভাষণেই উভয়েই অবাক হইল। অদ্রী এই জন্য অবাক হইল, মহারাজ যেন তাহার কতকালের পরিচিত অতীব নিকট বন্ধু। আর কুমার অবাক হইল এই ভাবিয়া যে, এই কি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী আদি মৌর্য্যকুল প্রতিষ্ঠাতা? রাজোচিত, এমন কি আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র নাই। বিন্দুসার, যাহাকে কাল মহামাত্যের আশ্রমে দেখিয়াছিল তাহার যে গাম্ভীর্য্য, মহারাজের তাহাও নাই,—অস্বাভাবিক চঞ্চল প্রকৃতি। অল্পক্ষণ বসিয়া কথা কহিতে কহিতে গলার মুক্তা-মালাটি একবার হাতে জড়াইতে ও খুলিতে লাগিলেন, তারপর হঠাৎ খুঁটিতে খুঁটিতে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তখন দৌবারিক উপস্থিত ছিল, সে তাড়াতাড়ি পতিত মুক্তা কয়টি সংগ্রহ করিল এবং পরিত্যক্ত মালাটি লইয়া রত্নাধ্যক্ষের কাছে পাঠাইয়া দিল। অল্পক্ষণেই অন্য একটি রত্নহার আসিয়া পৌছিল।

মহারাজ কিঞ্চিৎমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ঈষৎ হাস্যে, অদ্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—আমার এ রকম হয়। দৃঢ় গ্রন্থি দিয়ে গাঁথতে এখানকার কারুকারেরা ভাল জানে না। মনে কর, এমন না হলে অত সহজে ছিঁড়ে যায়?

পশ্চাতে গজদন্ত নির্ম্মিত কাঁকুই হাতে সেবক একজন দাঁড়াইয়া অবিরাম তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—একটু জোরে চালাও। সেই তীক্ষ্ণদন্ত কাঁকুই যতক্ষণ না দৃঢ়ভাবে গভীর কেশমূল পর্য্যন্ত চাপিয়া চলিতে লাগিল ততক্ষণ শান্তি হইল না। শেষে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিক্রম! তুমি এখন কি করতে চাও? বিক্রম বলিল,—আমার একমাত্র কামনা, কিছু দিন রাজগুরু মহামাত্যদেবের আশ্রয়ে রাজনীতি শিখতে চাই। যদি মহারাজের আজ্ঞা—

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন,—তিনি তোমার উদ্দেশ্য যে ঠিক বুঝবেন সন্দেহ নেই, তবে, তাঁর বিধান যে তোমার মনোমত হবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এতদিন তাঁর সঙ্গ করে যদি কিছুটা না বুঝে থাকি তাহলে কি আর বলবো,—শোনো বিক্রম, তাহলে যেন আমার সব কর্ম্মই বৃথা হয়ে যায়। তিনি উত্তম বৈদ্য বটে কিন্তু তাঁর ঔষধটা প্রবল তিক্ত, কখনও সুমিষ্ট অথবা স্বাদু নয়।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। মহারাজ বলিলেন,—ঠিক তা নয়, তিনি মোটেই তা বলবেন না। যখন আমি পঞ্চনদে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলাম, আর তো যুদ্ধ বিগ্রহ রইলো না, শান্তিতে রাজনীতি চর্চ্চা করা যাবে এই ভেবে আমি ঐ সময় প্রস্তাবটি করেছিলাম। তাতে উত্তরে তিনি বললেন,—অধ্যপকের কাছে সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্রাদি পাঠ গ্রহণ এবং অধ্যয়নের মতো বিষয় এই রাজনীতি নয়। গুরুতর দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেই ওটা শিখতে হয়। সেই অবধি আমি তাই শিখছি। শুনিয়া বিক্রম বলিল,—তাতে তো ভুল ভ্রান্তি বা অনিষ্ট ঘটবার নিশ্চিৎ সম্ভাবনা থাকে বা থাকতে পারে মহারাজ! মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—তাতো থাকবেই,—তা আচার্য্যও স্বীকার করেন,—তিনি বলেন, ঐ ভুল ভ্রান্তিই ভবিষ্যতে তোমায় নির্ভুল সিদ্ধান্তের পথ দেখাবে, নিঃসংশয় হতে সহায়তা করবে।

বিক্রম অবাক হইয়া গেল,—বড় ভয়ঙ্কর দায়িত্ব কিন্তু এটা। বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন,—ঐ দায়িত্বের গুরুভার যে প্রথম থেকে কাঁধে নিতে চায় না, মহামাত্য বলেন, তার পক্ষে ভোগ বিলাসে মজিয়া নৃত্যগীত নটনটী সঙ্গই ভালো,—অথবা কাব্য শাস্ত্রাদি আলোচনা বা সঙ্গীত, এই সব নিয়ে কাল কাটানোই তার কর্ম্ম,—রাজ্য শাসন বা রাজ্য রক্ষা তার কাজ নয়।

এর পর আর কথা চলে না, প্রভু! বুঝে দেখুন,—

. চন্দ্রগুপ্ত একটু চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক দেখিলেন,—কি যেন খুঁজিতেছেন তারপর আবার একটু স্থির হইয়া বিক্রমের পানে চাহিয়া বলিলেন,—তোমাদের কাছে আমার কোন সঙ্কোচই নেই,—আমি এখন নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, আমি বড় কম কষ্ট পাইনি তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখতে। সহজেই তো আমি কারো কথা মেনে নিতে পারি না,—কিন্তু ঐ একটি মানুষ, এ পর্য্যন্ত তাঁর কাছে একটা তর্কে নিজ পক্ষ ঠিক রাখতে পারলাম না। শেষ

পর্য্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক মানতেই হয়েছে। এই বলিয়া মহারাজ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘরখানি নিস্তব্ধ, টুঁ শব্দ নাই, কারো মুখেই কথা নাই। দুই বন্ধু মহা চিন্তিত অবস্থায় প্রতিক্ষণ কাটাইতে লাগিল।

আবার মহারাজ আরম্ভ করিলেন,—উলঙ্গ সত্যকে একেবারেই স্পষ্ট একটি কথায় খুলে দেখিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই। আমায় সোজা বলে দিলেন তুমি রাজ্য অধিকার অথবা রক্ষাই করতে পারো,—রাজ্য শাসন, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চালানো তোমার কর্ম্ম নয়,—সে কর্ম্মে দক্ষ হবে তোমার বংশধর দ্বিতীয় পুরুষ, আরও ভালো হবে তৃতীয় পুরুষ।

উভয়েই চমৎকৃত হইল, কারো মুখেই কথা নাই।

এবারে মহারাজ আরও একটি চমৎকার ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়া উভয় যুবককে একেবারে আনন্দপূর্ণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্ত পুরানো দিনের কথা স্মরণ করিয়া প্রফুল্লভাবেই বলিলেন,—তখন আমি পলাতক, প্রবাসী, পাঞ্জাবে তক্ষশীলায় গিয়েছি,—জানা শোনা কারো সঙ্গে তো ছিল না, —তখন এলেকসাণ্ডারও তক্ষশীলায়। রাজা, রাজধানী বাঁচাতে পায়ে ধরে যবনকে ঘরে এনে সব কিছু রসদ যোগাচ্ছেন, প্রজাদের মাথায় বজ্রাঘাত, তাদের উপরই খুব পীড়ন চলেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ যারা, সভা করে দেশের দুর্গতির কথা আলোচনা ক'রচেন। বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্যকে প্রথমে ঐ সভায় দেখলাম। উনি চেষ্টায় ছিলেন রাজাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে—যখন কোন ক্রমেই তা হোলো না তখনই তক্ষশীলা ত্যাগ করে যাবেন একথা জানিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ হ'ল, ওঁর একটা কথায়। উনি ঐ সভায় দাঁড়িয়ে শেষ কথা এই বললেন, যেদেশে রাজা দাসত্ব স্বীকার করে সেদেশে কৌটিল্যের দেশত্যাগ করা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নেই। ঐ কথাটি শুনেই আমি আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম।

বিক্রম এবং অর্দ্রী বিস্ময়ে উভয়েই নির্ব্বাক হইয়াই তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিল। মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—কুমার বিন্দুর বয়স যখন তিন বছর তখন থেকেই আচার্য্য গুরু তার শিক্ষার ভার নিয়েছেন, তার মধ্যে আমার কোন কথাই চলেনা। তবে তিনি কোন কোনও বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন আমার সঙ্গে, এই পর্য্যন্ত। এখন বিন্দুর বয়স আঠারো বছর উত্তীর্ণ হয়েছে কি হয়নি। তুমি যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে মিলে কোন বিষয়ে আলোচনা করেই দেখতে পারো। তার রাজনৈতিক বুদ্ধি যতটা তীক্ষ্ণ আমার এই বয়সে তা নেই।

মহারাজের সরলতায় দুই বন্ধু মুগ্ধ হইল, তাহারা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃতি এতটাই বালকসুলভ সরল ও চঞ্চল।

বিক্রম বিনীত সম্ভ্রমে অবনত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—এটা সম্ভব কি করে হলো মহারাজ? বড়ই অদ্ভুত লাগে ভাবতে। যদি অভয় দেন তো জানতে,—আগ্রহ হয়,—

মহারাজ চঞ্চল ভাবে আসন হইতে উঠিয়া একটি স্তম্ভের গায়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া দুই বন্ধু চমকিত হইল একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়,—মহারাজ কিন্তু তাহাদের দিকে লক্ষ্যই করিলেন না,—মুহূর্ত্তমাত্র বিক্রমের দিকে চাহিয়া,—তারপর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে তীব্র কণ্ঠে বলিলেন,—আঃ এর কারণ তো সহজ, এটা বুঝতে পারোনি? শিশুকাল থেকে কোন চাণক্য মহামাত্য আমার তো শিক্ষার ভার নেন নি। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—রাজপুত্র হলেও যে অবহেলার মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলাম তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবেনা। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ,—তারপর বলিলেন,—তবে এখন বুঝতে পারি, সেই অবহেলাই আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর হয়েছিল, আর্য্য মহামাত্যও তা বলেছিলেন।

মহারাজ চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন, হাত দুটি পশ্চাত-দিকে পরস্পর সংযুক্ত রহিল। তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া উভয়েই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

এখন অদ্রী বিনীত কণ্ঠে বলিল,—আর একটি কথা নিবেদন করিতে চাই।

বল অদ্রী, নিঃসঙ্কোচে বল, আচার্য্য বলেন—ভনিতা করে বলতে গেলে একটি ধোঁকার সৃষ্টি, আর কাল নষ্ট হয়।

অদ্রী বলিল,—আর্য্য মহামাত্যের কাছেই শুনেছি আপনার চরিত্র এবং শিক্ষার মূলে,—শক্তিশালী মনের গঠনের পিছনে এমনি এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আর্য্য চাণক্যের তুলনায় কিছু কম নন। তিনি সম্রাট-জননী দেবী মুরা।

শুনিবা মাত্র মহারাজ দ্রুতপদে আসিয়া আপন আসনে বসিলেন। বলিলেন,—সত্য, সত্য, অতি সত্য, আমার মানসিক গঠনের মূলেই ঐ জননী, এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই। তাঁর বুদ্ধি এবং মনঃশক্তিই আমাকে আজ এই অবস্থায় এনেছে। শুধুই তা নয়, বৃদ্ধ মহারাজের শেষ বয়সের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন তিনি। তাঁরই বুদ্ধির ফলে শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর দুর্ব্বৃত্ত সন্তানেরা,

বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ বলানন্দ নানাবিধ চক্রান্ত করেও তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। যাক—যাক্ সে কথা এখন, তোমার কথা তো বলো, কি করতে চাও তুমি এখন ? বিক্রম সসম্ভ্রমে বলিল,—আপনিই আজ্ঞা করুন মহারাজ। শুনিয়া মহারাজ বলিলেন,—যদি বলি তুমি প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাও ?

বিক্রম বিনীত কণ্ঠে বলিল,—ক্ষমা করুন, মহারাজ। এতাবৎ যে সকল চিন্তা, বাল্যাবধি যে সকল কর্ম্ম সেখানে করেছি, তাতে এখন প্রতিষ্ঠান বিষতুল্য আমার পক্ষে। মহারাজ মৃদু হাস্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসু ভাবেই বলিলেন,—তাহলে রাজ প্রতিনিধি হয়েই না হয় কোন প্রদেশে গমন করো।

বিক্রম বলিল,—ওটাও আমার পক্ষে বিষম হবে। মহারাজ বলিলেন,—কেন ? বিক্রম বলিল,—প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গুরুতর কর্ম্ম, আমার সে সকল জানা নাই। কারণ আমার শিক্ষা হয়নি। শাসন অর্থে আগে দণ্ড বিধানই বুঝতাম, এখন দেখছি, শাসন বলতে এমনই একটি গুরুতর বিষয় যা আমার কল্পনারও অতীত। কত জ্ঞান, গুণ এবং বিচার-শক্তির অধিকারী হলে তবে শাসনে দক্ষ হওয়া যায় তা সম্যক না বুঝলেও এখন কতকটা বুঝেছি।

মহারাজ বলিলেন,—সেটাও ভালো। বিক্রম বলিল,—এখন বুঝেছি, আর মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝেছি যে, বুদ্ধির স্থৈর্য্য যার নাই, কাকেও শাসন করবার বা দণ্ড দেবার অধিকারও তার নাই। তাই আমি, এখন কিছুদিন স্থির চিত্তে রাজনীতি-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে চাই প্রভু! মহারাজ বলিলেন,—আচ্ছা এই শেষ একটি প্রস্তাব করচি ভেবে দেখ তারপরে উচিত উত্তর দাও। আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যুবরাজ বিন্দুসার দূরস্থ তক্ষশীলা, গান্ধার সীমান্তে যাবে প্রথম রাষ্ট্র পালন আর প্রজাপ্রধানদের নিকট পরিচিত হতে। সেই সঙ্গে রাজকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণও করবে। তোমরা উভয়েই যদি তার উপদেষ্টা ও সহচর রূপে সঙ্গে থাক, তাহলে কেমন হয় ? সময় মত তাকে তোমাদের বিদ্যা, তোমাদের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু শিক্ষা দেবে। তোমাদের সঙ্গে থাকাটাই তার পক্ষে কল্যাণকর হবে মনে করি।

—এ সম্বন্ধে আর্য্যগুরু মহামাত্যের মতামত জানা প্রয়োজন, নয় কি ? অদ্রী এই কথা বলিয়াই বিক্রমের মুখের দিকে চাহিল। শুনিবামাত্রই মহারাজ বলিলেন,—এ সম্বন্ধে আগেই তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়ে গিয়েছে; এই শেষ প্রস্তাবটি তাঁর অনুমোদিত জেনেই তোমাদের বলেছি। তিনি চান এই কয়টির মধ্যে যে কোনও একটি তুমি গ্রহণ কর, তাতেই তোমাদের উভয়েরই ইষ্ট

লাভ হবে। প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহারাজ শত্রুজিৎ কোশল আমাদের কতটা প্রিয় সুহৃৎ এবং ঘনিষ্ঠ মিত্র, তুমি তা জানতে না, জানতে চাওনি, এখন সেটা বুঝে নিতে হবে। যাই হোক এখন ভেবে দেখ, আমার বোধ হয় শেষ প্রস্তাবটি তোমার রুচিকর হবে।

কুমার বলিল,—তাই হোক, এ সম্বন্ধে আমরাও স্থির করেছি, মহারাজের এই শেষ আজ্ঞাই আমাদের জীবনে আশীর্ব্বাদ হয়ে কাজ করুক। দৃঢ়, অটুট থাকুক আমাদের মাতৃভূমির প্রতি, পালক সম্রাটের প্রতি আমাদের আনুগত্য।

মহারাজ তবুও বলিলেন,—সময় মত বিষয়টি দুজনে একটু ভেবে দেখো, এই আমার ইচ্ছা। এখন সভায় যাবার সময় হয়েছে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তো যেতে পারো; এখানকার রাজসভার কার্য্যক্রম আগে লক্ষ্য করেছিলে কি? অদ্রী বলিল,—সে সৌভাগ্য পূর্ব্বে হয়নি। মহারাজ বলিলেন,—তাহলে পিঙ্কড় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হও, তিনিই সন্নিধাতা। তোমাদের যথাযোগ্য স্থান ও আসনের ব্যবস্থা করে দেবেন।

সভার বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এখন অদ্রী ও কোশল রাজকুমার দুজনেই সিংহাসনের অতি নিকটেই মহামূল্য একটি সভাসদেরই আসনে স্থান পাইল। মহামন্ত্রী বা মহামাত্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যহ সভায় আসিতেন না। তবে রাজ-সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বেই তাঁহার একখানি আসন থাকিত। তাঁহার পার্শ্বেই অপর এক আসন, তথায় কাত্যায়ন উপস্থিত আছেন দেখা গেল। রাজ সিংহাসনের যে মঞ্চ তাহার দুই পার্শ্বেই সভ্যগণের বসিবার স্থান, খুব দূরে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ সকল আসন পূর্ণ হয় না। রাজসিংহাসনের দুই দিকেই কতকটা ফাঁক, তাঁহার ডানদিকে নানা বিভাগের অন্যান্য অমাত্যগণের আসন।

মহারাজের সভারোহণ পর্ব্বও কম চিত্তাকর্ষক নহে;—দুই বন্ধুর পক্ষে তাহার সার্থকতা, রাজদর্শন, যাহা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, তাহাপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। অদ্রী ও বিক্রম উভয়েই বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে উহার সবটুকুই উপভোগ করিল। প্রথমে তাহারা দেখিল,—একদল অপরূপ লাবণ্যবতী, সবাই সমবয়স্ক এবং দৈর্ঘ্যে, অর্থাৎ মাথায় তাহারা একই; পুষ্প এবং নানালঙ্কারে বিভূষিতাঙ্গী, যেন প্রত্যেকেই এক একটি কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক,—ধীরগতিচ্ছন্দে, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সারি সারি তোরণপথে প্রবেশ করিল। রাজপুর হইতে মহারাজ নিত্যই এই পথে সভায় আগমন করেন। তোরণ হইতে সভাতল পর্য্যন্ত প্রশস্ত এই পথটির শোভাও অতীব চিত্তাকর্ষক। দুই

পাশে রঞ্জিত কলস এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের কুম্ভ কারুখচিত অঙ্গ, মিশ্র ধাতব তৈজস এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন। এতদ্ব্যতীত পদ্ম ও নানাজাতীয় পুষ্পালঙ্কারে সমাচ্ছন্ন। এখন, পথের এই পার্শ্বে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সেই সুন্দরী চারিণীগণ দাঁড়াইল। এই শঙ্খধ্বনিই মহারাজের সভারোহণ কালের সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে, কোষমুক্ত, শানিত ফলক, তরবারি স্কন্ধে চন্দ্রগুপ্ত মহারাজের নারী শরীররক্ষী দুই সারিতে তোরণদ্বারে আগুয়ান দেখা গেল ;—পশ্চাতে রাজমূর্ত্তি।

এবার সভাতল হইতে অদূরে চারণ তিনজনকে দেখা গেল। তাহারাও ঐ রাজমূর্ত্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জলদ গম্ভীর স্বরে জয় ঘোষণা করিল ;— সভাস্থ সবার প্রাণেই এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভয়ের ভাব যেন যুগপৎ স্পর্শ করিয়া গেল ঐ ঘোষণ-শব্দতরঙ্গের গুণে। অপূর্ব্ব বেশ এই চারণগণের। পীতবর্ণ উজ্জল রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত দীর্ঘ শরীর ;—সুবর্ণ সূত্রে রচিত বিচিত্র কারুখচিত ঐ বস্ত্রের দুই প্রশস্ত প্রান্ত ;—উপর অঙ্গে অনুরূপ পীত উত্তরীয়—বিশাল বক্ষস্থল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ আবরিত করিয়া কটিদেশে বেষ্টিত এবং গ্রন্থিযুক্ত। তাহার অবশিষ্ট অংশ সম্মুখে জানু অবধি ঝুলিতেছে। মস্তকে পীতবর্ণের উষ্ণিষ,—প্রশস্ত ললাটে চন্দন চর্চ্চিত এবং মধ্যে রক্ত চন্দনের এক উর্দ্ধপুণ্ড্র। কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, তাহার মধ্যে উজ্জ্বল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রত্নবিন্দু। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-শোভিত প্রান্ত সুবর্ণ কবচ এবং নিম্নে কারুখচিত সুবর্ণ বলয়মণ্ডিত দীর্ঘ বাহুদ্বয় আগমনশীল মহারাজের পানে প্রসারিত করিয়া,—এখন, যেমনই জয়ধ্বনি উত্থিত হইল—সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ মূর্ত্তিসকল দাঁড়াইয়া যেন ঐদিকে ফিরিয়া মহারাজকে আবাহন করিতে অগ্রসর হইল। তখন প্রথম চারণ, বিচিত্র সুর, যন্ত্র ও বাদ্য-ভাণ্ডের তালে তালে আরম্ভ করিল :—

অশেষ বীর্য্যবান্, বিষ্ণুশক্তি সমুদ্ভূত, ক্ষত্রকুলতিলক, মহান গুণালঙ্কৃত নৃপমণি ;—সসাগরা ধরণীর মধ্যে মণি পুণ্য এই ভারতভূমির একচ্ছত্র সম্রাট, পরাক্রম মূর্ত্তি, উদ্যত দণ্ডধারী, বীরবিক্রম, দণ্ডধর।

সঙ্গে সঙ্গে—দ্বিতীয় চারণ আরম্ভ করিল :—যুদ্ধে অজেয়, যবনধ্বংসকারী, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম তেজ বিকীরণ-কারী, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পরম সৌগত, পরম ভট্টারক প্রিয়দর্শন, মৌর্য্য পুরন্দর।

এবার তৃতীয় চারণ,—অষ্টোত্তরশতশ্রী মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত, নিত্য নৈমিত্তিক রাজধর্ম্ম পালন এবং প্রজামণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধনকল্পে সভারোহণ আগুয়ান—

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ, চঞ্চল পাদক্ষেপে, সিংহাসন সম্মুখেই আসিয়া ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীবর কাত্যায়নের স্বস্তি-বাচন আশীর্ব্বাদাদি গ্রহণপুরঃসর নিজে সকলকে অভিবাদন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের বয়স এখন পঞ্চাশের উপর দুই বৎসর ঘেঁসিয়াছে কিন্তু দেখিলে মনে হয় চতুঃত্রিংশৎ বর্ষীয় যুবাপুরুষ। সভায় কে কে উপস্থিত আছেন বামে ও দক্ষিণে, প্রান্তস্থল পর্য্যন্ত, এমন কি স্তম্ভের নিচে প্রহরীগণ কি ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে সেটুকু পর্য্যন্ত শান্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে যেটুকু সময় লাগিল মহারাজকে সেইটুকু সময় মাত্র স্থির দেখা গেল। হঠাৎ লক্ষ্য পড়িল প্রান্তদেশে এক অপরিচিত মুখ, তৎক্ষণাৎ তর্জ্জনী সংকেতে প্রশাস্তৃকে উহা লক্ষ্য করিতে আদেশ দিলেন এবং সে তাহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া গেল,—যাহা হউক তিনি এখন সভার কার্য্যক্রমের প্রতি, অর্থাৎ মহামাত্য আজ সভায় কি প্রকার কার্য্যসূচীর নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা দেখিয়া লইলেন। কাত্যায়ন আসিয়া মহারাজকে উহা দেখাইয়া দিলেন।

একবার মহারাজ বামে একবার দক্ষিণে হেলিয়া বসিলেন। কখনও উপাধান অবলম্বনে সামনে ঝুঁকিয়া বসিলেন। আজিকার প্রথম কার্য্য, কলহনপুরের বিদ্রোহ নিরসন বিষয় রাজসভায় বিবৃতি। বিভাগীয় অধ্যক্ষ উঠিয়া কি কি সূত্রে বিদ্রোহ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বলিলেন। রাজদূতেরা কি ভাবে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মহামাত্যের গোচর করিয়াছিল, মহামাত্যের আজ্ঞাক্রমে প্রবীর বর্ম্মা কর্ম্মদায়িত্ব লইয়া দুইশত ধনু ও দুইশত শূলধারী শবর সৈন্য লইয়া সেখানে গিয়া দুইদিনে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করিয়াছেন, তাহারি প্রাথমিক বিবরণ গোচর করিলেন।

প্রবীর বর্ম্মার নাম উচ্চারণ মাত্রই মহারাজ একবার অদ্রীর পানে তাকাইলেন, তারপর কিছুদূরে যেখানে প্রবীর বর্ম্মা উপস্থিত আছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অদ্রীর সহিত প্রবীরের পারিবারিক সম্বন্ধ মহারাজের অজ্ঞাত নয়। যাহা হউক, এবার মহারাজ প্রবীর বর্ম্মাকে আদেশ করিলেন বিদ্রোহ দমনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে।

প্রবীর বর্ম্মা উঠিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কেমন করিয়া সেখানকার নগরপাল তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল, যে কয়টি দুষ্ট প্রজা এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল, তাহাদের দল শুদ্ধ ধরিতে কে কি ভাবে সাহায্য

করিয়াছিল সে সকল কথার বর্ণনা সংক্ষেপে শেষ করিলেন। শেষে বলিলেন,—মহামাত্য এই ঘটনাটি বিদ্রোহাভাবই বলেছেন, একে বিদ্রোহ বলা যায় না; কারণ, নগরপ্রধানের অগোচরেই একদল বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিল মাত্র।
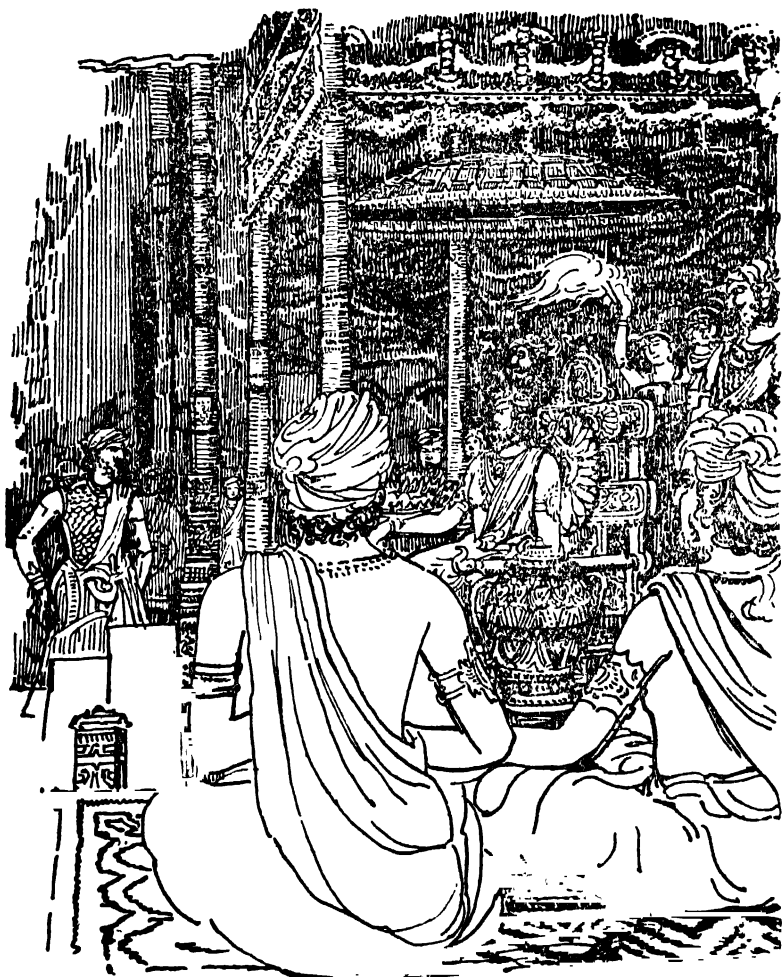
শুনিতে শুনিতে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কারণে সেখানে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র সম্ভব হয়েছিল সেইটাই শোনবার কথা যে, কেন তারাই বা এ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোয়েছিল?

প্রবীর বর্ম্মা বলিলেন,—কলহনপুর ক্ষেত্রে ধান ও গম প্রধান বস্তু এবং প্রতি

বৎসর প্রচুর উৎপন্ন হয়ে থাকে; উদ্বৃত্ত ফসল প্রতি বৎসর উত্তরে গুরু দামিল নামক ব্যবসায় কেন্দ্রে চালান যায়, আর তাতে কৃষকেরা এবং মধ্য ব্যবসায়িগণ প্রতি বৎসরই প্রচুর লাভবান হয়ে থাকে। গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর ফসল ভাল হয় নাই,—তথাপি রাজকর্ম্মচারিগণ পূর্ণভাবে রাজকর আদায় নিয়েছে, তারপর গত বৎসরও শস্য ভালরূপ হয় নাই, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখিয়াও স্থানীয় নবীন রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্ম্মিবৃন্দ জোর করেই পূর্ণহারে আদায় চেয়েছিল, প্রজা পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করে নাই। প্রজারা রাজধানীতে প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রামের প্রধানকে পাঠাইতে প্রস্তুত হয়েছিল। তাতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল,—এই সব কারণে তারা উত্যক্ত হয়েই প্রথমে খাজনা বন্ধ করেছিল।

মহারাজ বলিলেন,—তাতে বিদ্রোহ কেন?

প্রবীর বর্ম্মা ইহার উত্তরে কেবল বলিলেন,—আমি অতঃপর আর কারণ অনুসন্ধান করি নাই। মহারাজ তবুও প্রশ্ন করিলেন—কেন? প্রবীর বর্ম্মা বলিলেন,—উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্যের অভাবসত্ত্বেও রাজকর বলপূর্ব্বক আদায়ের চেষ্টাই বিদ্রোহের কারণ অনুমান করেছিলাম।

—স্থানীয় কর্ম্মচারীর উৎপীড়ন প্রধানের গোচর করলেই তো যথেষ্ট, তাতেই তো কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতো, তাতে বিদ্রোহ হবে কেন?

প্রবীর বর্ম্মা নিরুত্তর। মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আর সকলেই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে। কাত্যায়ন উঠিলেন,—মহারাজ! আর্য্য মহামাত্য এখনই আসিয়া সকল বিষয় সভার গোচর করবেন। বলিয়া, সিংহাসন পার্শ্বেই দণ্ডায়মান, বর্ম্মচর্ম্মাবৃত এক যুবার পানে চাহিবামাত্র সে সসম্ভ্রমে কাছে আসিয়া, পার্শ্বেই যে লেখনী, মস্যাধার ও ভূর্জ্জপত্র রক্ষিত ছিল, আনিয়া ধরিল। কাত্যায়ন তাহাতে লিখিলেন,—সভায় মহামাত্যের উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন; উহা লইয়া সে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে মহারাজ বলিলেন,—সংঘর্ষটা কি রকম হোলো,—সে বিবরণ গোচর করুন, আর্য্যরথী! লোকক্ষয় কিছু হয়েছে কিনা? আর্য্যরথী বলিলেন,—কেবলমাত্র দুইজন চক্রান্তকারীকে বন্ধনে আনা হয়েছে। মহামাত্যের ইহাই আদেশ ছিল। বিশেষ সংঘর্ষ কিছু হয় নাই, মহারাজ।

মহামাত্য আসিতেছেন; উর্দ্ধে উত্থিত দক্ষিণ বাহু তাহাতে বরদমুদ্রা,—তাঁহার সম্মুখেই মুক্ত তরবারি দুইজন দেহরক্ষী, পশ্চাতে সেই দৌবারিক। সভাস্থ

সকলে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল, মহারাজ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহামাত্য আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। সমস্ত সভাটি নিরীক্ষণ করিয়া মহামাত্য বলিলেন, —কলহনপুরের বিদ্রোহ। মহারাজ তটস্থ হইয়া অনুমোদনার্থে একবার মাথা নামাইয়া উঠাইলেন। মহামাত্য বলিলেন,—জয়মল্ল ও কুবের, এই দুইজন নন্দবংশীয় ভৃত্য বিদ্রোহের মূলে ছিল। ইহারাই প্রান্ত প্রধানের অগোচরে এবং তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের বুদ্ধি জাগিয়ে অনর্থ সৃষ্টির আয়োজন করেছিল। চর মুখেই সংবাদ পাওয়া যায়,—তারপর আর্য্যরথীর উপর কর্ম্মভার অর্পণ এবং তাঁরই চেষ্টায় অনায়াসেই ঐ সামান্য চাঞ্চল্যের মূলোচ্ছেদ হয়েছে। ঐ দুইজন অপরাধী এখন কারাগারে শৃঙ্খলিত; আগামী কাল প্রাড়বিবাক মধুসূদনের পীঠে তাদের বিচার। কলহনগড়ি বিদ্রোহাভাসের এই পর্য্যন্তই সকল কথা। এখন সভায় রাজকার্য্য যথাক্রমেই চলুক, মহারাজের অনুমতিক্রমে আমি বিদায় নিলাম। মহারাজ প্রসন্নবদনে অনুমোদন করিলেন।

আমাদের দুই বন্ধু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াই রহিল; তারপর মহারাজের অনুমতি লইয়া সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল; সভার কাজ যথা নিয়মেই চলিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে মহারাজ সিংহাসনের উপর কখনও পার্শ্বের উপাধানটির উপর কাত হইয়া, অল্পক্ষণের পর পা দুটি ছড়াইয়া দিলেন।

এসম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা আছে। তখনকার দিনে, বিশেষতঃ মল্লশরীর যাহাদের, গাত্রসংবাহনের আরাম তাহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিলাসের বিষয় ছিল। গাত্রসংবাহন সাধারণতঃ শুধু বিলাস নয়, এমন অনেকের পক্ষেই উহার প্রয়োজন গুরুতরই ছিল; উহা না হইলে রাত্রে নিদ্রা হইত না। সম্ভ্রান্ত বংশীয় যাঁরা তাঁদের সেই নেশাটি দুর্নিবার তো ছিলই, তখনকার অধিকাংশ সাধারণ গৃহস্থ ঘরের যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ,—সুস্থ নাগরিক জনগণের মধ্যেও উহা বিশেষ ভাবে প্রচলিত প্রথা, অবশ্য পালনীয় শরীর-ধর্ম্মের মতই দাঁড়াইয়াছিল। কুস্তি-গীর পালোয়ান, তখনকার দিনে সাধারণের মধ্যে অনেক দেখা যাইত। শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করিয়া, দণ্ড, বৈঠক এ তো প্রায় সকল ঘরের সর্ব্বস্তরেই চলিত। তাহার মধ্যে যাহারা অধিক শরীরচর্চ্চায় যত্নশীল তাহাদের কুস্তিই ছিল অতিশয় আনন্দের ব্যায়াম। এ সকল বিষয়ে বঞ্চিত যাহারা তাহারা দুর্ব্বল এবং রুগ্ন বলিয়া গণ্য এবং সমাজে অনুকম্পার পাত্র ছিল।

প্রাচীন মহাভারতের কাল হইতে যতদিন এই ভারতে হিন্দু প্রাধান্য বলবৎ ছিল বোধ হয় কোন রাজবংশের বংশধরেরাই মল্লগৌরবে বঞ্চিত ছিলেন না।

এক্ষেত্রে ইতিহাস প্রমাণেই জানা যায় যে, আমাদের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গাত্রসংবাহনে বিশেষ আনুরক্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার পবিত্র অঙ্গ অপর কেহ স্পর্শ করিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। সেই কারণেই, তাঁহার অঙ্গসংবাহন ক্রিয়ার জন্য এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহা দুইটি দৃঢ় স্থূল, ঘোরতর কষ্টবর্ণ আবলুসের দণ্ড, কোন পরিচারক দুই হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে লইয়া প্রধানতঃ পদদ্বয় হইতে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া সংবাহনের কাজ আরম্ভ করিত। ক্রমে জোরে জোরেই চালনা করিতে হইত। সুদৃঢ় শরীরে সময় সময় বেশ জোরে না চালাইলে তাঁহার আরাম হইত না। দুটি কাঠি দিয়া যেমন বড় বড় জয়ঢক্কা পিটিতে হয়, মহারাজের শরীরের উপর সেইরূপ জোরে জোরেই আঘাতটা চলিত। তাঁহার ঐ গাত্রসংবাহনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যখনই খুসী মহারাজ উহা চালাইতে আজ্ঞা করিতেন। সেই জন্য সংবাহক দুই জন সর্ব্বদাই আদেশ অপেক্ষায় নিকটেই থাকিত। সাধারণতঃ ঐ গাত্রসংবাহন ক্রিয়াটা শয়নের পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু মহারাজের প্রায় দিনমানেই উহার প্রয়োজন হইত ;—এমন কি রাজসভায়, মহামাত্য আর্য্য গুরু চাণক্য উপস্থিত না থাকিলেই মহারাজ উহা চালাইতেন। সমীহ করিতেন বলিয়া অথবা সঙ্কোচ বশতঃ সংযমে দৃঢ়মনা মহামাত্যের সম্মুখে এবং তাঁহার সহিত ব্যবহারকালে কেবল ক্ষান্ত থাকিতেন। সভায় বসিয়া বৈদেশিক কেহ তাঁহার গাত্রসংবাহন দেখিলে বিস্মিত হইতেন। ঐ সভারোহণের পরে ইচ্ছা হইলে কখন কখনও শিরস্থ উষ্ণিষ সংযুক্ত মুকুট খুলিয়া পার্শ্বেই রাখিতেন এবং কিঙ্করকে ঘন কেশমধ্যে কাঁকুই চালাইতে আদেশ করিতেন। উহা স্থূল কেশগুচ্ছের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া না টানিলে আরাম হইত না। সঙ্গে সঙ্গে পাদসংবাহনও চলিত, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে উপভোগের সঙ্গে মহারাজ, সভার কার্য্যক্রমও লক্ষ্য করিতেন। অপরের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন, নিজ বক্তব্যও বলিতেন। মন তাঁহার কার্য্যক্রমের উপর ঠিকই থাকিত। কোন ব্যতিক্রম হইলেই তাঁহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইত, জলদ গম্ভীর স্বরে সভাসদ বা অমাত্যকে চমকিত করিয়া,—ভবান! ঐ স্থানটা কি বর্ণনা করলেন একবার পুনরাবৃত্তি করলে বাধিত হবো, কিম্বা বিষদ বর্ণনা করুন তো একবার, বলিয়া সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া লইতেন। এই ভাবে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিত মহারাজের সভাকালীন কার্য্যক্রম।

আঠারো

অন্তঃপুরের দাসী এবং পরিচারিকারা সবাই বলে যে, যেদিন হইতে যবন রাজদুহিতা মগধের রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, মহারাণী বিন্দুভদ্রা এই অপরূপ সুন্দরীকে সেইদিন হইতেই নিজ অসাধারণ উদারতার প্রভাবে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ আমরা জানি, প্রথম হইতে মহারাণী বিন্দুভদ্রার সকল ব্যবহারই হেলেনের বিষবৎ লাগিত। যখন হেলেন মগধ সম্রাটের অন্তঃপুরে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন,— রাজ সংসারে একথা লইয়া অনেক কানাঘুষা চলিতে লাগিল। রাজপুরীর বাহিরে তাঁহার নূতন বাসগৃহ, তাহার মধ্যে তড়াগযুক্ত উদ্যানমধ্যে নূতন প্রাসাদোপম গৃহ প্রস্তুতের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া মহারাজকে ধরিয়া বসিলেন, —ভিন্ন দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কারে বর্দ্ধিত, সুতরাং বর্ত্তমান রাজ-অন্তঃপুরে তাঁহার বাস করিয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা জানাইলেন। ইহাতে মহিষী বিন্দুভদ্রাই আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, তড়াগ সংযুক্ত উদ্যান, নিভৃত প্রাসাদোপম বাসগৃহ মগধের রাজ-অন্তঃপুরেও পাওয়া যাইবে। ঐ সম্বন্ধে মহারাজের সহিত মহারাণীর কথাটি এইরূপ হইয়াছিল :—

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, হেলেন রাজ-অন্তঃপুরে এভাবে থাক্‌তে চায় না, মনোমত নূতন গৃহ, উদ্যানবেষ্টিত তড়াগ—তাহাতে তাদের দেশের বড় বড় রাজহংস-হংসী থাক্‌বে—এই সব প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছে। মহারাণী বলিলেন, ওসব মগধের রাজ-অন্তঃপুরেও অভাব হবে না,—রাজপ্রাসাদের বাহিরে কোন স্থানেই তাহার বাস করা চলিবে না। মহারাজ যেন কদাচ তাহার ঐভাবে রাজপুরী হইতে পৃথক থাকার সমর্থন না করেন। বিস্মিত মহারাজ ভাবিলেন, স্বপত্নি-ঈর্ষাই মহারাণীকে চালনা করিতেছে। বলিলেন, তোমার আপত্তি কেন বলতো মহারাণী? সতেজে বিন্দুভদ্রা বলিলেন, মহারাজ! তাহলে আমারও প্রশ্ন আছে। মহারাজ বলিলেন,—কি প্রশ্ন শুনিবার জন্য অধীর রয়েছি, দেবী!

মহারাণী ভদ্রা বলিলেন,—মহারাজ কি তাকে প্রিয়তম নটী, নর্ত্তকী বা গণিকার সম্মান দিতে চান?

উঃ—ভদ্রা! রাণী! এতটা ভেবেছ? আমি ভেবেছিলাম, ওরা যখন অনেকটাই ম্লেচ্ছাচারী, যদি রাজ-অন্তঃপুরের বাহিরে থাকে হয়ত তুমি নিজেই

তা সমর্থন শুধু নয়, তাই চাইবে,—এখন দেখছি তোমার ভিন্ন মত—তুমি তাকে আমাদের সঙ্গে রাখতেই চাও। রাজ মহিষী সগর্ব্বে কহিলেন,—নিশ্চয়ই, উনি কি রাজকুমারী নন? উনি যখন একজন বিশিষ্ট রাজকুমারী, রাজবধূর মর্য্যাদাই দিতে হবে নাকি? ওঁকে তৈরী করেই নিতে হবে। মহারাজ, এখন সে ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেলেনের নাম তিনিই দিয়াছিলেন বিভ্‌লা। হেলেনের প্রথম প্রথম মহারাণীকে মোটে ভাল লাগে নাই, তারপর তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, এবং তাহার প্রতি যথার্থ প্রীতির প্রমাণ পাইবার পর তবে শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজ-অন্তঃপুর, তাহার পরিবেশ বিশালতা, বহুতর রাজ সম্পর্কীয়া নারী আত্মীয় কুটুম্বিনীগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার অস্বস্তি লাগিত। তাহার উপর মহারাজের দুর্লভ দর্শন তাহাকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিত যাহা তাহাদের জাতীয় পারিবারিক ও সামাজিক নীতির বিপরীত; এক সমুদ্রের পার্থক্য। ক্রমে সে দেখিল তার প্রয়োজনীয় সবই সুন্দর, মহারাণীর নির্ব্বাচন মহামূল্য ব্যবহার্য্য, সঙ্গিনী সুনির্ব্বাচিত, এমন কি সকল পরিজন মধ্যে মহারাণী ভদ্রার তুল্য আপন আর কেহ নাই। একমাত্র ঐ মহা মনস্বিনীর দৃষ্টি তাহার সুখ স্বচ্ছন্দের উপর যেন সর্ব্বক্ষণ বিন্যস্ত। বিশেষতঃ মহারাজ চন্দ্র তাহাকে একদিন,—প্রাথমিক প্রীতি বন্ধন ও পরিচয়মূলক ঘনিষ্ঠতার পর বিশেষ গম্ভীর ভাবেই বলিয়াছিলেন,—মহারাণী ভদ্রার স্বভাব প্রকৃতির উপর একটু মনোযোগী হওয়া তোমার একটি কর্ত্তব্যের মধ্যে। তুমি তাঁহার কনিষ্ঠা অধিকার পাইয়াছ;—তাঁহাকে উত্তমরূপে চিনিতে এবং বুঝিতে পারিলেই রাজ-সংসারে তোমার জীবনে দুঃখ কখনও আসিবে না, কোনও অবস্থায় তোমার কোন প্রকার অশান্তি আসিবার সম্ভাবনাও থাকিবে না। কথাটা শুনিয়া হেলেন সকল দিক দিয়া মহারাণীর সকল কর্ম্ম লক্ষ্য, বিশেষ করিয়া গতিবিধি সকল নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্প দিনেই বুঝিলেন যে, কি গুণে রাজ-অন্তঃপুরের প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট;—কোন্‌ শক্তির প্রভাবে রাজ-সংসারে কোন অন্যায় হইতে পায় না;—রাজমাতা পর্য্যন্ত মহারাণীর প্রতি অনুরক্ত।

প্রতিদিন প্রাতে প্রথমে দুই রাণী তারপর অন্তঃপুরের সবাই রাজমাতা মুরা দেবীকে প্রণাম করিতে যাইবার নিয়ম ছিল। মহারাজও প্রত্যহ রাজ সভারোহণের পূর্ব্বে জননীকে প্রণাম করিয়া যাইতেন; কখন কখনও রাজমাতা স্বয়ং আসিয়া প্রণাম গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন। কাজেই, রাজ-অন্তঃপুরের ব্যবহার-

ক্রম অত্যন্ত দৃঢ় নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল নবাগতা হেলেনের অদ্ভুত লাগিত; তাহাদের দেশীয় রাজ সংসারে এ ধরণের নিয়ম ছিলনা, সেথায় ব্যক্তিগত প্রাধান্যই সার; কাজেই, ঐ সকল নিয়ম শৃঙ্খলা প্রাচ্য দেশেরই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া হেলেন ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ও পরে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়া গেল। কয়েক বৎসরের পর যখন হেলেনের কোন সন্তান হইল না মুরা দেবী দৈবজ্ঞের আশ্রয় লইলেন,—কিন্তু দৈবও বিমুখ। তখন হইতেই বিভ্‌ভলা ভদ্রা দেবীর একান্তই অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

বিন্দুসার যেমন ভাবে মহারাণী ভদ্রাকে মা বলিয়া ডাকে, তেমনি করিয়া যাহাতে তাহাকেও মাতৃ সম্বোধন করে, তাহার প্রতি হেলেন যাহাতে তাহার নিজ সন্তানের মতই ব্যবহার করিতে পারে, তাহার জন্য মহারাণীকে ধরিয়া বসিল।

ভদ্রা করিলেন কি? বিন্দুকে ডাকাইয়া এইটুকু বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন যে, যখন আমায় প্রণাম করিতে ও আশীর্ব্বাদ লইতে আসিবে তখন তোমার এই যবন মাতা বিভ্‌ভলা রাণীকেও প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইবে। ইনি তোমায় নিজ পুত্র মনে করেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করেন। সেই অবধি হেলেন নিয়মিত সময়ে ভদ্রার মহলে আপনিই উপস্থিত হইত বিন্দুর প্রণাম লইতে, ভদ্রার মত বিন্দুর শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিত। তাহাতেও অনেকটা তাহার সন্তান-ক্ষুধা মিটিত। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে হেলেন মগধ রাজ পরিবারের মধ্যে প্রায় সবারই স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল ঐ মহারাণী ভদ্রার জন্যই।

যে কারণেই হোক, মহারাণীর একমাত্র অপ্রিয় একজন ছিল এই বিশাল রাজ-সংসারে। যে কথা সবাই জানিত না, কেবল ঘনিষ্ঠ জন যারা তারাই জানিত;—ক্রমে হেলেনও জানিতে পারিল। তিনি অপর কেহ নহেন স্বয়ং মহামাত্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য দেব। মহারাণী বলিতেন,—ঐ আমার সতীনী, একমাত্র কাঁটা, যে মহারাজকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য ভ্রম-প্রসূত এই. ঈর্ষার কথা মহামাত্য আর্য্য চাণক্য দেব নিজেও খুব ভালই জানিতেন। এইভাবে একজনের কাছেই ঐ বিরাট মানুষটি একটু সংকুচিত ছিলেন।

প্রায় দুইটি বৎসর লাগিয়াছিল বিভ্‌ভলার এইখানকার ভাষা শিক্ষা করিতে। মহারাণী কর্ত্তৃক নিযুক্তা তরলা নাম্নী এক দক্ষা সহচরীই ছিল তাহার শিক্ষক। দুইটি বৎসরে ভাষা চমৎকার আয়ত্ত করায় সংস্কৃত শিক্ষায় তাহার গাঢ়

অভিনিবেশ দেখিয়া মহারাজ এবং মহারাণী অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে তাহার অনুরাগ ছিল। মেধাবী হেলেন শিক্ষিতা রাজকন্যা, তাহার গ্রীক সাহিত্যে অধিকার ছিল, তাই অতি সহজেই সংস্কৃত ভাষা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কথার মধ্যে তাহার একটা বিজাতীয় টান ছিল যাহা সবাই উপভোগ করিত। ইতিমধ্যে রামায়ণ শেষ হইয়া গিয়াছে মহাভারত চলিতেছে, এখন সভাপর্ব্ব পড়া হইতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

এখন আজ বৈকালে বিভ্ভলা, মহারাণীর সঙ্গে নিজ গৃহ মধ্যে তাঁহাকে লিয়ার যন্ত্র বাজাইয়া গান শুনাইতেছিল। এমন মধ্যে মধ্যে হইত, ভদ্রাদেবী মধ্যে মধ্যে তাহার নিজ দেশীয় যন্ত্র-সংযোগে গান শুনিতে আসিতেন, আজও আসিয়াছিলেন। গান যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমনই সময়ে দম্পা নামে মহারাজের নারী শরীররক্ষকের একজন আসিয়া প্রণাম করিয়া জানাইল, মহারাজ

আসিতেছেন। শুনিবামাত্র সখীগণ দ্রুত এদিক ওদিক পলায়ন করিল;—গান বন্ধ হইল, উভয়েই আসন হইতে উত্থিতা হইয়া, পায় পায় দ্বার পথে আসিয়া মহারাজকে আবাহন করিলেন। মহারাজ প্রফুল্ল ছিলেন, বলিলেন,—

বোধহয় অসময়ে এসে তোমাদের আনন্দে ব্যাঘাৎ করলেম?

কিন্তু মহারাজ আমাদের অশেষ পুণ্যে অধিকারী করলেন—বলিয়া উভয়েই প্রণাম করিলেন। দুজনকেই মহারাজ হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং স্বয়ং শয্যায় আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের উপবেশনের সঙ্কেৎ করিলেন। বেশীক্ষণ নয়, বেশ একটি প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল যদিও মহারাজ বিশেষ কোন কথা আরম্ভ করিলেন না এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণও কিছু বলিলেন না, রাজ-মুখের প্রসন্ন ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া মহারাণী এইটুকু অনুভব করিতেছিলেন যেন কিছু বিশেষ একটি বিষয় আছে যাহা সাধারণ নয় ;—এমনই সময়ে, বিন্দু আসিতেছেন এই বার্ত্তা লইয়া দ্বারিণী আসিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল বিন্দুসার আসিয়া প্রথমে জননী পরে বিমাতা, শেষে পিতাকে প্রণাম করিয়া অতীব উচ্ছ্বাসপূর্ণ গদগদ কণ্ঠে বলিল,—দেবী শুনেছেন, আমি তক্ষশীলা যাবো।

মহারাণী প্রথমে কথাটা ধরিতে পারেন নাই ; দ্বিতীয়বার শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—একথা কি সত্য মহারাজ? মহারাজ অধরোষ্ঠ একটু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—কেন, অবিশ্বাস্য কি আছে এর মধ্যে মহারাণী?

তখন মহারাণী বিন্দুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তুমি? তুমি যাবে তক্ষশীলায়,—কিজন্য বৎস, কিজন্য এবং কোন্ কাজে? অতটা দূর শুধুই ভ্রমণের জন্য তোমার যাওয়া সমর্থন করা যায় না। বলিয়া মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

উৎসাহদীপ্ত বিন্দু বলিল,—আমার শাসন-পাঠ প্রথম আরম্ভই হবে গান্ধার সীমান্তের তক্ষশীলা প্রান্ত থেকে,—জননী, আর্য্য পিতৃদেব অনুমোদন করেছেন।

শুনিয়া এবারে হেলেন বলিল,—তুমি এখনও বালক, তোমায় ঐ গুরুদায়িত্ব-পূর্ণ কাজে নিয়োগ, এটা যুক্তিসঙ্গত কি?

বিন্দুর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, ছোটরাণী ভাবাতিশয্যে তাহাকে বালক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, বিন্দুসারের পক্ষে ইহা অসহ্য হইলেও যুগপৎ অসাধারণ আত্মসম্ভ্রম এবং মনঃসংযম তাহাকে এক্ষেত্রে স্থির থাকিতে সাহায্য করিল, কোন কথা সে বলিল না, হেলেনের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করিল না ; সে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

এইবার বুঝলাম মহারাজ কেন আগেই এখানে এসেছেন,—এবার মহারাণী বলিলেন,—মহারাজ! আমি জননীর অধিকার নিয়েই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করছি। এ বিধান কার, জানতে পারি?

চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—শোনো মহারাণী, স্নেহান্ধ জননীর প্রতিবাদের অধিকার নেই, তুমি তো জানো এ কার বিধান, কাজেই স্বীকার করে নিয়ে বিন্দুর অগ্রগতি-পথ মুক্ত করে দাও,—ওকে ছেড়ে দাও। মহারাণী ভদ্রার প্রতিবাদের প্রবল জেদ সহসাই সংযত হইল না, মহারাণী বলিলেন,—আমি যাবো তাঁর কাছে প্রতিবাদ জানাতে। মহারাজ বলিলেন,—তুমি যাবেনা তাঁর কাছে; না না, এ হবেনা, নিশ্চয়ই না, বলিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার বিভ্ভলা বলিল, তাহ'লে ডেকে পাঠানো হোক তাঁকে, আসুন তিনি,—আমরা জানাবো আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের অসন্তোষ। তাঁর অসঙ্গত বিধান প্রত্যাহার করুন তিনি।

মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই পাদচারণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে গুম্ফাগ্রে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিলেন; এটা উপেক্ষার ভাব মনে করিয়া মহারাণী আবার বলিলেন,—আমার বাক্য হয়তো মহারাজের কাছে অনর্থক কিন্তু আমি নিরস্ত হবো না। মহারাজ বলিলেন,—কিন্তু কেন? কিজন্য তাঁকে নিয়ে টানাটানি, এ আমি চাইনা, হবেও না।

আবার মহারাণী বলিলেন,—কেন, কেন দেবেনা তুমি আমায় আমার প্রাণের কথা তাঁর গোচরে আনতে। চন্দ্রগুপ্ত উপেক্ষার ভাবেই বলিলেন,—এ বিধান অনিবার্য্য বলে। শুনিয়া তবুও মহারাণী নিরস্ত হইলেন না, আবার বলিলেন,—কেন? তিনি কি বিধাতা? আমি তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই, এটা অনিবার্য্য কেন?

মহারাজ একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—সে কথাটা বিন্দুই তোমায় শুনিয়ে, জানিয়ে, আর দরকার মনে হলে বুঝিয়েও দিতে পারে। তার জন্য তোমায়—

বাধা দিয়া মহারাণী অবাক বিস্ময়ে মহারাজের পানে চাহিয়া বলিলেন,—বিন্দু?—এ্যাঁ, জানে সে এই গুরু বিধানের সকল কথা? তারপর বিস্ফারিত নয়নে বিন্দুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন বিন্দুর এ বিষয়ে জানার কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইতেছে না। তারপর মহারাজের দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ণ নয়নে বলিলেন, জানতে পারি কি বিন্দুকে কেন নির্ব্বাসিত করা হচ্ছে? মহারাজ নিরুত্তর, মুখে সেই বিজয়ীর কৌতুকপূর্ণ হাসি। মহারাণী এই অস্বস্তিকর অবস্থায় অসহ্য ব্যাকুলতায় অধীরা হইয়া বিন্দুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বিন্দু! আমার নয়নমণি, একমাত্র পুত্র, প্রাণাধিক, তুমি কি জানো, কোন্ যুক্তিতে তোমায় সাম্রাজ্যের শেষ গান্ধার প্রান্তে নির্ব্বাসিত করা হচ্ছে?

বিন্দুসার, জননীর কাতরতা এবং পিতার সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত অন্তরে দাঁড়াইয়া সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাহার স্থির চিত্তের নিম্নদৃষ্টি এমনই একটা সঙ্গত দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল যাহা মহারাজও লক্ষ্য করিয়া অন্তরে উপভোগ করিতেছিলেন। এবার তাহার কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত ; মহা উৎসাহে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কোমল কণ্ঠে তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া জননীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বিন্দু বলিল,—কেন এত কঠিন ভাষা জননী—দেবী, আর এতটা দুঃখইবা কেন ? এই উন্নত বিধানের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের প্রত্যেকের। তার পর, ঐ কথাটি আমায় ঐ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যপ্রান্তে যে কারণে যেতে হবে তা আমি জানবো না এ কেমন করে হতে পারে দেবী ? তক্ষশীলা বা গান্ধার প্রান্তের কথা এই যে, ঐ অঞ্চলের প্রজারা দুর্দ্ধর্ষ, অত্যন্ত বলবান আর অতুলনীয় রাজ অনুগত। সেই কারণে সাধারণ রাজ কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হবার নয়। —শাসন চলবে না। তাদের রাজভক্তি অতুলনীয় যদিও সাধারণতঃ তারা দুর্দ্ধর্ষ ;—কেউ তাদের বশীভূত করতে পারবেনা। তক্ষশীলা বা গান্ধার প্রান্ত শান্ত রাখতে পারেন মহারাজ স্বয়ং, তারপর পারি আমি।

বিস্মিত হেলেন বলিল,—তুমি ? এই বয়সে ?

বিন্দু সহজকণ্ঠে তখনই বলিল,—বয়সের কথা নয় দেবী! তাঁরা সাক্ষাৎ ভাবে তাদের মাথার উপরে তাদেরই স্বামীকে চায়। তাঁকে পেলেই তারা সন্তুষ্ট, সুখী থাকবে। মহারাজের অভাবে অন্ততঃপক্ষে তাঁর পুত্র তাঁর দ্বিতীয় সত্বা, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্বামী যুবরাজকে পেলেও তারা খুসী হবে। তারপর, আরও একটা কথা আছে—যখন পঞ্চনদকে যবন প্রভাবমুক্ত করেন তখনই মহারাজ, দেশবাসী—ওখানকার প্রধানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং তক্ষশীলা প্রান্তে এসে দীর্ঘকাল বাস করবেন। পাটলীপুত্রে এসে রাজধানীতে, এবং শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় সকল ব্যবস্থা উচিতমত সম্পন্ন হলে পর। আজ দীর্ঘকাল মধ্যে মাত্র তিনটি মাস পিতৃদেব ওখানে ছিলেন, এবার তারা অধৈর্য্য হয়েছে। তাই আমার যাওয়া প্রয়োজন। এই হল বর্ত্তমানে আমার গান্ধার প্রান্ত শাসনে তক্ষশীলায় যাবার মূলকথা। তারপর, আমার অত্যন্ত তীব্র ইচ্ছা তক্ষশীলায় গিয়ে প্রথমে রাজ্যশাসন পাঠ আরম্ভ করবো। সেই কথা গুরুদেবকে জানিয়েছিলাম, তিনিও প্রসন্নমনে আমার যাওয়াই স্থির করেছেন। অবশ্য প্রথমে আমায় অনেক রকমে নিরস্ত কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি প্রজারা নৃশংস অত্যাচারী মহারাজ ছাড়া তারা আর কাকেও মানবে

না বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সেখানে যেতে না পেলে আমি মর্ম্মে অত্যন্ত আঘাত পাব তখন প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিয়েছেন তিনি এবং সেই মত ব্যবস্থা ও আয়োজন হচ্ছে। আনন্দে চঞ্চল বিন্দুসার জননীর নিকটে গিয়া তাঁর একখানি হাত ধরিল, অতীব প্রীতিপরবশ হইয়া বিনয় অনুরোধপূর্ণ গদগদ স্বরে বলিল,—আমি অত্যন্ত খুসি হয়েছি মা ; আর্য্য চাণক্য আমায় যে সুযোগ দিলেন, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তাঁর সুযোগ্য অধিকারী হতে পারি, বলিয়া পদপ্রান্তে প্রণাম করিল।

তখন বিষণ্ণ মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—দিন স্থিরও হয়েছে যাত্রার? বোধ হয় তাঁর ব্যবস্থার ত্রুটি হয়নি আশা করি? বিন্দু বলিল,—আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন।

এমনই সময়ে দ্বার প্রান্তে দেখা গেল—এক পরিচারিকা দ্রুত আসিয়া একে একে মহারাজ, মহারাণী, রাণী ও যুবরাজ উপস্থিত সকলকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিল,—রাজমাতা আসিতেছেন। শুনিবামাত্র মহারাজ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, পশ্চাতে সকলেই দ্বারপথে আসিয়া মুরা দেবীকে নতশিরে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর আবাহন করিলে,—চন্দ্রগুপ্ত জননীর হাত হইতে যষ্টি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, বিন্দু অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল ; মুরা দেবী এক হস্তে বিন্দুর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া অপর হস্তে পুত্রের বাহু অবলম্বনে ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেলেন অগ্রে আসিয়া কোমল কার্পাস পূর্ণ বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত নাতি-উচ্চ আসনের নিকটে অপেক্ষায় রহিল,—নিকটে আসিয়া রাজমাতা তাহাতে উপবেশন করিলেন। একটু স্থির হইয়া মুরা দেবী বলেলেন,—চন্দ্র! বিন্দুর তক্ষশীলার যাবার কথা শুনছিলাম। শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কার কাছে শুনেছ জননী? জননী বলিলেন,—আর্য্য বিষ্ণুগুপ্ত যে এসেছিলেন আজ ঐ সম্বন্ধে আমায় জানাতে।

চন্দ্র—তিনি কি তোমার অনুমতি চাইতেই এসেছিলেন, দেবী?

মুরা,—যেমন ভাবে তিনি সব কাজই করে থাকেন, আগে নিজে স্থির সিদ্ধান্ত করে এসে অনুমতিটা আদায় করে নিয়ে যান ; এ বিষয়েও তাই-ই হোলো।

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—তা হলে কি তোমার এ বিষয়ে সম্মতি ছিল না, বলো মা?

মাতা বলিলেন,—তা তো সম্পূর্ণ ই ছিল,—কেবল আমি চেয়েছিলাম যুবরাজ বিন্দুসার বিবাহিত হয়ে যুবরাণীকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধার প্রান্ত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ

করতে শুভ যাত্রা করবে—বলিয়া বিন্দুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মুখে সেই কৌতুকের হাসি। বিন্দুর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, সে মাথাটি নত করিয়াই রহিল।

চন্দ্র বলিলেন,—জননী, একবার আমার কথাটা স্মরণ করো, আমার বিবাহ কত বয়সে হয়েছিল। তারপর বিন্দুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বিন্দু, এ সম্বন্ধে তোমার যা বলবার আছে বলতে পারো।

মূরা বলিলেন,—ওকে আর বলতে হবেনা, আমি জানি ওর কথা। এক বৎসর পরে ফিরে এসে বিবাহ করে রাণীকে নিয়ে আবার যাবে দীর্ঘকালের জন্য। কিন্তু আমার ভাগ্যে বিন্দুর বিবাহ দেখা নাও হতে পারে। সেই জন্যই এসেছিলাম, যদি ওর মত পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়। কিন্তু চন্দ্র! ও তোমার পুত্র, ভাবপ্রবণতা ওর কোষ্ঠীতে নেই; আমার উপর ওর এতটা স্নেহ নেই যে, আমার জন্য ও এক বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করবে—বলিয়া বিন্দুর মুখের দিকে দেখিলেন। সকলেই লক্ষ্য করিল বিন্দুর উৎসাহভরা দীপ্ত মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে। বেদনা পাইযা মূরা বিন্দুকে টানিযা বক্ষে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন,—এখন যাই, আর আমার কোনো কথাই নেই। তুমি ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজের জন্য জোর কোরোনা পিতার অধিকার নিয়ে। চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—সে যুগ চলে গিয়েছে মা, এখন চাণক্যের যুগ, এখন প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। বিশেষতঃ চাণক্যের প্রধান শিষ্য যে উনি,—প্রাচীন নীতি সব কিছু মুখ বুজে মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

মূরা দেবী বলিলেন,—আমি এখন যাই, আর কোন কথা নেই আমার,—বলিয়া উঠিলেন। সকলেই আবার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, মহারাজ ও বিন্দুকে দুই পার্শ্বে লইয়া দ্বারপথে আসিলে সেখানে কুসুম অপেক্ষা করিতেছিল। রাজমাতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুসুমকে অবলম্বন করিযা নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। যাবার সময় বিন্দুর কানে কানে কিছু বলিয়া গেলেন, তাহাতে বিন্দু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আবার সকলে ফিরিয়া আসিলে মহারাণী ভদ্রা করুণ নয়নে মহারাজের মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন, মহারাজের মুখেও আর সেই কৌতুকপূর্ণ হাসি নাই। ভদ্রা এবার বলিলেন,—আমারও আর কোন কথা নাই প্রভু, তারপর বিন্দুর হাত ধরিয়া মহারাজের সম্মুখে আসিযা প্রণাম করিলেন, বিন্দুও গরুড়াসনে বসিয়া নতশিরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই মহারাণী বিন্দুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মহারাজের মুখে আবার সেই হাসিটি ফুটিয়া উঠিল,—ঐ অদ্ভুত হাসির ভাবটি যথার্থ হাসি নয়, উহা অন্তরস্থ একটা বেদনার উপর আচ্ছাদন মাত্র।

এখন হেলেন কতকটা ব্যাকুল ভাবেই বলিলেন,—মহারাণী ব্যথা পেয়েছেন।

তুমিও তো পেয়েছ—বলিয়া মহারাজ পালঙ্কের উপর পা উঠাইয়া ভাল ভাবেই বসিলেন। হেলেন কহিলেন,—মহারাজ! যুবরাজের রক্ষক হয়ে কে যাবে, জানতে পারি কি?

মহারাজ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—কেন? তারপর বলিলেন,—সেনাপতি বরাহ গুহ যাবেন ঠিক হয়েছে। শুনিয়া হেলেন আবার বলিল,—পার্শ্বরক্ষক, শরীররক্ষক?

মহারাজ বলিলেন,—এখনও ঠিক হয়নি, আমি বলি যবন সৈন্যদল থেকে নির্ব্বাচিত চারিজন যবন যাক্—বাধা দিয়া হেলেন বলিয়া উঠিল—না চারজন লিচ্ছবী। মহারাজ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন,—কেন, যবন সৈন্য কি শক্তি বা বুদ্ধিতে কম? হেলেন বলিল,—কম নয়, তা ছাড়া তারা বিশ্বাসীও কম নয়,—তবুও আমি বিন্দুর জন্য লিচ্ছবী শরীররক্ষক ভাল মনে করি।

মহারাজের কৌতুকপূর্ণ চক্ষু তীক্ষ্ণভাবেই হেলেনের চক্ষুর উপর একটা আঘাত করিল, মুখে বলিলেন,—কেন? হেলেন বলিল,—প্রবাসে স্বদেশীয়, স্বজাতীয় পার্শ্ব সহচর অধিক প্রিয় নয় কি?

চন্দ্র,—যাই হোক্ এখন তোমায় যেটি বলতে চাই শুনে নাও। ত্রিতলের উপর মাত্র চারিটি দণ্ডের উপর চন্দ্রাতপ ঢাকা আমার শয়ন নির্ম্মিত হয়েছে, কাল সেইখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল রাত্র দেড় প্রহরের মধ্যে। কেমন? এখন বিদায় দাও। হেলেন বলিল,—আরও একটি বিষয়, মহারাজ বৈকালিক জলযোগ আজ আমার গৃহেই করবেন।

রাজার বদনে সম্মতির লক্ষণ দেখিয়া হেলেন ডাকিল,—কঞ্জা।

পরমাসুন্দরী একটি লিচ্ছবী পরিচারিকা আসিয়া অগ্রে মহারাজকে তারপর বিভ্‌ভলাকে প্রণামান্তর অধোবদনে দাঁড়াইল। হেলেন আদেশ করিল,—যাও তো কঞ্জা, দ্রুত যাও, এখনই এখানে মহারাজের জন্য পানীয় ফলাদি বৈকালিকের যা কিছু আনতে বলে এসো। সে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণেই দুইটি অন্তঃপুরিকা সুবর্ণ থালে নানাবিধ ফলাদি রাজভোগ আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া গেল। বিভ্‌ভলা রাণী দেখিল, মহারাজ ভোজ্য স্পর্শ করিয়াছেন তখন বলিল,—একটা কথা মহারাজ আমায় বলতে এসে ভুলে

গেছেন। মহারাজ স্মরণের চেষ্টায় বিফল হইয়া বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য, হেলেন! তুমি আমায় বিস্মিত করেছ; আমাব কিছুই তো মনে পড়ছেনা। এবার মৃদুহাস্য সহকারে লাবণ্যময়ী হেলেন বলিল, মেগাস্থিনিস্ দেশে যাবেন নাকি অল্পদিনের জন্যেই? সেই জন্য ডিমিটি্‌য়াস এসেছেন শুনেছি।

চন্দ্রগুপ্ত শুনিয়াই বলিলেন,—ওঃ হোঃ ঠিক্ ঠিক্, আচ্ছা, আমার মনের কথা তুমি কেমন করে জানলে?

হেলেন বলিল,—আর্য্য মহামাত্য আমায় বলে পাঠিয়েছেন যবনদূত দেশে যাচ্ছেন। যদি মহারাজের অনুমতি নিয়ে দেখাশুনা করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আগামী পূর্ণিমার মধ্যে যে কোন দিন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—ভাল কথা হেলেন, তুমি দেখা ক'বে তাঁকে বিদায় দিও,—

একটু স্থিরভাবে একটা কিছু ভাবিয়া হেলেন পুনরায় বলিলেন,—সে কথা পরে বিচার করবেন; এখন আমার একটি গুরুতর কথা আছে, যদি মহারাজ উপেক্ষা না করেন, আর যদি একটু সাহস দেন তাহলে বলতে পারি। বলিয়া যেন একটু কাতর নয়নে মহারাজের মুখের দিকে চাহিল। আমায় তুমি ভয় পাইয়ে দিচ্ছ একটু সাহস চেয়ে রাণী,—গুরুতর কথা, আবার "অবজ্ঞা" তার উপর আবার "সাহস" এতগুলি চাওয়া বড় ভয়ানক বোধ হচ্ছে যে! আমিতো কখনও কোন বিষয়ে এতটা সঙ্কুচিত হবার অধিকার তোমায় দিইনি।

কথাগুলি শুনিয়া বিভ্‌ভলা রাণী বলিল,—তাহলে আমার অনুরোধ, মহারাজ

স্বয়ং যবন রাজদূতকে দর্শন দিয়ে আপ্যায়িত এবং বিদায় দেবেন, তাতে মেগাস্থিনিস মহাশয় কৃতকৃতার্থ হবেন, আমিও মনে শান্তি পাবো ; না হলে চতুর চূড়ামণি মেগাস্থিনিস ঠিক বুঝতে পারবেন, মহারাজ তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। একে তাঁর একটু নয় বিলক্ষণ সন্দেহই আছে যে, মহারাজ তাঁকে বান্ধবের পর্য্যায়ভুক্ত করেন না। প্রফুল্লমুখে মহারাজ বলিলেন,—দেখো হেলেন, যত বয়স বাড়ছে, আমার পক্ষে সামাজিক শিষ্টাচার এমন কি সকল বাহুল্যতাই বিষবৎ লাগছে। তোমাদের দূতটি একে পণ্ডিত,—আর আমি মুখ্যতঃ একজন সৈনিক মাত্র, আমি তাঁর পাণ্ডিত্য সহ্য করতে পারিনা। এটা হয়তো তিনি বুঝে আমার প্রতি বিরূপ—

হেলেন মহারাজের ডান হাতখানি ধরিয়া বলিল,—ওকথা শুনবো না, মহারাজকে একজন উচ্চশিক্ষিত শৌর্য্যবীর্য্যবান রাজপুত্র ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারিনা—জানিনা—

মহারাজ বলিলেন,—তোমার জানা বা ভাবার সঙ্গে তোমারই সম্বন্ধ, আমি কিন্তু শিক্ষা করে কোন উচ্চ সংস্কৃতির আদর্শ পাইনি, আর শিক্ষা করে একটা কিছু করাটা না-করার মতই ভালবাসি। সহজে স্বভাব থেকে যেটা আসে সত্যই তাই আমার প্রিয়। সেই জন্য দূতপ্রবরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গায়ে পড়ে প্রত্যেক আলোচনা আমায় বিব্রত করে তোলে ; সভায় আর্য্য কাত্যায়ন আছেন, আর্য্য মহামাত্য আছেন আরও অনেকেই আছেন, যত ইচ্ছা তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করুন, কালের সদ্ব্যবহার হবে, আমায় অব্যাহতি দিলেই আমি কৃতার্থ হব, আর এই জন্যই তাঁকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিতে তোমাকেই অনুরোধ করেছিলাম। যদি ইচ্ছা হয় তো একটু ধূমধাম করেই বিদায় দিতে পারো।

হেলেন তবুও মানে না, বলিল,—প্রভু! আমার একান্তই অনুরোধ, দয়া করে তাঁকে সামাজিকভাবে তাঁর প্রতি রাজপ্রীতির নিদর্শন দিয়ে তাঁকে বিদায় দিবেন।

মহারাজ বুঝিলেন রাণীর মনের কথাটা। তখন বলিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, আমার শুভাদৃষ্টে যখন তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা খানিক শুনার যোগাযোগ আছে তখন অঙ্গুলি হেলনে তা এড়াবো কি করে? তাই হবে প্রিয়তমে, তোমার পিতৃবন্ধুকে আমি আদর করেই বিদায় দেবো, কেমন, প্রসন্ন হয়েছো? আচ্ছা, কেনো বলতো তুমি এ বিষয়ে এত দৃঢ়তা দেখালে?

মহারাজ, আমরা অন্তঃপুরিকা রাজনীতির কিছুই জানিনা; কেবল এইটুকু জানি, আমার ভুবনমোহন স্বামীর কাছ থেকে যে কোনো ব্যক্তি বিদায় নিয়ে দূরে যাবে, তার মনে, মহারাজের শিষ্টাচার এবং সরল ব্যবহারের বদলে কোন খুঁত বা কোন ত্রুটির কথা জেগে থাকবে, এ আমি কেমন করে সহ্য করবো?

মহারাজ বলিলেন, হেলেন, তোমার অন্তঃকরণ তোমার মুখমণ্ডলের মতই নির্ম্মল,—চিরকালই যেন এমনই থাকে। যাই হোক আমি যথাসময়ে তাঁকে সসম্মানে বিদায় দেবো,—তুমি ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তোমার কাজটি শেষ করে রেখো, যদিও তাঁর যাবার এখনও অনেক দেরী আছে।

উনিশ

রাজপুরীতে বিন্দুসারের স্থান এখন আর অন্তঃপুরে নহে, তাহার উপনয়নের পরেই পৃথক বাসভবন এবং সহচর-সহ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুরুগৃহবাসের কাজও এইখানেই চলিতেছে। অধ্যাপক এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা এইখানে আসিয়া যথাসময়ে যথারীতি শিক্ষাদান করিয়া যান। স্থানটিও মনোরম, উদ্যানমধ্যে অন্তঃপুর তোরণের বাহিরে; পশ্চিমপ্রান্তেই অবস্থিত যাহার অপর প্রান্তে মহারাজের বয়স্য, কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্থান। মধ্যে একশ্রেণী বিশালকায় অর্জ্জুন বৃক্ষ এই উদ্যানটিকে বিভক্ত করিয়াছে। মহারাজ বিন্দুকে নয়নের অন্তরালে রাখিতে চান না, এই জন্যই বর্ত্তমান স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। দেখা-সাক্ষাৎ অত্যন্ত সহজ হইয়াছে, বিন্দু প্রভাতে যাইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসে, আর মহারাজ স্বয়ং প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিন্দুকে সঙ্গে লইয়া মহাকাল মন্দিরে দেবদর্শনে গমন করেন। এইভাবেই পিতাপুত্রে প্রত্যহ দুইবার দেখা হইত।

দ্বিতল অট্টালিকা, নিম্নতলে পাঠাগার, সহচর ও বান্ধবগণের মিলিত হইবার কক্ষগুলি যথারীতি সুসজ্জিত অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই নাই, বাহুল্যতা-বর্জ্জিত যাহাকে বলে সেই ভাবেই সকল কিছুই যথাস্থানে রক্ষিত আছে। যথাকালে দুইজন পরিচারক এবং দুইজন অরালিক এবং অপর দুই ভৃত্য সকল কিছুই সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করিত। পান ভোজন শয়ন, কোনোদিকেই যুবরাজের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, এ সকল বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিবার জন্য মহারাজের নিজ ভাণ্ডারাধ্যক্ষ সর্ব্বদাই তৎপর ছিল।

এখানে প্রায়ই সমবয়স্ক, যুবরাজের দুই সহচর, তারই ইচ্ছানুসারে সঙ্গে থাকিত। প্রথমটি মুখ্য সেনাপতি আর্য্য বলভদ্রদেবের কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্বর দামোদর, অশ্বসেনাপতি গণপৎ দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা;—ইহার সহিত বিন্দুর হৃদ্যতা ছিল এবং প্রাণের ঘনিষ্ঠ যোগও ছিল, আর দ্বিতীয় বয়স্য,—বিন্দুর ধাত্রীপুত্র, নলগন্ধর্ব্ব, অসাধারণ অস্ত্রকুশল, দুর্দ্দান্ত সাহসী, সেই ছিল বিন্দুর যথার্থ পার্শ্বচর, দেহরক্ষক—সব কিছুই। ক্ষত্রিয় রক্ত সর্ব্বক্ষণ তাহার ধমনীতে নৃত্য করিত। ভয় কাহাকে বলে শিশুকালাবধি সে জানে না,—সে ছিল বিন্দুর একান্তই অনুগত;—প্রাণ দিয়াও সে বিন্দুকে সন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত, এমনই ছিল তাহার আনুরক্তি। দ্বিতলেই এই তিন

বয়স্যের শয়ন কক্ষ-মধ্যে বিন্দুসারের সুসজ্জিত কক্ষটি। অনুরূপ সজ্জিত কক্ষ দুই পার্শ্বে দুইটি প্রিয় সহচরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তিনটি কক্ষের দ্বার বরাবরই উন্মুক্ত থাকিত। প্রতিদিন প্রাতে বিন্দু অশ্বারোহণে ভ্রমণকালে গন্ধর্ব্ব নিশ্চিৎ-ভাবেই সঙ্গে থাকিত ও বৈকালিক ভ্রমণে ভাস্কর ছিল বিন্দুর প্রিয় বান্ধব। গন্ধর্ব্ব ছিল অতি অল্পকথার মানুষ, বেশী বিদ্যা, বাক্য-চাতুর্য্য তাহার মধ্যে ছিল না, তাহার মধ্যে ছিল পূর্ণ আন্তরিকতা। আজ বৈকালে ভাস্কর আসিয়া দেখিল, বিন্দু যেন চিন্তার সমুদ্রে ডুবিয়া আছে; পূর্ব্বে তাহাকে এমনটি সে কখনও দেখে নাই। সে বিন্দুকে বিরক্ত না করিয়া গন্ধর্ব্বের ঘরে গেল এবং তাহাকেও যেন চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? গন্ধর্ব্ব কিছুই জানিত না। সে বলিল যে, মহামাত্য আর্য্য চাণক্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আসিয়া অবধি ঐরূপই সে দেখিতেছে, এবং ঐজন্য তাহাকেও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভাস্কর ফিরিয়া আবার বিন্দুসারের কাছে আসিয়া দেখিল; সে পূর্ব্ববৎ গভীর চিন্তায় সমাহিত, এখন কোন্ রাজ্যে সে বিচরণ করিতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির তাহা অজ্ঞাত। কতক্ষণ ভাস্কর দাঁড়াইয়া রহিল। আশ্চর্য্য, ভাস্কর ভাবিয়া দেখিল, চিন্তার এ কি অস্বাভাবিক গভীরতা, পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া ভাস্কর আসিয়াছে পদশব্দেও তাহার চৈতন্য হইল না,—তারপর প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকেও লক্ষ্য নাই। এইবার সে তাহার হাতটি বাড়াইল এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে উহা বিন্দুর স্কন্ধে স্থাপন করিল;—তাহাতেই জাগ্রত বিন্দু একবার ভাস্করের মুখের দিকে দেখিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—

তারপর,—উঃ ভাস্কর, অসহ্য, আর পারিনা, বলিয়া বন্ধুকে জড়াইয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিল।

ভাস্কর এ পর্য্যন্ত জানিত যে, তাহার কাছে বিন্দুর গোপনীয় কিছুই নাই, এখন বুঝিল সে এতদিন বিন্দুর আসল গুহ্য কথা জানিতেও পারে নাই,—আরও বুঝিল, এইবার তাহা প্রকাশ পাইবে। তাহার তক্ষশীলা যাত্রার কথা ঘোষিত হইবার পর হইতেই সে বিন্দুসারকে বিশেষ যেন উদাসীন দেখিতেছে। এখন ভাবিয়া দেখিল, ইহার জন্যই বুঝিবা কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। আরও একটি কথা ভাস্কর জানেনা যে, তক্ষশীলা যাত্রার আসল প্রবন্ধটি সেই-ই মহামাত্যের সহায়তায় ঘটাইয়াছে। এখন মার্গশীর্ষ, প্রথম ভাগ, ফাল্গুনী পূর্ণিমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ভাস্কর ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে যে, বিন্দু কয়েকবার এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছে, তাহার যেন এত দীর্ঘকালের ব্যবধান অসহ্য হইয়াছে। সে যতশীঘ্র সম্ভব যাইতে চায়, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়; কারণ, শুভযাত্রার কাল নির্ণয় অপরিবর্ত্তনীয় বিধিরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই, বাধ্য হইয়াই তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইতেছে।

ভাস্কর মনে মনে, বিন্দুর এই নাটকীয় ব্যবহার সম্পর্কে কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কোন প্রশ্ন করিবে কিনা ভাবিতেছিল; কারণ, কৌতূহল তাহার পক্ষেও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার ধৈর্য্য অসীম, এবং তাহার এই ধীর স্থির স্বভাবের জন্যই সে বিন্দুর বান্ধবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রশ্ন করা চলেনা, ইহা তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রম;—এইসব বিচার করিয়া ভাস্কর এখনও মুখ খুলিল না,—অন্তরের মধ্যে আপন সংস্কার বশেই সে আরও এইটুকু পরিষ্কার বুঝিতেছিল যে, রহস্য উদ্ঘাটনের কাল আগতপ্রায়, তাহাকে দীর্ঘকাল আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

ইতিমধ্যে নল, বিন্দুর গলার স্বর শুনিতে পাইয়াই, ত্বরাগতি আসিতেছিল, দ্বারে পৌঁছিয়া বিন্দু ও ভাস্করকে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া সে গতি সংযত করিল;—এভাবের নাটকীয় বিষয়ীভূত ব্যাপার সে পূর্ব্বে তো দেখে নাই। তাহার সংশয় এই হইল যে, এখন হয়তো তাহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজস্থানে চলিয়া গেল। মনে মনে প্রতীজ্ঞা করিল, বিনা আহ্বানে সে আসিবে না, যদিও তাহার মনেও ভাস্করের উদ্বেগ সংক্রামিত হইয়া তাহাকেও সমান ভাবেই পীড়িত করিতে লাগিল। সুতরাং আজ বিন্দুর পুরমধ্যে যখন তিনটি প্রাণী বিশেষ একটা উদ্বেগ ভোগ করিতেছে,—ঠিক তখনই পরিচারক,—

বৈকালিক ভোজ্য থালি যথাস্থানে পরিবেশন করিয়া জানাইতে আসিয়া ঐ নাটকীয় পরিস্থিতি দেখিয়া সরিয়া পড়িল এবং ভোজন-কক্ষে ফিরিয়া সেইখানেই অপেক্ষায় রহিল।

এখন বিন্দুসার যে মনোবলে তাহার প্রণয় কাহিনী ভাস্করের কাছে এতদিন গোপন রাখিয়াছিল, এখন বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহার আর সে মনোবল নাই ; মনের অবস্থা বিশৃঙ্খল, সব সুশৃঙ্খলিত কল্পনা তাহার যেন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আর্য্য মহামাত্যের গোচরে আসিবার ফলেই এই অবস্থা তাহার, আর ভাস্করেব কাছে গোপন রাখা চলেনা,—তাই বিন্দু এখন ভাস্করের নিকট সকল-কিছু আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া বলিতেই সঙ্কল্প করিল। তখন দুইজনে আসনে উপবেশন করিয়া বিন্দু তাহার গুহ্য বিষয় ভাস্করকে যেন সব কিছুই নিবেদন করিল।

* * * * *

সকল বৃত্তান্ত শুনিবার পব ভাস্করের একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। অতঃপর সে বলিল,—তুমি যে একাণ্ড করতে পারবে, এ আমার স্বপনের অগোচর ছিল ;—কি গাম্ভীর্য্য দিয়েই তুমি তোমার গুহ্য কথা এইভাবে প্রচ্ছন্ন রাখো, আমরা তার কিছুই সন্ধান পাই না। জানিনা, আরও কিছু প্রচ্ছন্ন আছে কিনা,—যাহা সময়ে হয়তো প্রকাশ পাবে।

বিন্দু এবার যথার্থই সরল ভাবে বলিল,—আচ্ছা, সত্যি কথাটা ভেবে দেখো তুমি, এসব কথা কি প্রচারের বিষয়? প্রণয়ের বিষয় কি তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্তি হয় কারো? ভাস্কর বলিল, ঠিক ঠিক,—আমারও মনে মনে একজনের উপর আকর্ষণ আছে, তার কথায় যখন আমার মন ভরে থাকে তখন আর কারো কথা মনে থাকেনা কেবল তারই কথাই, সে আর আমি, এ পৃথিবীর আর কাকেও তখন ভাবতে ভাল লাগেনা সত্যই, একথা কাকেও বলবার নয়। বিন্দু তাহার কথাগুলি শুনিয়া বলিল, জানি, তোমার কথাও জানি। আবার বিন্দুর দীর্ঘশ্বাস শুনা গেল। ভাস্কর একটু চঞ্চল হইয়াই বলিল, জানো তুমি? আশ্চর্য্য তো! আমার কথা তুমি জানো? আচ্ছা, বলতো কে আমার,—বাধা দিয়া বিন্দু বলিল,—তিনি তোমার মাসীর মেয়ে, সরযূ নয় কি?

শুনিবা মাত্র বিস্মিত ভাস্কর, বিন্দুর দুটি হাত দিয়া তাহার হাত দুটি টানিয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় সরলভাবেই বলিল,—আচ্ছা, এখন সত্য বলো, তুমি কেমন করে জানলে, আমি তো কখনই কাকেও ঘূণাক্ষরে বলিনি?

বিন্দু বলিল, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ,—কতবার কথাপ্রসঙ্গে অপ্রসঙ্গে তুমি নিজমুখেই তার মধুর স্বভাব, রূপমাধুর্য্যের কথা উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছ তা তোমার মনে আছে কি? তাই থেকেই তো আমি ঠিক ধরেচি তুমি প্রেমে পড়েছো। শুনিয়া ভাস্কর বলিল, ও হো, বিন্দু! তুমি কি ভয়ঙ্কর চতুর;—আর এটাও ঠিক, তুমি নিজ অবস্থায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলে তাইনা ঠিকটি ধরতে পেরেছিলে? বলো বন্ধু?—

বিন্দু তখন ধৈর্য্যহীনের মতই বলিল, সে কথা যাক এখন, কি করি বোলে দাও;—আমি আর সহ্য করতে পারছিনা, এইসব গোপন বিষয়,—এই পর্য্যন্ত শুনিয়া ভাস্কর, বলিল, আমার মনে হয়, আর্য্যদেব চাণক্য যা বোলেছেন তাই তোমার শুনাই উচিত, তাতেই সবার সমর্থন পাওয়া যাবে; এই রাজ্যের কল্যাণ, আর সকল দিকই রক্ষা হয়। আচ্ছা, আর্য্য পিতামহী দেবী কি বলেন? তাঁকেও তো সব বোলেছ।

একটা আশ্চর্য্য কথা শুনবে? আমার মুখে তোমার প্রণয়-কথা শুনে তো তুমি আমার শক্তিতে আশ্চর্য্য হয়েছিলে, তার চেয়ে বড়ো আশ্চর্য্য সংবাদ আমি তোমায় শোনাতে পারি।

অত্যন্ত কৌতূহলী ভাস্কর অধৈর্য্য কণ্ঠে বলিল,—বলো, তুমি এখনই বলো,—ভাই—

পিতামহী আমার কথা আদ্যন্ত জানতেন। যখনই আমি সব বোলবো বোলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমায় বোললেন,—বিন্দু, তুমি আর কষ্ট করে কিছুই বোলো না, যে সময় থেকে তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ তা জানি, তার সঙ্গে তোমার প্রণয় কথা, তোমার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তোমার আগাগোড়া সকল অবস্থা, ইতিবৃত্ত—সবই আমার জানা আছে।

আমি বললাম, তুমি যদি সবই জানতে তাহলে বাধা দাও নি কেন? তুমি জানতে যে, এ প্রণয় কখনও শুভ নয়, বিশেষতঃ রাজকুমারের পক্ষে যাকে মহারাজের নির্ব্বাচিত বধূ রাজকন্যাই গ্রহণ করতে হবে, না হলে বিবাহই অসিদ্ধ হবে। অধীর আগ্রহভরে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি উত্তর দিলেন তিনি?

বিন্দু বলিল, তিনি কি বললেন জানো, তখন আমি বাধা দিলে তুমি কি আমায় তোমার শত্রু, গভীর শত্রু মনে করতে না? শুনে আমি ভেবে দেখলাম, সত্য সেই প্রথম প্রণয়ের মুখে যিনি প্রতিবাদ নিয়ে আমার সামনে আসতেন তাঁকে আমি শত্রু ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবতে পারতাম না। আশ্চর্য,

আশ্চর্য্য, পরমাশ্চর্য্য তিনি আমায় করে দিলেন ভাস্কর! শুনিয়া ভাস্কর বলিল, তারপর?

তারপর আমি তাঁকে ধরলাম যে, আমি তাকে ছাড়তে পারবোনা, এখন উপায়? যাতে তাকে আমি—

তখন তিনি বাধা দিয়ে বললেন, এখন তোমায় বুঝতেই হবে আর যদি একান্তই তাকে ছাড়তে না পারো তা হলে আগে তুমি শাস্ত্রমতে বিদীশা রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহিত হও, পট্টরাজ মহিষী গ্রহণের পব তাকে তুমি অন্তঃপুরে বাণীর সম্মান, সম্ভ্রম দিয়ে মনোমত গৃহে রাখবে। তোমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ তো হযেই গিয়েছে, আর কোন বাধা বা অসুবিধাই হবে না। এমন আশ্চর্য্য আমি কখনও হইনি আগে, ভাস্কর যখন তিনি আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথাটা বোললেন; তিনি সব জানেন। এমন অদ্ভুত ব্যাপার শুনেছ কোথাও? এখন আমি কি করি বলোতো, তাকে এতটা আশা দিয়ে এখন, বুঝে দেখো, আমি কি ভযানক একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি, প্রাণ যাকে চায় তাকে সব কিছু দিতে পারবোনা—উঃ, আচ্ছা বলতো, তোমার প্রাণ চায় সরযূকে, এখন আর্য্য সেনাপতি যদি অপরিচিত একজনকে তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চান তোমার জীবন দুর্ব্বহ হয় কিনা।

ভাস্কব অত্যন্ত প্রীতি, গদগদ কণ্ঠে, বিন্দুর হাত দুখানি নিজ হাতে লইয়া বলিল,—বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয় কি? তুমি যে রাজ্যেশ্বর, ধীরাজ হয়ে পট্ট মহাদেবীকে নিয়ে সাম্রাজ্যের মহাসিংহাসনে বোসবে,—তুমি পূজ্য,—তোমার সঙ্গে যাকে তাকে ঐ আসনে বসানো যায় কি? মহামাত্য আর্য্যদেব তোমায় কিছুই বলতে বা বুঝাতে বাকী রাখেননি। তুমি কি সত্যই এতটা অবুঝ হবে; মহামতি আর্য্য চাণক্যদেবের প্রিয় শিষ্য হয়ে?

কিন্তু বিন্দুর অন্তঃকরণ এখন অনেকটাই সহজ হইয়া গেলেও তবু একটা বেদনা তাহাকে মধ্যে মধ্যে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল,—কোথায় যে একটা বিষম অন্যায় করিয়াছে—কিছুতেই তাহার আর পরিত্রাণ নাই। ভাস্কর তাহার বেদনাটা কতক অনুভব করিয়া তাহাকে বলিল,—আমার মনে হয়, তুমি একবার স্বয়ং তার কাছে গিযা যদি তাকে সব কথা খুলে বলো তা হলে সে নিশ্চয়ই বুঝবে।

বিন্দু বলিল, তুমিও একটি পাগল দেখছি, সে কি কোন কালে কিছু আশা করেছে না নিজে আমার কাছে কোন জিনিস প্রার্থনা করেছে? নারীজীবনের

যা কিছু উচ্চ আশা, পদগৌরবের কথা, তখন আমি পাগল হয়েছিলাম,—সবই তো আমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে! এখন কোন্ মুখে আমি তার কাছে গিয়ে আবার দ্বিতীয় মূর্খতার পরিচয় দেবো? তার জীবনের সুখশান্তি আমিই নষ্ট করেছি? আমাকে এর জন্য দণ্ড ভোগ করতেই হবে।

ভাস্কর মর্ম্মে মর্ম্মে বিন্দুর অনুতপ্ত চিত্তের পরিচয় পাইয়া অতীব কাতর হইল,—কি বলিবে প্রথমে স্থির করিতে না পারিয়া সমানে তাহার সঙ্গে একই দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। শেষে বিন্দুকে সসঙ্কোচে সুধাইল, তুমি একবার আমাকে তার কাছে যেতে দেবে? আমি বোধ হয়, তোমার এ ক্ষোভ কতকটা অন্ততঃ নিরসন করতে পারবো।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ বলিল, ঐ দেখো, সেই আমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা, আমারই অপরিণামদর্শিতার কথা আমার বদলে তার কাছে তোমার ভাষায়, যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করবার জন্যই এইভাবে দূতের কাজটা করতে যাচ্ছ। এটা আমি হতে দেবো না,—

ভাস্কর বলিল, এই জন্যই তো তোমার যতশীঘ্র সম্ভব তক্ষশীলা যাবার চেষ্টা, —এটা এখন বেশ বুঝতে পারছি; কিন্তু চক্ষের আড়াল হলেই কি অন্তরের বেদনা লাঘব হবে?

আমি এখন নিঃসঙ্গ, একলা থাকতে চাই ভাস্কর, আমায় একটু ভাবতে দাও—আমি কি ভয়ানক অন্যায়, তার প্রতি কী অবিচার করেছি তা বুঝেছি। আমার নিজেকে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বোলে ভয়ানক একটা আত্মাভিমান ছিল, এখন বোধ হয় আমার চেয়ে ঐ বঙ্কা, রাজপুরীর একজন ভৃত্য, সেও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ।

ভাস্কর এবার এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার চেষ্টায় বলিল, এ ক্ষেত্রে যেটা ঠিক করা উচিত ভেবে চিন্তে তুমি তাই করো, আমার মত একজন, তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগাতে যখন সকল দিকেই অক্ষম তখন তোমাকেই,—এবার বিন্দু একটু নৈরাশ্যের ভাবেই কথার মাঝে ভাস্করকে বাধা দিয়া বলিল,—তবুও আমি এখনও আমার চরম কৃতিত্বের কথাটা বলিনি,—এখন সেটাও জেনে রাখো,—কিন্তু আমার দিব্য আর কাকেও বোলনা, এটা যেন তোমার মধ্যেই গুপ্ত থাকে;—বলিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ভাস্করকে সবলে আকর্ষণ করিয়া তাহার কানের কাছে অস্ফুট-স্বরে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিল। শুনিয়া প্রথমে ভাস্কর একটু প্রফুল্ল তারপর বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

কতক্ষণ পর ভাস্কর বলিল,—এবারে এ বিষয় তোমায় আর্য্য মহামাত্যের

গোচরে আনতেই হবে, তা ছাড়া আর তো প্রতিবিধানের অন্য পথই নেই।

বিন্দু বলিল, পিতামহী দেবীও এটা জানেন, আমার বলবার আগেই তিনি জানতেন দেখলাম। তবুও তিনি আমায় কোন রূঢ় বাক্য বলেন নি। শেষে বোলেছেন, এ সবের প্রতিবিধান তিনিই করবেন।

ভাস্কর বলিল, অর্থাৎ তিনি নিজেই আর্য্য বিষ্ণুগুপ্তকে জানাবেন, আর সকল ব্যবস্থা তাঁর দ্বারাই হবে। এখন সকল কথা আর্য্যদেবের কাছে খুলে বলবার নিতান্তই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির দায় থেকে তুমি বেঁচে গেলে আর ঠাকুরমাই তোমায় এ দায় থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

কুড়ি
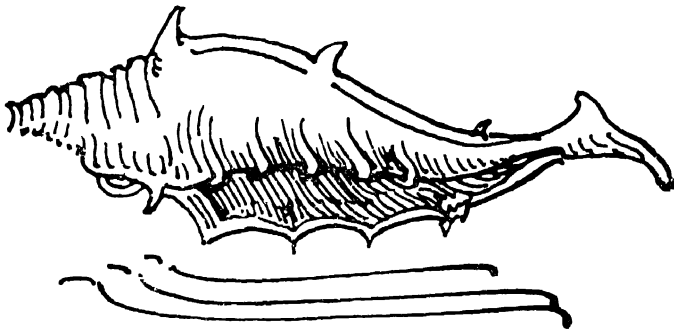
পরদিন রাত্র দেড় প্রহর গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের নারী শরীর-রক্ষীদের একজন তার নাম পিণ্ডা, রাণী হেলেনকে মহারাজের জন্য নবনির্ম্মিত শয়নে পৌঁছাইয়া গেল। মহারাজ মুক্ত ছাদের উপর পাদচারণ করিতেছিলেন, তিনি বিভ্‌ভলাকে সেইখানেই আহ্বান করিলেন। চমৎকার হাওয়া,—আনন্দেই মহারাজ পাদচালনা করিতে করিতেই কনিষ্ঠা রাণীকে সম্ভাষণ করিলেন,—আমার মনে হয়, উদ্যানের তুলনায় ত্রিতলের ছাদ বেশী উপভোগ্য—

হেলেন বলিল,—সত্যই, তার উপর যদি মহারাজ সঙ্গে থাকেন, আমি আমার পক্ষেই বলছি। মহারাজ বলিলেন,—কেমন মেগাস্থিনিসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার,—পিতার নিকট বার্ত্তা পাঠিয়েছ তো তাঁর মধ্যে দিয়ে ?

হা প্রভু ! আর্য্য মহামাত্য সে ব্যবস্থা করেই দিয়েছিলেন।

তাঁর মনে বেশ প্রীতি, আমাদের উপর সন্তোষ ছিল তো ? তাঁর কুশলতার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি তো ?

তাঁর নিজ মুখের কথা এই যে,—যে কয় বৎসর এখানে কেটেছে তাঁর ধারণা এইটাই তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল বোলেই তিনি মনে করেন। শেষে আবার ঐ কথাটাই বলিলেন, যাতে তাঁর সঙ্গের মহামূল্য উপহারগুলি নিরাপদে নিয়ে দেশে পৌঁছাতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

ভারত সীমান্তে পৌঁছে দেবার ভার আমাদের, মহারাজ বলিলেন,—তারপর তোমাদের যবন অধিকারের মধ্যে পড়বেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিমুখে আবার বলিলেন,—সেখানে তাঁর মহামূল্য দ্রব্যসম্ভার এবং নিজে তিনি, আরও বেশী নিরাপদ, নয় কি ?

হেলেন বলিল,—সত্য কথা একটা বলবো ? চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—কি বলবে তুমি, একটি সত্যকথা—বলো বলো। হেলেন বলিল,—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা যবন রাজ্যে নেই ;—একথা মহারাজের অজানা নয়, তবুও এখানে একটু শ্লেষ করলেন ঐ কথাটা নিয়ে ?

আমার প্রিয়তমা হয়ে বিভ্‌ভলা রাণী এমন কঠিন কথা তুমি কেমন করে বললে ? এখানে কি আমি শ্লেষ কর্ত্তে পারি ? তারপর ধীরে ধীরে মহারাজ অলিন্দ্যের উপরে হাত রাখিয়া তাহার উপর চিবুক স্থাপনান্তর বলিলেন,—দেখো,

আমার কথা বলার ধরণ ঐ রকম। আমি শুনেছি, রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা আমাকে অত্যন্ত উগ্র, উদ্ধতপ্রকৃতি এবং নিতান্ত কঠিনহৃদয় মনে করে। এ জন্য দায়ী আমার প্রকৃতি—বলিয়া প্রসন্ন বদনে রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহাকেও প্রসন্ন দেখিয়া বলিলেন,—আর একটা কথা, সীমাহীন যবন রাজ্য, কত বড় হয়ত আমি তা ঠিক জানি না, আর সেখানে দস্যুভয় আছে কিনা তাইবা জানব কেমন করে দেবী ?

দস্যুভয় সকল দেশেই আছে, কোথাও কম কোথাও কিছু বেশী। বলিয়া কনিষ্ঠা রাণী মহারাজের মুখের দিকে লক্ষ্য করিলেন। মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—কোথাও কোথাও রাজাও দুর্দ্দান্ত দস্যুবৃত্তিরই পক্ষপাতি। এটিও ত দেখা যায়।

রাণী গম্ভীর হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। মহারাজ বলিলেন,—অতি প্রাচীন কাল থেকেই দস্যু বৃত্তিটা চলে আসছে,—এই ভয়ানক অশান্তিকর সমাজের অবস্থা থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্যই রাজার আবির্ভাব, জানো ত? অথচ কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, কোন কোন স্থলে রাজাই দস্যু হয়ে কত দেশ, কত শান্তিপূর্ণ নগর বা গ্রাম ধ্বংস করে ভগবানের সৃষ্টি উৎসন্ন করচে। এক দেশের রাজা অন্য দেশের প্রতি দস্যুর মতই আচরণ করেন।

রাণী এখনও নিরুত্তর। মহারাজ আবার বলিলেন—ভারতের ইতিহাসে এই যবনাক্রমণ অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা। সরলপ্রাণ পঞ্চনদ এবং গান্ধারবাসীরা কি বলে জানো? যবন বীর সম্পর্কে তাদের বিচার শুনলে তুমি চমৎকৃতই হবে, একদল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—আচার্য্য, তাঁরা আলেকজাণ্ডারকে সভার মাঝে গিয়ে বললেন,—তখন তিনি তক্ষশীলায়,—ইরান রাজ্য আক্রমণ করা এবং জয় করা তোমার পক্ষে ন্যায় নীতি অনুযায়ী কার্য্যই হয়েছে, কারণ পারস্যের সঙ্গে যবন রাজ্যের ঘোরতর শত্রুতা দীর্ঘকালের, জয় পরাজয় এবং আক্রমণ প্রতিরোধের ইতিহাস আছে এর মধ্যে, কিন্তু, ভারত কখনও যবন রাজ্যের শত্রুতা করেনি, আর ইতিপূর্ব্বে যবনগণ কখনও ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কর্ম্ম করেননি। সুতরাং ভারতের কোন রাজ্য আক্রমণ করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁর ছিলনা। তাঁর বর্ত্তমান আচরণটি ভারতীয়গণ দস্যুভাবের আচরণ বোলেই মনে করেন।

একথা শুনে যবনরাজ আর তাঁর সভায় উপস্থিত সেনাপতিগণ প্রথমে বিস্ময়প্রকাশ করলেন, অনেকক্ষণই উত্তর করেন নি—শেষ অবধি তাঁর ভারত আক্রমণের পক্ষে সৎ যুক্তিই দেখাতে পারলেন না।

হেলেন বলিল,—আলেকজাণ্ডারের মহৎ চরিত্র সাধারণ পঞ্চনদের প্রজারা কি বুঝবে! তা ছাড়া দুর্ব্বল পরাজিত প্রজাবর্গ এক বিজয়ী বীরকে দস্যু বলবে, বিচিত্র কি? চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—কিন্তু সত্য সত্যই তাঁর কাজগুলি কি দস্যু মনোভাবের সাক্ষ্য দেয় না? হেলেন,—বাহুবলে পুরুবাজ্য অধিকার করে, তিনি সেই রাজ্য পুরুরাজকে প্রত্যর্পণ করেন নি? এটাতে তাঁর উদার রাজ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়নি?

মহারাজ একটু হাসিয়া হেলেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন রাণীর বুদ্ধিশক্তি কতটা মনে মনে তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন,—পরে স্পষ্টভাযায় বলিলেন, এটা জটিল রাজনীতির বিষয় প্রিয়তমে! তুমি ঠিক বুঝবেনা কিন্তু তবুও আমায় বলতেই হবে। রাজ্যটি পুরুকে প্রত্যর্পণ না করে উপায় ছিলনা; কারণ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ জয় এক কথা, আর রাজ্য অধিকার ও বক্ষা করা অন্য কথা। ঐ দুর্দ্ধর্ষ পুরু রাজ্যেব প্রজাদের বশীভূত রাখা অসম্ভব, এটা নিশ্চিৎ জেনেই ঐ উদারতা দেখাতেই বাধ্য হয়েছিলেন। না হলে তিনি এমন বিপদে পড়তেন যাতে করে নিরাপদে ভারত ত্যাগ অসম্ভব হয়ে পডতো। এতে তাঁর রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির পরিচয়ই পাওয়া যায়। এটা সত্য। ম্লান মুখে তখন হেলেন বলিল,—তাহলে তো মহারাজ রাজা ও দস্যুতে প্রভেদ বড়ই অল্প হযে পড়ছে। নয় কি?

কি জানো প্রিয়ে, আমাদের এটা নরম মাটির দেশ। এভাবে দেশ গ্রাম জনপদ ধ্বংস পশুবলের প্রভাবে নিরপরাধ নরনারী শিশু নির্ব্বিচারে হত্যা, রক্তস্রোত বহানো, তার উপর অগ্নিকাণ্ড করে গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হিংসার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখানো তাতে কোন্ দেশের প্রজারা বিজেতাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পারে বলো? এ সকল নৃশংস দানবীয় আচরণ ভারতে এতদিন অজ্ঞাতই ছিল। তোমার যবন রাজ-কূল ভূষণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করবার পর আর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য অটুট রাখা সম্ভব হবে না। এখানে আমাদের রাজধর্ম্ম পাশ্চাত্তের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন, এখানে মানুষের সঙ্গে শত্রুতার মধ্যেও মনুষ্যত্বপূর্ণ শৌর্য্যের স্থান আছে।

মহারাজ বোধ হয় মহাভারতের সময়ের কথাই বোলছেন?

তাই তো বলছি প্রিয়ে, ভেবে দেখ, রাজসূয় অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ এর মধ্যে দিয়েই বীরত্বের এবং কোন রাজ্যের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যেতো। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমানেরা শক্তিমানের সার্ব্বভৌমিকতা মেনে নিতো। যাদের

তা মানবার পথে সন্দেহ বা বাধা থাকতো, যজ্ঞে ব্রতী রাজার শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ হতো তারাই যজ্ঞের অশ্ব আপন দায়িত্বে অধিকার করতো। তখনই দুই পক্ষে খোলাখুলি যুদ্ধ হতো, তাতে বিজয়ীপক্ষ শক্তিশালী প্রমাণিত হতো। যজ্ঞে ব্রতী পক্ষই বেশী শক্তিশালী এটা জানাই থাকে, তাই-না যজ্ঞে অধিকারী বোলে স্বীকৃত হতো। সাধারণ অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনে মিত্র রাজারাই সহায় হয়ে তাঁকে প্ররোচিত করতো। এতে দেখো, পররাজ্য আক্রমণের বর্ব্বরতা নেই, অথচ অধিক প্রাণীক্ষয় না করে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হবার নির্দ্দিষ্ট সহজ উদার পন্থা রয়েছে। এসব এই ভারতেরই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

শুনিয়া বিভ্ভলা রাণী মৃয়মানা রহিলেন, মহারাজ বলিলেন,—এদেশের রাজতন্ত্রটা এমনই এক নিয়মের অধীন ছিল। প্রতিবেশী অপর কোন রাজ্যের সঙ্গে ন্যায়তঃ কোন সংঘর্ষের কথা নয়, নিজ অধিকার ছাড়াবারও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে, তাও যতটা কম সংঘর্ষ বা শক্তিক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য থাকে দুই পক্ষের। আসলে সংভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গোড়া থেকেই।

হেলেন এখন বলিল,—এভাবের চিন্তাও আমাদের পাশ্চাত্য দেশে একটা অদ্ভুত জিনিস,—শৌর্য্য-বীর্য্যশালী রাজা পরবর্ত্তীকালে যদি দুর্ব্বল হয় তাকে আক্রমণের কোন বাধাই নেই, এই জন্যই মহাবীর আলেকসাণ্ডার সহজেই পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন।

বাধা দিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—আর বোলনা প্রিয়তমে! আমি জানি রাজ্যবিস্তার, পররাজ্য গ্রাসের প্রেরণা কোথা থেকে আসে, তাঁর পক্ষে ঐ একটুখানি পিতৃরাজ্যের স্বামী হয়ে থাকা অসম্ভব; যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তাতে একটু ক্ষুদ্র অধিকারে সুখী হয়ে, স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। কাজেই, তাঁর শক্তিই তার কাজ করেছে, তাঁর সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে তিনি আদর্শ বীর হয়েই প্রেরণা যুগিয়েছেন। এতে অবজ্ঞার কিছু নেই,—মহা শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব যার, তার সমশ্রেণীর কাছ থেকে সে তার শ্রদ্ধা আদায় করে নেবেই, কেউ তাকে বঞ্চিত করিতে পারবে না।

মহারাজ কিছুক্ষণ স্থির, গম্ভীর হইয়া গেলেন, শেষে চিন্তিতভাবেই বলিলেন,—আচ্ছা প্রিয়তমে, মনে করো তোমায় এই প্রশ্ন করছি,—তিনি কেন ভারত আক্রমণ করলেন? ভারত কোনদিন যবন রাজ্যের সঙ্গে কোন

প্রকারেই শত্রুতা করেনি,—ভারতের সহিত কোন শত্রুতা কোন কালেই ছিল না, বরং প্রীতির ভাবই তো ছিল। কি উত্তর তুমি দিবে এ প্রশ্নের ?

রাণী প্রথমে একটু বিমনা, যেন অবসন্ন বোধ করিলেন, অল্পক্ষণেই সামলাইয়া বলিলেন,—যেমন আমার বাবার কাছে শুনেছি সেই রকমই বলছি ;—ভারত সীমান্তের অর্ণ দুর্গস্বামী কাশীগুপ্ত পারস্যের পক্ষে ছিলেন এবং অনেক রকমেই ইরানকে সাহায্য করেছিলেন। শেষে যখন আর জয়াশা রইলো না তখন তিনি ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। এই সূত্রেই হয়তো সম্রাট ভারত আক্রমণে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। হেলেনের কথা শুনিয়া মহারাজ প্রসন্ন বিস্ময়ে রাণীর মুখের পানে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে বলিলেন,—

একটা ছল আশ্রয় না করে রাজনীতির পথে চলা যায় না। ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্য, বিশেষতঃ সীমান্তের সঙ্গে তার পাশাপাশি রাজ্যের সম্বন্ধই নেই, একথা আলেকসাণ্ডারের অজানা নয় তো। তাই যদি হয়, তিনি কাশীগুপ্তের রাজ্যটুকুই আক্রমণ করতে পারতেন, তাকে দণ্ড দেবার ইচ্ছাই যদি তাঁর ছিল ? অবশ্য আমি জানি, সেই চেষ্টাই প্রথমেই তিনি করেছিলেন। কিন্তু পার্ব্বত্যরাজ্যের দুরন্ত প্রজা, এমন ভাবেই প্রতিরোধ করলে,—তাইতেই তাঁকে সকল শক্তি কেন্দ্রস্থ করে ভীষণ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়েই অগ্রসর হতে হয়েছিল। সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ না পেয়েই গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাতে আরম্ভ করলেন। তাতেই কাশীগুপ্তকে বিপন্ন হয়ে পালাতে হলো ; সেই জয়ের উন্মাদনায় তিনি ভারতে প্রবেশ করলেন ;—এই তো ইতিহাস। কাশীগুপ্তকে বন্দী করতে চেষ্টা করে যে প্রাণীহত্যা তিনি করেছেন,—প্রথম তাইতেই তাঁর কীর্ত্তি কলঙ্কিত হয়েছে।

হেলেন,—ঐ শৌর্য্যবীর্য্যের উন্মাদনাই তো বীরগণের সম্বল—ঐ গুণ না থাকলে মানব জীবনের ইতিহাস অন্য রকম হতো। শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—

দেখ হেলেন, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর গুণাগুণ, তাঁর পরিচয় তাঁর ব্যবহারেই পেয়েছি যে, তিনি তো শান্তির জীবন চান নি,—তাই-না সারা জীবনই রণক্ষেত্রে কেটেছে ? কেবল জয়ের পর জয় লাভের মত্ততায় তাঁর মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত, শেষে ক্ষীণ হয়েই না অকালে পরলোকের যাত্রী করতে বাধ্য করছে ? এইটিই সবার বড় দুঃখ, তাঁর গড়বার শক্তি ছিল না। তবে আমি তাঁর কাছে সন্দেহ এবং অবজ্ঞা পেলেও তাঁর দলের দক্ষ সেনাপতির্দের কাছে

রণক্ষেত্রে ব্যূহরচনাদি, অনেক কিছু পেয়েছি। আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে তাঁর রণনীতির প্রতি। তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়ক ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবে তিনি বাহুবলেরই উপাসক, একথা সবাই বলবে;—তাঁর ঐ বিশ্বাসই তাঁকে সকল রণক্ষেত্রেই আগাগোড়া,—প্রেরণা যুগিয়েছে।

উভয়েই বহুক্ষণ নিস্তব্ধ,—মহারাজ ধীরে ধীরে রাণীর হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—পৃথিবীতে একমাত্র বাহুবলের উপাসক মানুষ সমাজই তো একমাত্র মানুষ সমাজ নয়? উন্নত সমাজের বা জাতির উন্নত আদর্শও তো আছে, থাকবেও এই ধরিত্রীর অধিকারে। শুনিয়া হেলেন বলিলেন,—সে উন্নত মানুষ সমাজ কোথা, আমি তো দেখি না।

চন্দ্র,—উন্নত এই সমাজ সকল জাতি, সকল দেশের ভিতরে ভিতরে আছে এবং থাকে; তবে তারা এখন সংখ্যায় কম, তাই তাদের কণ্ঠ দুর্ব্বল, তা সত্বেও তারাই জাতির প্রাণ এবং সেই জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ। তাঁদের চিন্তাই, সংভাবাপন্ন সমষ্টিকে প্রভাবিত করে; ইতর সাধারণ তাদের কথা জানে না। পশুশক্তি সাহায্যে মানুষের উপর আধিপত্যের যে সুখ,—এর অসারতা জ্ঞানীদের মধ্যে প্রমাণিত ধর্ম্মোন্নত সমাজে কখনই টেঁকৃতে পারবে না। কাজেই তোমার আলেকসাণ্ডারের আদর্শও চিরকাল থাকবে না। এ আদর্শ টেঁকতে পারে না; তার কারণ, মানুষ সমাজ তো ক্রমশঃ উন্নত হতেই চলেছে।

হেলেন,—চটুল ব্রাহ্মণের উপদেশেই তুমি এতটা জেনেছ; না হলে তুমি ঐ আলেকসাণ্ডারের ধারাতেই চলতে, তোমার মনোবৃত্তিতে এত বিচার করে কর্ম্ম করা স্বাভাবিক নয়।

চন্দ্র,—আমি এর প্রতিবাদ করব না। তবে এটা নিশ্চয়ই জেনো, যদি আমার অন্তঃকরণে ঐ বিচারের বীজ না থাকতো, তাহলে কারো কথায় কি কারো চৈতন্য হতে পারে? কোথাও দেখেছ? তোমার আলেকসাণ্ডারের সঙ্গেও তো অনেক সাধুর দেখা হয়েছিল, তিনি তাদের উপদেশে কিছুমাত্র লাভবান হয়েছিলেন কি?

হেলেন,—শুনেছি এই ভারতেই এক সাধুর কাছে তিনি জ্ঞান পেয়ে, ভবিষ্যতে আপন অধিকার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেই ফিরেছিলেন দেশে।

চন্দ্র,—তাহলে এখন এই পর্য্যন্ত থাক্, না হলে আবার এখান থেকে তাঁর নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মালবের মধ্যে সেই উপদেশের যে নমুনা দেখিয়ে-

ছিলেন সেকথা বলতে হয়, দেবী। যাক আপাততঃ তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। আমরা স্বভাবের আদর্শ মেনে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মেই চলবো, রাজ-শক্তি আর প্রজাশক্তি একাঙ্গ হয়ে থাকবে ;—আমাদের জাতীয় ধারাই তাই।

হেলেন,—এ অসম্ভব কল্পনা কর্ত্তে পারো, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসাধারণ একাঙ্গ হবে ?

চন্দ্র—কল্পনা কেন প্রিয়তমে, আমার মাতুল বংশের কথা কি শোননি ? পিপ্পলীবনের গণরাজ্য, অবশ্য ক্ষুদ্র বলতে পারো, কিন্তু তার আদর্শ তো ক্ষুদ্র নয়। আর ক্ষুদ্রই তো কালক্রমে বৃহৎ হয়। আমার মা তো ঐ বংশেরই মেয়ে, আমাদের সার্ব্বভৌমিকতা তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। কি চমৎকার তাঁদের রাজতন্ত্র, গণপতি তাদের রাজা, গণেশ তাদের দেবতা, অষ্টগণাধিপ তাদের রাজ্য পরিচালনা করেন। যেমন আমাদের গ্রামের শাসনতন্ত্র পঞ্চায়েতের হাতে। শ্রেষ্ঠ, মহামান্য, জ্ঞানে ও বিচারে যাঁরা পরীক্ষিত এবং উপযুক্ত প্রজাসাধারণ, তাঁদেরই অষ্টাগণাধিপ, এবং তাঁরাই একজন সর্ব্বপ্রধানকে গণপতি নির্ব্বাচিত করেন। এই কয় জনেই একমত হয়ে সমাজ এবং দেশ সম্পূর্ণভাবেই রক্ষা, পালন ও শাসন করেন তাঁদের অধীনস্থ নানা বিভাগের নানা কর্ম্মিবৃন্দের সাহায্যে। ঐখানেই তো দেখা যাবে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসাধারণের কায়মনোবাক্যে দৃঢ় সংযুক্তি, এমন কি ঐ তুই শক্তিই এক হয়ে গিয়েছে। আর শুধু ঐ এক পিপ্পলীবন নয়, শাক্য বংশীয়গণের রাজ্য রক্ষণ ও পরিচালন-পদ্ধতিও ঠিক ঐ প্রকার, তবে ওখানে গণপতিকে রাজা নামে নির্দ্দেশ করা হয়, এই মাত্র প্রভেদ। ভগবান বুদ্ধ ঐ শাক্য বংশেরই একজন।

এবার হেলেন বলিল,—মহারাজ, ঐ পিপ্পলীবন রাজ্য দেখতে আমার বড়ই সাধ হয়, অদূর ভবিষ্যতে যদি আমার দেখবার ব্যবস্থা সম্ভব হয়,—

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন, এ আর এমন কি কঠিন বিষয়, তবে ঐ ভ্রমণ খুবই স্থখের হবে বিন্দুর তক্ষশীলা যাত্রার পর,—তাতে তোমার হয়তো আপত্তি হবে না। মহারাণীরও ঐ সাধটি আছে।

আনন্দেই হেলেন বলিল,—চমৎকার হবে, বিন্দুর জন্য তাঁর একটা তুঃখ তো হবেই, তখনই ঐ ভ্রমণ খুব স্থখেরই হবে।

হেলেন বলিল,—এই মৌর্য্য সাম্রাজ্য ঐ পদ্ধতিতে চালানো যায় কি ;—কখনও সম্ভব ?

প্রসন্নমুখে মহারাজ বলিলেন,—আপাততঃ এই ভাবের এক শক্তিশালী

সাম্রাজ্যের আশ্রয়েই ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্তিপূর্ণ রাজ্য বাঁচতে পারে; কারণ, বহিঃশত্রু আক্রমণ ও প্রতিরোধের দায়িত্ব থাকে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তির উপর, কাজেই সে ভয় তাদের নাই। এখন যে আক্রমণ তোমাদের ঐ যবন বীর আলেকসাণ্ডার থেকেই সুরু হয়েছে, এই স্বর্ণভূমির উপর সেই লোলুপ দৃষ্টি বাইরের বড় বড় দস্যুরাজদের থাকবেই,—বোধহয়, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে তাদের বিলম্ব হবে না ভবিষ্যতে। বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করতে আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেই হচ্ছে, হবেও কতকাল কে জানে! সেই কারণেই প্রতিবেশী অর্থাৎ ভারতের বাইরের রাজ্যগুলি যতদিন শান্তিপূর্ণ, পররাজ্য আক্রমণ-বিমুখ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবের গণসাম্রাজ্য সমগ্রভাবে স্থাপন সম্ভব নয়। এসকল বড় জটিল বিষয়, শান্তিপূর্ণ সার্ব্বজনীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্ত্তমানের পশুভাব ও পশুশক্তিতে জর্জ্জরিত মহাদেশে এখন সম্ভব নয়। আজ এই পর্য্যন্তই ভালো, কেমন? তবে আজ তোমাকে আমি অন্তরের প্রীতি ও সম্মান দেবো এই জন্য যে, মহারাণী ভদ্রাদেবীর সঙ্গে আমার কখনও এতক্ষণ এবং এতটা রাজনীতি চর্চ্চা সম্ভব হয়নি; কারণ, মহারাণীর স্পৃহাহীনতা, তিনি বলেন, ওসব কাজ আমাদের নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের আগ্রহই তোমায় এতটা এগিয়ে দিয়েছে; এ সাহস কারো দেখিনি রাজ অন্তঃপুরে; সুতরাং তোমাকে আমার হৃদয়ের প্রীতি-চিহ্ন দিলাম গ্রহণ করো—বলিয়া মহারাজ বিভ্‌ভলাকে চুম্বনে মুগ্ধ করিয়া দিলেন।

একুশ

এখানে পুষ্পদত্তার পরিচয়-কথা একটু বিশদ ভাবেই বলিবার আছে। সুন্দরী তখনকার দিনে অনেক ছিল কিন্তু তাহার তুল্য সুন্দরী খুবই কম ছিল ; একথা তখন তাহাদের পল্লীবাসী সবাই জানিত। শুধু ঐ পল্লীটি নয় ভিন্ন পল্লীর অধিবাসীরাও উহা স্বীকার করিত। ষোড়শী হইলেও তাহার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য ছিল বলিয়া তাহাকে বালিকাই দেখাইত। তেজস্বিনী স্বভাবে তাহার আত্মশক্তির পরিচয় প্রত্যেক ব্যবহারেই পাওয়া যাইত। তাহার জন্মবৃত্তান্ত যাহা পল্লীবাসী সবারই জানা ছিল, তাহা এই,—

যে পল্লীতে প্রবীর বর্ম্মার গৃহ, সেই ক্ষত্রিয় পল্লীতেই—রাজপথের উপরে বহুকালের প্রাচীন বিঘ্নেশ, গণপতির মন্দির। ভিতরে, গর্ভগৃহে, সিন্দুররঞ্জিত এক বিশাল দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তিও ছিল। উহা নন্দরাজাদের সময়েই প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলে যে, মহারাজ নন্দ এই মন্দিরে আসিয়া প্রত্যহ পূজা করিতেন। ইতিমধ্যে কত ওলট পালট হইয়া গিয়াছে,—রাজধানীর উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিঘ্ন-হরণ-বিধু একদন্ত লম্বোদরের পূজা একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। তবে পূজারী বদল হইয়াছে কয়েক বার। এখন হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, ধর্ম্মমাধব নামে এক কুমার ব্রহ্মচারীর উপরেই এই মন্দিরে পূজা অর্চ্চনাদি সর্ব্ব বিষয়ের ভার ছিল। এই মন্দিরের অধিকারে বেশ অনেকটাই বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহার তত্ত্বাবধানও পূজারীর অন্যতম কাজ। বিষয়লোভী স্বার্থপর কোন ব্যক্তি এই মন্দিরের পূজারীর পদই কামনা করে, কিন্তু বিধাতার বিধানেই যে সূত্রে এই সর্ব্বত্যাগী যুবার উপরেই এখানকার সকল অধিকার আসিয়া পড়িল তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই,—তবে এইটুকু সবাই জানে যে, এই কর্ম্মে প্রথমে, তাহাকে অঞ্চলের বহু গণ্যমান্য এবং সংব্যক্তির অনুরোধ ক্রমে একপ্রকার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাগিতে হইয়াছিল। অতঃপর ধর্ম্মমাধব, এই মন্দিরের পূজার্চ্চনা প্রভৃতি সকল কর্ম্মই তাহার সাধনা বা উপাসনার অঙ্গীভূত করিয়া লইল। সবাই আনন্দিত হইল ;—যেহেতু এই বিঘ্নেশ্বর প্রতীক, জাগ্রত জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং বিশ্বাসের বশেই সবাই নিজ নিজ প্রাণের আকুতি নিবেদন করিত, ফলে, যার যে কামনা তাহা পূর্ণও হইত।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল,—ইতিমধ্যে একশ্রেণীর গৃহস্থ, তাহাকে কন্যাদান করিয়া গৃহী বা গৃহস্থাশ্রমী করিতে যত্নের ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মাধবের সংকল্প ছিল দৃঢ় এবং অটুট ;—কাজেই, কেহই তাহাকে টলাইতে পারে নাই। সংসার-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া মানুষ যে তাহার পরমার্থ, পরম সম্পদ, তথা আত্মশক্তি হারাইয়া বসে, একথা মাধবের উপদেষ্টা, দীক্ষাগুরু তাহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছিলেন। কাজেই, সেদিকে কোন মোহ কোন ভাবেই মাথা তুলিতে পারে নাই। এই ভাবেই তাহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল কাটিয়া গেল। তখন মাধব মনে মনে বিশ্বাস করিল যে, আর তাহার ভয় নাই। একথা তাহার গুরুই তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, পঁয়ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেলে আর কোন মোহ মাথা তুলিতেই পারিবে না, সিদ্ধির পথ সুগম হইবে।

তাহার আত্মশক্তির উপর এই যে দৃঢ় প্রত্যয় উহা অতীব কল্যাণপ্রদ। কিন্তু সেই প্রত্যয়টি যদি শ্লাঘায় পরিণত হয় তখনই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে ;—কারণ, ওটা শুদ্ধচেতন আত্মার স্বভাব এবং ধর্ম্মের বিপরীত। সেইজন্য চিরকালই সকল সংযমী বীরগণের উপর এক অবস্থায়, তাহার সংযমের গভীরতার পরীক্ষা-সূত্রেই প্রকৃতি জননী বিষম বাদ সাধিয়া থাকেন ; মাধব তাহার খবর রাখিত না, তাহার গুরু উপদেষ্টা তিনিও এসম্বন্ধে তাহাকে কিছুই বলেন নাই। কতটা জন্মগত সংস্কারের গলদ তোমার অন্তরক্ষেত্রে চাপা আছে প্রথমে জানা যায় না ; কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে, কার্য্যকারণ সম্পর্কে সৃষ্টিমুখী হইয়া উহা ভাসিয়া উঠে ; তখনই তোমার জীবনে দৃঢ় নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায়। আর তাহাতেই এই জ্ঞান দৃঢ় হয় যে, চিত্তক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গলদ থাকিতে অধ্যাত্ম রাজ্যে কাহারও অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এদিকে ধর্ম্মমাধবের দৈনন্দিন কর্ম্মপদ্ধতি এমনই নিয়মিত ছিল, কেহ এ পর্য্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম দেখে নাই। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর, নিত্যকর্ম্মে নিষ্ঠা, সবারই শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত। বিশেষতঃ বৈকালে মাধবের পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধুর্য্য প্রত্যেক শ্রোতাকে মুগ্ধ করিত। তাহার মধ্যে এমনই বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা আকর্ষণের বস্তু। তাহার স্বর এবং সুর-তাল মিলিত স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনাদি ও-অঞ্চলের প্রত্যেক শ্রোতার অন্তঃকরণ মধ্যে ভক্তির আবেশই পূর্ণ করিত। এইভাবে কুমার ব্রহ্মচারী, ধর্ম্মমাধবের জীবনের দিনগুলি মহা আনন্দেই কাটিতেছিল। এখন হইল কি ?

ঐ পল্লীর বিশালা নাম্নী এক ক্ষত্রিয়ানী, স্বামী হারাইয়া উন্মাদবৎ তাহারই

সম্মুখে আসিয়া পড়িল। যুবতী, সময়োচিত সকল গুণেই সে সবার প্রী ভাজন ছিল। যে ভাবে এই অসময়ে তাহার পতিবিয়োগ ঘটিল, তাহা এমনই মর্ম্মন্তুদ যে পাড়ার প্রত্যেক ঘরেই তাহার বেদনা লাগিয়াছিল। স্বামীপ্রেমে উন্মাদিনী প্রথম দিকে কএকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন তাহাকে ঐ পাপ আত্মহত্যা হইতে বাঁচাইতে গৃহমধ্যে বন্দিনী রাখা হইল। কিছুদিন পর উন্মাদের ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার জননী প্রত্যহ তাহাকে বিঘ্নেশের মন্দিরে নিয়মিত পাঠ শুনাইতে লইয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে ধর্ম্মের মাধুর্য্য, জ্ঞান ও ভক্তির ভাব-মাহাত্ম্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মন যে শুধু শান্ত হইল তাহা নহে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মস্পৃহা জাগ্রত হইয়া ধর্ম্মমাধবকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে সাধন ভজনে আকৃষ্ট করিল। এই সূত্রে মাধবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ উপদেশাদি গ্রহণের অবকাশে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে ঐ সৎসঙ্গের আকর্ষণে অধিক কালক্ষেপন। তারপর যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিয়া গেল। অর্থাৎ প্রণয় সঞ্চারিত হইয়া উভয় পক্ষেই বিহ্বলতা আনিল। আরও কিছুদিন পরে সংযমের বাঁধও ভাঙ্গিল এবং এই অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা পুষ্পদত্তার মূর্ত্তিতে তাহাদের প্রণয়ের স্থায়ী ফল উৎপন্ন করিল। স্বাধীন সমাজে, সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানব শরীর মনের সহজ গতিতে, সৃষ্টিমুখী প্রবল তৃষ্ণার ফলেই পুষ্পদত্তার আবির্ভাব। যেন শকুন্তলা জন্মের দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বামিত্রের যাহা হইয়াছিল পুষ্পদত্তার জন্মের পর, ধর্ম্মমাধবেরও তাহাই হইল। বৈরাগ্য প্রবল হইল; সংস্কারের অনিত্যতা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। দৃঢ় সংযমের সূত্র হারাইয়া অনুতাপ, কি করিতে কি হইয়া গেল, অনুশোচনা আসিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির সকল কিছুই বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল।

একদিন প্রাতে দেখা গেল মাধব আর মন্দিরে নাই, অপর এক প্রৌঢ় মূর্ত্তি আসিয়া পূজার আসনে বসিয়া দৈনন্দিন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন, ধর্ম্মমাধব নিরুদ্দেশ। কিন্তু বিঘ্নেশের পূজার্চ্চনা যথানিয়মেই চলিতে লাগিল।

যাঁহাকে এখন মন্দিরের স্বামী নির্ব্বাচিত দেখা গেল, তাঁহার নাম দামোদর, শর্ম্মা,—মাধব তাহাকে এইমাত্র বলিয়াছিল—চিত্তশুদ্ধির জন্য এখন তীর্থ ভ্রমণে যাইতেছে, পরে সে শ্রমণের জীবন গ্রহণ করিতেই কৃতসংকল্প, এখানে সে আর ফিরিবে না।

পুষ্পদত্তার জনক ধর্ম্মমাধব আর জননী বিধবা, ক্ষত্রিয়ানী বিশালা, এ-অঞ্চলে একথা সবাই জানে আর তাহারও এই মাত্র পরিচয়। জননী ও ঘনিষ্ঠ প্রাতিবেশী,

যাহাদের স্নেহে পিতৃত্যক্তা অভাগিনী পুষ্পদত্তা মানুষ হইতেছিল, তাহাদের কোন বিরুদ্ধ ভাব, বা প্রীতির অভাব ছিল না, তাহা ছাড়া পুষ্পদত্তার জননীরও নিঃস্ব অবস্থা ছিল না। স্বামীর গৃহেও সঞ্চিত ধন এবং কিছু সম্পত্তিও ছিল। সুতরাং অন্নবস্ত্রের দুঃখ সে কখনও পায় নাই। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল উদার, তাহার উপর শিশুকাল হইতেই তাহার রূপের অপরূপ বৈশিষ্ট্য সবার কাছেই এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। জন্মাবধি, যে তাহাকে দেখিত, সে আদর না করিয়া, তাহার অন্তরের স্নেহের পরিচয় না দিয়া পারিত না। প্রতিবেশীদের বাড়িতেই তাহার সারাদিনই কাটিত। যখন যেখানে খুসী সেইখানেই যাইত, খাইত, থাকিত এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া ফিরিত। কারো বারণ কখনও মানিত না। মোট কথা, বিশেষ ঐ সময়েই আদর ও যত্নেই তাহার বৃদ্ধি,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহসও বাড়িতেছিল। সর্ব্বক্ষেত্রেই সে নিঃসঙ্কোচ, তাহার প্রকৃতিতে দুর্দ্দমনীয় স্বেচ্ছাচারিতার ভাবও আত্মপ্রকাশ করিতেছিল; কাজেই, তাহার শুভানুধ্যায়ী যারা তাহার পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছিলেন, বিশেষ, তাহার জননীই তাহার চঞ্চল স্বভাবের জন্য একটা আশঙ্কা পোষণ করিতেছিলেন।

জন্ম ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জননী, তাহাকে লইয়াই সর্ব্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ক্রমে তাহার রূপের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াও কস্মিনকালে তাহার কোনরূপ অকল্যাণ কল্পনা করিতে পারে নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, নারী প্রকৃতি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধির প্রভাবে নিজ কল্যাণ-অকল্যাণ বিচারক্ষম হইয়া নিজ জীবনের শ্রেয়ঃ পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় সকল কর্ম্মেই পাওয়া যাইত,—তাহাতেই তাহার জননী ঐ সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

তাহার বিচিত্র প্রকৃতি, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মেয়ের মধ্যে দেখা যায় নাই, তাহা এই যে, ইচ্ছামত যথাতথা, এই মহানগরীর সর্ব্বস্থানেই তাহার গতিবিধি। বালিকা বয়স হইতেই তাহার আরম্ভ, কোন কাজেই সে কখনও নিজ মায়ের অনুমতিরও অপেক্ষা করিত না। কিছু দিন বালিকা বেলায় বিদ্যাভ্যাসও সে করিয়াছিল তাদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়ের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার একটু প্রতিষ্ঠা ছিল। পুষ্পদত্তা প্রথমে তাঁহার ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছেই থাকিত। তাহার কোথাও থাকিবার আসল কথাটী হইল তাহার নিজের ভালো লাগা;—স্নেহ-মমতার বশীভূত সে নয়। প্রথম বিদ্যারম্ভের পর তাহার কিছু দিন অস্ত্রবিদ্যায় মন গেল;—প্রথমে তীর ধনুর কাজ এবং লক্ষ্য

ভেদাদি চলিল। তাহার শিক্ষক দেখিলেন মেয়েটির লক্ষ্য তীক্ষ্ণ। দশম বৎসরে অশ্বারোহণ তাহার আরম্ভ ও আয়ত্ত হইল। তাহার জননী এখন হইতেই একটু উদ্বিগ্ন হইতে আরম্ভ করিল। তীর, ধনুপূর্ণ তুণীর লইয়া সে প্রতিবেশীর একটা ঘোড়া লইয়া চলিয়া গেল; বৈকালে কয়েকটি পক্ষী লইয়া উপস্থিত। চতুর্দ্দশ বৎসরে তাহার গুরু তাহাকে বাঁশের খেটক ও একখানি তরবারি দিলেন। তরবারি চালনায়ও সে দক্ষ হইয়া উঠিল। তাহার বয়সি সকল মেয়েই কিছু কিছু নৃত্যগীত অনুশীলন করিত; তাহার মা একদিন বলিল, তোকে তো যুদ্ধে যেতে হবেনা, তুই ও-সব রেখে একটু নৃত্যগীতের অনুশীলন কর না। সে রাজী হইল এবং উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে আরম্ভও করিল;—কিন্তু তাহাতে তাহার অধ্যবসায় ছিল না, কিছু দিন পর আর ভালই লাগিল না, ছাড়িয়া দিল। তবে কোন ক্ষেত্রে নৃত্যগীত আরম্ভ হইলে সে মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত উপভোগ করিত। কোন একটি উৎসব, মেলা বা প্রদর্শনী, মল্ল, রথ, হস্তী বা অশ্ব লইয়া ক্রীড়া, তখনকার চিত্তাকর্ষক সামাজিক কোন অনুষ্ঠান, সে কোন দিনই উপেক্ষা করে নাই। নৃত্যগীতাদি তাহার পক্ষে কিছুটা কম আকর্ষণের বস্তু ছিল। কর্ম্মী তাহার সহজাত। তখনকার সংস্কৃতিমূলক যা কিছু পুরাণ-পাঠ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাক্ষেত্রে, এমনকি পল্লীমধ্যস্থ সভা ও সমিতির মধ্যেও এক প্রান্তে পুষ্পদত্তার মূর্ত্তি দেখা যাইত, বুঝুক না বুঝুক সে সব কিছুই মন দিয়া শুনিত। এইভাবে যখন সে ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তদশ বর্ষে পদক্ষেপ করিল তখন সে কুসুমপুরের ক্ষত্রিয় পল্লীতে একজন নির্ভীকা, তেজস্বিনী, নিঃসঙ্কোচ, সর্ব্বত্র অবাধগতি, সর্ব্বজনপরিচিতা নাগরিকা বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল।

রাজপুরীর মধ্যে এবং মহামাত্য চাণক্যের আশ্রমেও তাহার গতিবিধি ছিল। মহামাত্যও তাহার মনের ভাবগতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে নিজ কর্ম্মে ব্যবহার করিতেন। অবশ্য সে তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, তবে মহামাত্যের আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া তাহার আত্মাভিমান, গর্ব্ব এবং সাহসটা কিছু বাড়িয়াছিল। মহামাত্য নিজেও ঐ মেয়েটির স্বভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু সংশয়াকুল ছিলেন। সুতরাং পুষ্পদত্তার প্রতি তাহার একটু বিশেষ লক্ষ্য ছিল, একথা না বলিলেও চলে।

যৌবনোদ্গমে পুষ্পদত্তার প্রতি অনেক যুবাই আকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তাহার, কাহারও উপর লক্ষ্য ছিল না বলিয়াই কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে নাই। এমন কি যুবা সম্প্রদায়ের উপর যেন তাহার একটা উপেক্ষাই দেখা

যাইত। এই সময়ে ঐ পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুকুন্দ বর্ম্মন নামে এক ক্ষত্রিয় যুবা পুরুষ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে ওদিকে লক্ষ্যই করে নাই। একদিন পুষ্পদত্তার সহিত একটু বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভিপ্রায়ে সে কয়টি সদ্য প্রস্ফুটিত স্বর্ণচাঁপা, যাহা যুবতী নারীমাত্রেরই লোভনীয়; নিজ হস্তে লইয়া সসঙ্কোচে তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং উহা গ্রহণ করিয়া বেণী অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করিল।

পরম সুন্দর যুবা এই পাত্রটিকে পুষ্পদত্তার জননী ভবিষ্যতে জামাতা করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কিন্তু কন্যা সে দিক দিয়াই যায় না;—এখন সে তাহার এই প্রীতির নিদর্শন পুষ্পগুলি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল,—ভদ্র, এই ফুলগুলি তোমার পাগড়ীতে লাগাওগে, বেশ মানাবে।

একটি মাত্র কারণে পুষ্পদত্তা ছেলেটিকে উপেক্ষা করিত এবং সে কারণটিও তাহার মাতা ও প্রতিবেশীরা জানিতেন। কন্যাটি কাহারও নিকট তাহার সম্বন্ধে মনোভাব গোপন রাখে নাই। বর্ম্মার প্রায় চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স হইতে চলিল, এখনও তাহার মুখে গোঁফ বা দাড়ির রেখা মাত্র পড়ে নাই,—তাই তাহার নাম দিয়াছিল মাকুন্দ বর্ম্মা। এই ব্যাপারের পর তাহার সখীগণের এই ধারণা হইল, আসলে সে কোমলতা বর্জ্জিতা নারীভাবে সে কোন পুরুষকেই ভালবাসিতে পারিবে না। তাহার জননী মুকুন্দ বর্ম্মাকে প্রত্যাখ্যানের কথা শুনিয়া তাহাকে গোপনে তিরস্কার করিলেন,—এমন রূপবান পাত্র, সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশের একজন রাজকীয় সৈন্য বিভাগের অসিবীর, ধানুকী, তাহাকে অপমান, কাজটা কি ভাল হইল?

শুনিয়া পুষ্পদত্তা হাসিয়া মায়ের গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, বলিল, অসিবীর, ধানুকী! মেয়েরাও আজকাল তার চেয়ে কম নয় মা, দেখোনি, মহারাজের শরীর রক্ষী, অসি ও ধনু ব্যবহারে তারা কি কম তোমার মাকুন্দ বর্ম্মার চেয়ে? আর কোন কথা চলিল না। কন্যা চলিয়া গেল নাচিতে নাচিতে। একজন প্রবীণা, মায়ের অন্তরঙ্গ, বলিল,—হয়তো ইতিমধ্যে মনোমত কারো সঙ্গে মালাবদল হয়ে গিয়েছে গোপনে গোপনে—ও সব পারে, যা মেয়ে তোমার। মা বলিল, ও সব পারে, কেবল পারে না কিন্তু গোপনে কিছু করতে। পুষ্পদত্তার প্রকৃতিতে গোপনে কিছু করা যে কতটা অসম্ভব, এই সত্য প্রমাণের সময় সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল।

বাইশ

এখন এই বিচিত্র প্রণয়হীন বা একপক্ষ প্রেমের উৎপত্তির কথা! সে এক নাটকীয় ঘটনা। কএকমাস পূর্ব্বের কথা, মহানগরে একদিন ছিল বিশেষ এক রথাশ্ব ধাবনের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ রথের দৌড়। সারা কুসুমপুরের বহু নরনারী ঐ অনুষ্ঠানটি সার্থক করিতে সেখানে উপস্থিত ছিল। এমন প্রতি মাসেই দুই একবার হইয়াই থাকে।

এখনকার দিনে আমরা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ বিস্তৃত রাজপথের উপর সুসজ্জিত বিশাল মন্দিরাকৃতি রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত আষাঢ়ে রথের যে ভীষণ রূপ

এবং উহা চালাইতে ভক্তিমান তীর্থযাত্রী জনসমষ্টির উৎসাহপূর্ণ রথরজ্জু লইয়া টানাটানির খেলা দেখিতে পাই, তাহার সহিত আমাদের বক্তব্য তখনকার এই সকল রথের তুলনাই হয় না। তখনকার দিনে উপযোগিতা হিসাবে ইহার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই অন্য প্রকার ছিল। এই দৌড়ের রথগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগতির জন্যই ইহা সরল ও বিচিত্র লঘু প্রণালীতে প্রস্তুত। দারুনির্ম্মিত এবং কারুকীর্ত্তির বৈচিত্র্য এই রথ রচনার সর্ব্বাংশেই প্রকটিত, যাহা একজন দ্রষ্টাকে মুগ্ধ করে। প্রত্যেক অংশ চিত্রিত এবং সুগঠিত। রথগুলির উপর দিক খোলা যাহার নাম ছত্রহীন, দুইখানি নাতিবৃহৎ চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক বা যুগলাশ্ব বাহিত; একজন, কচিত দুইজন চালকের উপযুক্ত রথের গর্ভক্ষেত্র।

সাধারণ কর্ম্ম উপলক্ষে অথবা দূরপথে যাতায়াতের জন্যও বটে এই প্রকার রথ রাজপথে ঘন ঘন দেখা যাইত। যুদ্ধে ব্যবহারের রথ, তাহার পরিকল্পনা এবং রচনা ভিন্ন প্রকারের। উহা দীর্ঘায়ত, ইহা তুলনায় সুদৃঢ় এবং যুদ্ধকালে রথীগণ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট। সারথী চালিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ যে রথ, তাহার সহিত ইহার তুলনাই হয় না। এখানে এখন দৌড়ের ছোট রথ লইয়াই আমাদের কথা।

কুসুমপুর মহানগরের প্রান্তে শিবিরোত্থান ছাড়াইয়া, প্রাচীর বাহিরে রাজকীয় হস্তীশালা পার হইয়া যে প্রশস্ত রাজপথ বারানসী পানে সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উত্তর পার্শ্বে যে বিশাল কুর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্যামল ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল দেখা যায়, প্রতি মাসের অমা ও পূর্ণিমা তিথিতে এই খানেই রথের দৌড় হইত। এই অনুষ্ঠান বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যে স্থান হইতে ধাবন আরম্ভ হয়, তাহাও নিয়মিতভাবে গভীর সরল রেখা দ্বারা চিহ্নিত এবং ইহার মধ্যস্থলে দীর্ঘ, ঋজু, গগনস্পর্শী নীচে স্থুল, উর্দ্ধে ক্রমসূক্ষ্ম বিশাল দণ্ড, শীর্ষে তাহার রক্তবর্ণ পতাকা বায়ুবেগে চঞ্চল; বহু দূর হইতেই দেখা যাইত।

ঐ ধ্বজদণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ঐ কুর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমি চক্রাবর্ত্তনে রথ পুনরায় ঐ ধ্বজদণ্ডের নীচে আসিলেই এক চক্র পূর্ণ হইত। ঐ ধ্বজদণ্ডের নিম্নদেশে ভূমির উপর পথের দক্ষিণে বিচারক এবং সম্ভ্রান্ত দর্শকবর্গের স্থান। এই দৌড়ের উদ্যোক্তা নগরপালই আহূত রথী, উপযুক্ত প্রতিযোগী, নির্ব্বাচন করিয়া ঘোষণা করিত; তাহার উপরেই এই সকল অনুষ্ঠানের সকল কিছুই নির্ভর করিত। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ বৈচিত্র্য থাকিলে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। না হইলে সাধারণ অনুষ্ঠানে যুবরাজ সবান্ধবে আসিয়া এই ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিতেন। অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণই বিশেষভাবেই তখনকার দিনে উহা উপভোগ করিতেন; আর সাধারণ নাগরীকের ত কথাই নাই, আপামর সাধারণের নিকট ইহার গুরুত্ব অসাধারণই ছিল বলা যায়।

আজিকার এই অনুষ্ঠানের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম পর্য্যায়ে আজ যাহারা রথে আরোহণ করিবেন, তাঁহারা সাধারণ রথী নহেন, উভয়েই গণ্য এবং অসাধারণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এমনই দুই ব্যক্তির রথক্রীড়া আজ বহুজনের নয়ন-মন সার্থক করিবে। একজন তাঁহাদের মধ্যে বিজাতীয় রথী, যবন অগস্ত-ক্রিপ্তাস্, ইঁহার সহিত মৌর্য্য রথ সৈন্য বিভাগের মহারথ পুলস্ত চুণ্ডীর ধাবনের

ব্যবস্থা হইয়াছে। বলিতে হইবে না, যবনদূত মেগাস্থিনিস তাঁহার স্বদেশীয় রথীকে পুরস্কৃত করিতেই এই বিস্তৃত আয়োজনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

কুসুমপুরের জনসাধারণের মধ্যে এক বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। যবনদূতের আসল উদ্দেশ্যের কথা সবাই জানিত। ইতিমধ্যে তিনি প্রার্থনায় প্রসন্ন করিয়া ক্রীড়াপ্রিয় মহারাজকেই প্রধান বিচারক এবং পুরস্কার-দাতারূপে বরণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, আর্য্য মহামাত্য যিনি কখনও কোন ক্রীড়ায় যোগ দেন না, তাঁহাকে পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া এই অনুষ্ঠানটি গৌরবান্বিত করিতে স্বীকার করাইয়াছেন।

এখন এই নায়কদ্বয়ের মধ্যে নির্ব্বাচিত প্রতিযোগী যিনি, মগধের শ্রেষ্ঠ রথী ঢুণ্ডি পুলস্তের কথা বলিয়াছি প্রবীর বর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটি ছিল নিগূঢ়। তাঁহারা সতীর্থ এবং একই গুরুর শিষ্য ; সুতরাং, অদ্যকার প্রতিযোগিতায় তাঁহার উৎসাহ উদ্বেগপূর্ণ ঐকান্তিকতা ঢুণ্ডি পুলস্ত অপেক্ষা কম নয়। উভয়ে আজ একই সঙ্গে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিজেদের মধ্যে অনেক কিছুই আলোচনার পর এখন যথাকালে ক্রীড়ারম্ভের অপেক্ষায় ক্ষণক্ষেপ করিতেছিলেন। এমনই সময়ে মহারাজ অশ্বারোহণে এবং মহামাত্য রথে আসিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকেই আনন্দের রোল উঠিল।

মহারাজ যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং উপবেশনের পূর্ব্বে একবার চারিদিকে লক্ষ্য করিলেন তখন সবাই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মহারাজের আসনের পশ্চাতে তাঁহার নারী শরীররক্ষক একদল সারিবন্দী দাঁড়াইয়াছিল, দক্ষিণে আর্য্য মহামাত্য এবং তাঁহার পার্শ্বেই যবনদূত মেগাস্থিনিস এবং তাহার পরেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। মহারাজের বামে প্রকাণ্ড আধারের উপর রজত পাত্রে, দধি চন্দন পুষ্পমালা, শঙ্খ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া পুরনারীগণ শঙ্খ হস্তে দণ্ডায়মানা এবং তাহার পরেই সম্ভ্রান্ত নারীগণের বিপুল সমাবেশ। এইভাবে ধাবন-পথের দুইদিকেই রাজ্যের সাধারণ নর এবং নারীগণের ভীড় সারাক্ষেত্র ব্যাপিয়া কৌতূহলপূর্ণ নয়নে অপেক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল।

এইবার প্রথম শঙ্খনাদ, ক্রীড়ারম্ভের ঘোষণায় সবাই তটস্থ হইয়া দেখিতে লাগিল।

মহারাজ প্রথম পর্য্যায়ের রথীদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সসম্ভ্রমে যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—নায়িকা অগ্রসর হইয়া উভয় রথীকেই গলে মাল্য এবং ললাটে দধি ও রক্ত চন্দন টীকায় বিভূষিত করিয়া দিল ; তারপর তাঁহারা
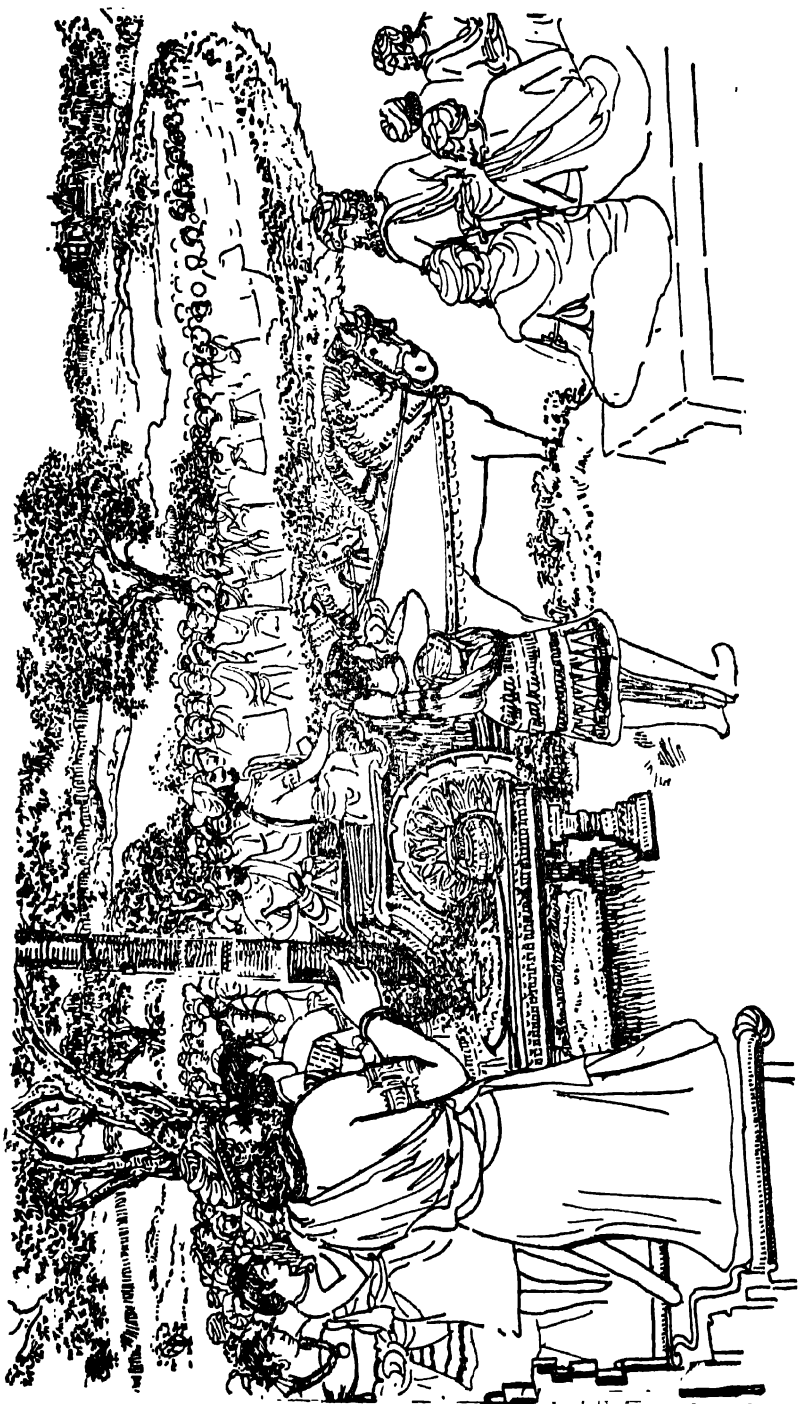
নতজানু হইয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই শঙ্খরোলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিলে ধীরপদে এইবার উভয় রথীই মহারাজের সস্মিত বদনের অনুমোদন লইয়া নীচে আসিল এবং সম্মুখস্থ প্রোথিত শূলদণ্ড হইতে রথসংযুক্ত অশ্বরজ্জু উন্মুক্ত করিয়া লইল। ত্বরিত পদে নিজ নিজ রথে আরোহণপূর্ব্বক সেই বিশাল ধ্বজদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুই বীর রথ স্থাপনা এবং অশ্ববল্গা দৃঢ় ধারণপূর্ব্বক তটস্থ রহিল। এইবার মহারাজের নির্দ্দেশ পাইবামাত্রই তুমুল শঙ্খরোল ও দুন্দুভিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই ধাবন আরম্ভ হইয়া গেল।

যাত্রাকালে পুলস্ত, পথের বামে এবং যবনবীর অগস্তক্রুপ্তাস দক্ষিণে গতিশীল হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই অগ্রগামী রথীর পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে দুইজন দক্ষ সৈনিক তাহাদের কতক ব্যবধানে ধাবিত হইল। ঢুণ্ডির পশ্চাতে তাহার দোসর প্রবীর বর্ম্মা আর যবনের পশ্চাতে রহিল তাহার নিজ দেশী একজন স্বজাতীয় বীর। ধাবনারম্ভ হইতেই চতুর্দ্দিকে, সারা ক্ষেত্র ব্যাপিয়া উৎসাহপূর্ণ কলরব উত্থিত হইল। এইভাবে উত্তেজনা উত্তর উত্তর বাড়িয়াই চলিল রথীদ্বয় যেমন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমচক্রাকার দীর্ঘ পথের প্রথম দিকেই অগস্তের রথ কিছুটা আগেই ছিল, ঢুণ্ডির রথাশ্ব সংযত বেগেই ধাবিত হইতেছিল। নিজ নিজ স্থান হইতে সবাই দেখিতেছে ;—বৃত্তাকার পথের প্রায় একাষ্টমাংশ অতিক্রম করিবার পর দুই রথীর রথ প্রায় সমান হইয়া গেল। তখন পুলস্ত আপন রশ্মি শ্লথ করিয়া কতক সংযম মুক্ত করিয়া তাহার বাহনকে গতিশীল হইতে সঙ্কেত করিল। সুশিক্ষিত অশ্ব প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিয়া পূর্ণ উদ্যমে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। এবার দেখা গেল দুইখানি রথ যেন পাশাপাশি এবং নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। অগস্তের অসংযত গতির জন্য ইহা ঘটিতেছে—ইহা দর্শকেরা সবাই বুঝিল। পরক্ষণেই একটা বাঁকের মুখে বিপজ্জনক ভাবেই দুই রথ এমনই কাছাকাছি আসিয়াছে যাহাতে দর্শকগণের মধ্যে একটা ভয়ানক সঙঘর্ষের আতঙ্কে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ও যেন তাহাদের হৃদপিণ্ড সবলে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। এমনই ভাবে অচিন্তিতপূর্ব্ব এক দুর্ঘটনা ঢুণ্ডিকে বিপন্ন করিয়া তুলিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড শিমূলগাছ এক প্রবল ঝড়ের বেগে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। গাছটাকে যথারীতি সরানো হইয়াও ছিল,—কিন্তু তাহার মূলে গহ্বর সমতল করা হয় নাই। ক্ষেত্রাধিকারীর এই অপরিণামদর্শিতার জন্যই তাহা মহাদুর্য্যোগেই পর্য্যবসিত হইল। স্থানটি বাঁকের মুখ, পূর্ব্ব হইতেই

সংযত হইবার সুযোগও হইল না, পূর্ণ বেগবান অশ্বদ্বয় ঢুণ্ডির সঙ্কেতের অনুবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই একেবারে সেই গহ্বরে পড়িল ; সুতরাং যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। রথ হইতে ঢুণ্ডি বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল এবং বিশেষভাবেই আহত হইল। এক্ষেত্রে যবনদূত স্থানীশ, মহারাজ, মহামাত্য প্রভৃতি সবাই লক্ষ্য

করিলেন যে, বাঁকের মুখে আসিবার পূর্ব্বেই যবন অগস্তের রথ যদি ঢুণ্ডির রথের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী না হইত তাহা হইলে মৌর্য্যরথী এই ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিবার সহজ সুযোগ এবং অনায়াসেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিত। যবন রথীর দোষেই এটা ঘটিল, মহারাজ প্রধান বিচারক হইয়া ভালই বুঝিলেন।

এদিকে প্রবীর এখন ত্বরান্বিত ঢুণ্ডি পুলস্তকে যত শীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া মহারাজের নিকট আসিয়া বক্তব্য নিবেদন করিল। মহামাত্য বলিলেন, দ্বিতীয় বার যাত্রা আরম্ভ হইবে। সাথীও নির্ব্বাচিত হইল। এখন পুলস্ত ঢুণ্ডির স্থানে প্রবীর নির্ব্বাচিত হইল এবং অবিলম্বেই যবনবীরকে যাত্রার স্তম্ভ নিম্নে আসিতে যথারীতি আদেশ দেওয়া হইল। সে আসিয়া যথাস্থানে রথস্থাপন করিলে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত হইয়া প্রবীরও আপন রথে আসিয়া মিলিত হইল এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহার নির্ব্বাচন ঘোষিত হইল।

তারপর পুনরায় শঙ্খ ভেরী দুন্দুভিনাদের মধ্য দিয়া যাত্রা আরম্ভ হইল।

যবনদূত স্থানীশ মুখেও আর প্রফুল্লতা রাখিতে পারিলেন না। এই প্রথম পর্ব্বের প্রথমাংশেই একটা অপরাধের ছাপ তাঁহার গর্ব্বিত স্বদেশবাসীর গায়ে লাগিয়া তাঁহাকে যেন অন্তকার ক্রীড়ার নিশ্চিত পরিণাম জানাইয়া দিল। এবারে

যাহা ঘটিল, তাহাতে সকল দর্শককে মহানন্দে উন্মত্ত করিয়া দিল। প্রবীর কোন দিকেই দেখিল না, তাঁহার নিজ রথ, নিজ নির্ব্বাচিত অশ্বদ্বয়, সঙ্কেতমাত্র ধাবন। এবারে পথের সেই বাঁকে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ বিপজ্জনক অংশ সে যবনকে নিরাপদে আগেই অতিক্রম করিতে দিল। তারপর প্রবীর তাহার বাজীদ্বয়কে একেবারেই মুক্ত করিয়া দিল। অপূর্ব্ব কৌশলময় সেই ধাবনেই মৌর্য্য রথীর সর্ব্বাংশেই বিজয় ঘোষণা করিল। আরম্ভ হইতেই প্রবীর কোনদিকে চাহে নাই, সেই যে তাহার বীরত্বব্যঞ্জক দৃঢ় মুখমণ্ডল, যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল।

আর এই প্রথম, পুরুষরূপে মুগ্ধ হইল পুষ্পদত্তা। সে নারীদলের মধ্যে ছিল, বিদ্রার নিকটেই। প্রবীরের রথ-চালনার কৌশল দেখিয়া যবনবীরও মুগ্ধ এবং যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে অগস্তক্রিপ্তাসই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া যেন তাহার অন্তরের যাহা কিছু গ্লানি নিঃশেষে মিটাইয়া লইল। তারপর যে ধন্য ধন্য রব উঠিল, সে কথা বলিবার নয়।

এদিকে যেমন একচক্র ধাবন সম্পূর্ণ হইল, রথীদ্বয় যথাস্থানে আসিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিল, তখন দুন্দুভিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়মাল্য প্রবীরের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল, নায়িকা আসিয়া তাঁহার ললাটে টিকা পরাইয়া দিল। পুষ্পদত্তা এখন যা করিল তাহাতেই সবাই চমৎকৃত, মহারাজ, মহামাত্য আর্য্য চাণক্যদেব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সে তাড়াতাড়ি সেই ধ্বজদণ্ডের নীচে, যেখানে বিজয়ী বীরের পুরস্কার আয়োজন সেখানে আসিয়া ঐ রজত-থালিকা হইতে একটা বড় পুষ্পমালা লইয়া নিঃসঙ্কোচে, ঝটিতি প্রবীরের গলায় পরাইয়া দিল। তাহার পক্ষে ঐ কর্ম্মটি অত্যন্তই নিয়মবিরুদ্ধ হইল; কারণ, ওখানে নগরপাল-নিযুক্ত নায়িকা ব্যতীত ঐ কর্ম্ম অপর কাহারও করণীয় নয়। যাহাই হউক, এখন, এই উৎসাহপূর্ণ আনন্দময় অবস্থার মধ্যে প্রবীর, পুষ্পদত্তার এবম্বিধ আচরণে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে চাহিয়া রথ হইতে নামিয়া নিজস্থানে আসিলেন। ওদিকে বড় একটা কেহ লক্ষ্য করিল না, বহিরঙ্গ অনেকে মনে করিল, ওই মেয়েটিই বুঝি আজিকার নায়িকা। তবে এক্ষেত্রে তাহার এই আচরণ পরিচিত সবাইকে অবাক করিয়া দিল।

এই হইল পুষ্পদত্তার প্রথম অনুরাগ, তাহার মন-মধ্যে, আজ এই ভাবেই এক পুরুষ বীরমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটিল এবং এমন গভীর ভাবেই ঘটিল, যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাহার কল্যাণকামিগণের মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছিল।

এখন হইতে পুষ্পদত্তা প্রবীরের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল

এবং বিদ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যাহাতে বাড়ে, তাহাই করিতে লাগিল। প্রবীরের রূপ ও গুণের কথা, তার শৌর্য্যবীর্য্যের কথা, তাহার সেদিনকার রথ-চালনার কথা,—তার যা কিছু গুণ-গরিমার কথায় সে যেন পঞ্চমুখ; তাহাতে এ বিষয় আর গোপন রহিল না অথবা কাহারও জানিতে বাকী রহিলনা যে, এই তেজস্বিনী কুমারীর প্রেমদৃষ্টি কাহার উপর পড়িয়াছে! কাহার চরণে সে কায়মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। প্রবীরের গৃহে তাহার ঘনিষ্ঠতা বিদ্রার মধ্যেও কোন প্রকারেই ঈর্ষা বা বিদ্বেষের উদ্রেক করে নাই। কারণ তাহারা উভয়ে, স্বামী ও স্ত্রী, উভয়কে বিশেষরূপেই চিনিত। তখনকার দিনে স্বাধীন মুক্তসমাজে এ ভাবের দাম্পত্য জীবনে নিষ্ঠা খুব কমই দেখা যাইত। বিশেষতঃ বিদ্রার প্রতি প্রবীরের নিষ্ঠা অনন্যসাধারণ, একথা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী সবাই জানিত। তাই পুষ্পদত্তার বালিকাসুলভ সরল আত্মসমর্পণের লক্ষণসমূহ এবং তাহার নৈরাশ্যকর পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া বিদ্রার প্রাণে যেন কতকটা অনুকম্পার উদ্রেক করিয়াছিল। এইভাবে প্রায় চার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। প্রবীরকে একবার দেখিবার জন্য সে ছটফট করিত এবং সেই জন্যই, যে সময়ে প্রবীর নিজ গৃহে আসিত প্রায় সেই সময়ে পুষ্পদত্তাও আসিয়া উপস্থিত হইত। কোন কোন দিন পথেও দেখিতে পাইত। যে পথ দিয়া প্রবীর রাজপুর হইতে ঘরে আসিত সেই পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। এইভাবে আসক্তি তাহার উত্তর উত্তর বাড়িতেছিল।

নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া সে যখন কোন মতে প্রবীরকে তাহার দিকে টানিতে বা তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিল না, তখন সে প্রবীরের সঙ্গে ন্যায় যুক্তি ও শাস্ত্র বিধি তাহার পক্ষে, এইটি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। অথচ প্রবীর এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে তাহার আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইতে দেয় নাই। ব্যবহার দ্বারাই তাহার ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এ নারী অত সহজে নিরস্ত হইবার নয়, এমনই তাহার স্বভাবের গঠন,—কোন কর্ম্মে সে নিরাশ বা বিফলতায় বিশ্বাস করে না। নিরুদ্যম কাহাকে বলে সেটা এই মেয়েটির অজ্ঞাত। নিঃসঙ্কোচে সে প্রবীরকে একদিন শাস্ত্রের বচন শুনাইয়া দিল; পুত্রের জন্যই যখন ভার্য্যাগ্রহণ এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যখন সন্তান লাভের সম্ভাবনা নাই তখন দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ শাস্ত্রবিধান, না হইলে পরলোকে নরক ভোগ হইবে। উত্তরে সেদিন প্রবীর তাহাকে বুঝাইয়া দিল শত জন্ম নরকভোগে সে প্রস্তুত আছে, কখনই অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে না।

পুষ্পদত্তা ভাবিল, এ কেমন অদ্ভুত পুরুষ, আমার মধ্যে কি এমন কিছুই

নাই, যাহাতে প্রবীর আকৃষ্ট হইতে পারে ?—কিন্তু ইহাতেও সে নিরস্ত হইল না বা তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ইহার পর হইতেই প্রবীরের মনে এই নির্লজ্জ নারীর প্রতি কতকটা উপেক্ষাভাব উৎপন্ন করিল এবং বিদ্রা যেন ইহার মধ্যে একটা ভয়ের আভায পাইল।

প্রতিবেশিবর্গও প্রথম প্রথম পুষ্পদত্তার এই ব্যবহারে কোন অন্যায় অথবা অস্বাভাবিক কিছু দেখে নাই। প্রবীরের মনোমত হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোন বাধাই ছিল না। তখনকার সমাজ উদার এবং যথার্থই স্বাধীন ছিল বরং পুত্রলাভের জন্য পুষ্পদত্তাকে গ্রহণ করিলে প্রবীরের আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই আন্তরিক সুখী হইত। যাহা হউক, নানা প্রতিবেশী, আত্মীয় লোকের মতামত শুনিতে শুনিতে বিদ্রা দেবীর মনে একটু সন্দেহ জাগিয়াছিল। পুষ্পদত্তার প্রতি প্রবীরের যথার্থ মনোভাবটা কেমন উহা জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। এই সময়েই মহামাত্যের আদেশে প্রবীর কলহনগড়ি যাইতেছে, এই সংবাদ বিদ্রার কানে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য ব্যাপার, পুষ্পদত্তাও বিদ্রার কাছে প্রবীরের যাইবার সম্বন্ধে যা কিছু জানিত, এমনকি পথের কথা, স্থলপথে বা নৌকায় জলপথে যাইতে হয়, কয়দিনের পথ ইত্যাদি—এই সকল খুঁটিনাটি সংবাদ লইতে লাগিল। ইহাতে বিদ্রার মনে সহজেই ধারণা হইল মহারথের ঐ যাত্রার সঙ্গে নিশ্চয়ই ইহার গূঢ় সম্বন্ধ আছে,—পুষ্পদত্তা নিশ্চয়ই মহারথের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইবার জন্যই ব্যাকুল এবং এই কাবণেই রামবানকে তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহা হউক, কলহনগড়ি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পুষ্পদত্তার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, বিদ্রা জীবিত থাকিতে প্রবীরের মনের মধ্যে তাহার স্থানলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এখন হইতেই সে ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারশূন্য হইয়াই নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড়ই জঠিল কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিল।

তেইশ

যাহারা পুষ্পদত্তার যথার্থই আপনজন, অবশ্য তাহার জননীই সর্ব্বাগ্রগণ্য তাহারা ক্রমে ক্রমে নিতান্তই একটা অঘটন কিছু আশা করিতেছিল। বিশেষতঃ সম্প্রতি কলহনগড়ি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বোধ হয় তাহার মনের অবস্থাও ঠিক ছিল না। আজ তাহার জননী তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া একটু ভীত হইল। ভালবাসা, স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যবহার সবারই দেখা যায়; বিশেষতঃ সবাই জানে, নারীপক্ষের আত্মনিবেদন প্রায়ই গোপনই থাকে—সাধারণতঃ নিজ নিজ প্রণয় সম্বন্ধ, নারীপক্ষের সুখ-দুঃখ আনন্দবেদনা বাহিরের অতীব ঘনিষ্ঠ সখী ব্যতীত কেহই টের পায় না। কিন্তু এ এক পৃথিবী ছাড়া মেয়ে, এ যেন তাহার প্রেমের আস্পদকে পাইবার জন্য এমনই কাণ্ড করিতেছে—দিন দিন যাহা তাহার প্রিয়জনের মহা অশান্তির কারণ হইয়াই উঠিতেছে। অথচ সে কাহাকেও মনের কথা জানায় না, কাহারও সহিত পরামর্শ নয়; একাকী একদিকে নৈরাশ্য প্রভৃতি সকল কিছুই ভোগ করিতেছে;—আর অন্যদিকে প্রতিবাদী জগৎ। সে একাই যুদ্ধ করিতেছে। তাহার প্রিয়জন নীরবে দেখিতেছে, আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, বেদনা তাহার মধ্যে কোন সময়েই স্থান পাইতেছে না।

আজ প্রভাত হইতেই পুষ্পদত্তার চাঞ্চল্য দেখিয়া অবশেষে তাহার জননী স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, তোর হলো কি, অমন করছিস কেন?

কোন উত্তর নাই—।

জননী বলিল,—সাত আটদিন কাটিয়ে এলি। ছটফট্ করে গেলি আবার ফিরে এলি মুখ কালো করে; তুই যা মনে করে ওর পিছনে ঘুরে মরচিস তা কখনই হবে না। পাঞ্চি আর বিবাহ করবে না।

পুষ্পদত্তা এখনও ভাবিতেছে বোধ হয় তাহার চেষ্টার কোথাও ত্রুটি আছে, তাই হইতেছে না। এখনও সে আশা রাখে। এ যোগাযোগ ঘটাইতে সে বড় কম কিছু করে নাই, সবাই জানে। তাহার বিশ্বাস, এখন চেষ্টার শেষ হয় নাই। তাহার ধাত্রীর কথাটা শুনিয়াই সে প্রথমে চমকিত, পরে অবাক হইয়াই বলিল, কেন করবে না, তুই কি জানিস ওর মনের কথা?

ওলো হতভাগী, তাহার কথার উত্তরে মা বলিল,—তুই আমার কথা তো শুনবি না, বোলে কি হবে তোকে? শুনিয়া যেন কাতর কণ্ঠে কন্যা বলিল,—

বল্ মা, তুই কি জানিস বল আমায়, লুকিয়ে রাখিস নি।

ওর একজন আপন লোক, জ্যোতিষী, তা ছাড়া ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে;—শুনেছি তাকে একেবারে খুলেই বলে দিয়েছে,—তুমি সন্তান লাভের আশা কোরো না, তোমার ভাগ্যে সন্তান নেই। সেই জন্যই প্রবীর বিবাহ করবে না।

শুনিয়া পুষ্পদত্তা ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ধাত্রী ভাবিল,—মলো, মেয়েটা পাগল হল নাকি!

পুষ্পদত্তা বাহির হইয়া এক প্রতিবেশীর ঘরে উপস্থিত হইল, তাহার নাম পিণ্ডা, তাহার স্বামীর একখানা রথ আছে। পিণ্ডাকে বলিল, তোদের রথখানা নিয়ে একবার আমি যাবো তাই বলতে এলাম। সে প্রশ্ন করিল, কোথা যাবি তুই?

রাজপুরীতে আর্য্য মহামাত্যের কাছে যাব বড় দরকার—

সে নিজেই রথ চালাইয়া চলিল। চাবুকের চোটে ঘোড়াকে ধীর গতিতে চলিতে দিল না। কিন্তু রাজপুরীর দিকে না গিয়া বিপরীত পথেই চলিল। এইরূপ প্রায় একদণ্ড কাল মধ্যে সে দুর্গাকুণ্ডের ধারেই আসিয়া পৌছিল। রাজপথের নীচে একটা গাছের কাছে রথখানি রাখিয়া সে সামনের দিকে চলিতে লাগিল এবং পথের উপরে উঠিয়াই সম্মুখে দেখিল এক বিরাট ভৈরব মূর্ত্তি,—একহাতে কপাল পাত্র অপর হাতে ত্রিশূল, ধীরে ধীরে আসিতেছে। ইহাকে দেখিয়াই পুষ্পদত্তা দ্রুত পাদক্ষেপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

জলদ গম্ভীর স্বরে সেই ভৈরব বলিল, কেন? ভৈরবের লোলুপ
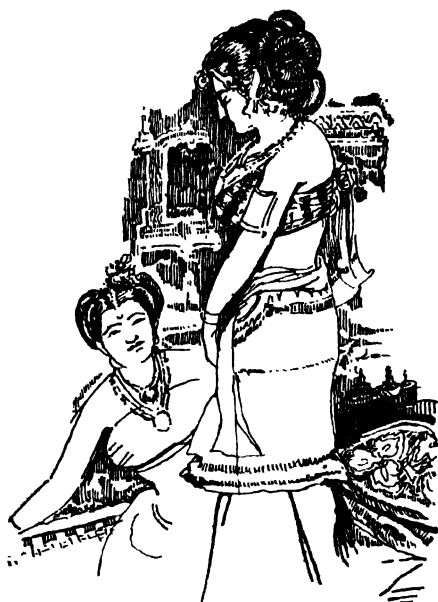
রক্তবর্ণচক্ষু, পুষ্পদত্তার মুখের উপর সেই যে পড়িল, উহা আর কোন দিকেই নড়িল না; সেই তীব্র দৃষ্টি মুখের উপরে রহিয়াই গেল। পুষ্পদত্তা গ্রাহ্য করিল না, বলিল, আপনার আশ্রমে চলুন, পথে কেন, চলুন। নিকটেই তাহার আশ্রম।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যায় পুষ্পদত্তা ফিরিয়া আসিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। পাটলীপুত্রের সর্ব্বজন-পরিচিত প্রাড়বিবাক আর্য্য দশকর্ণদেব, আজ আর্য্য মহামাত্যের গৃহে আসিয়াছেন। দূত, চর, গুপ্তচর যাহারা চাণক্য-দেবের দর্শনাভিলাষী, তাহারা এখন অপেক্ষায় রহিল এবং যতক্ষণ তিনি মহামাত্যের কক্ষে অবস্থান এবং চাণক্য-দেবকে সম্ভাষণ করিবেন।

প্রাড়বিবাক প্রায় চারি দণ্ড মহামাত্যেব কক্ষে ছিলেন, সারাক্ষণ তাঁহারা নিগূঢ় বাক্যালাপেই রত ছিলেন। ধর্ম্মাধিকরণ দশকর্ণ যখন যাইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর্য্য মহামাত্যও আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। প্রাড়বিবাক হাসিয়া বলিলেন,—আশ্চর্য্য বিধাতার এই সৃষ্টি,—আমার এই যাট বৎসর জীবনে এ ধাতুর নারী দেখিনি। উত্তরে মহামাত্য বলিলেন, যদি কৌশলে বর্ত্তমান উপলক্ষ থেকে ওর মনকে সরানো না যায়, তাহলে ওর ভবিষ্যৎ অতীব দুঃখজনক। দশকর্ণ বলিলেন,—অবশ্য যদি তা সম্ভব হয় তো আপনার দ্বারাই হবে;—তবে কি করে ঘটাবেন? সেই তো সমস্যা।

অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়েই ওকে পথে আনতে হবে। ও এখনও একটা অদ্ভুত কল্পনা আর আশার মধ্যে রয়েছে,—আশ্চর্য্য নারী প্রকৃতি! যাই হোক, এখন প্রমাণগুলি আপনি দ্বিপ্রহরের মধ্যে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর নমস্কারান্তে উভয়েই পৃথক হইলেন।

সেইদিনই আর্য্য বিষ্ণুশর্ম্মা যথাকালে পুষ্পদত্তাকে স্মারকলিপি পাঠাইলেন, পরদিন তাহাকে যে সময়ে আসিতে হইবে, সেই সময়ও স্থির করিয়া দিলেন।

সপ্তাহে একটি বার ছিল যেদিন মহামাত্য আর্য্যদেব রাজকীয় কর্ম্ম হইতে পৃথক থাকিতেন। সে দিনটি বৃহস্পতি বার।
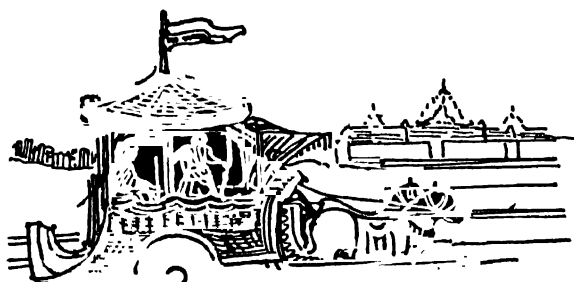
চব্বিশ

আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন যুবরাজ তক্ষশীলা প্রান্তে যাইবে, একথা এখন কুসুমপুরের আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। সুতরাং বিদ্রাও ভালই জানে যে, অদ্রী—তাহার ভাই ও প্রতিষ্ঠানের যুবরাজ বিক্রম, এই দুই জনে বিন্দুসারের পার্শ্বচর ও পরামর্শদাতা হইয়া যাইতেছে। বিদ্রার সাধ হইল একদিন বিক্রমের সঙ্গে অদ্রীকে আমন্ত্রণ করিয়া ঐদিন একটি উৎসব আনন্দের আয়োজন করিবে। এ বিষয়ে প্রবীরের সহিত পরামর্শ হইয়া গেল। প্রবীর বলিলেন,—যদি তুমি জেদ ধরো, তাহলে আমাকেই যেতে হবে, না হলে আমার মনে হয় খণ্ডীকে দিয়েই কাজটা ভালই হতে পারতো; এখন খণ্ডীর সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় হয়েছে।

বিদ্রা বলিল,—তা বেশ তো খণ্ডীকেই পাঠানো যাবে,—সেইই বেশ হবে। ঘটনাচক্রে খণ্ডী বর্ম্মা সেই প্রাতে তখনই, রণসাজে উপস্থিত হইয়া উভয়েরই আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

কোথায় চলেছ রণসাজে? প্রবীর জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিয়া খণ্ডী বলিল, —আজ আমার পালা যে,—প্রাচীর পরিক্রমার দিন।

সৈন্য বিভাগের নিয়ম ছিল বৃহৎ নগর-প্রাচীর রক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, প্রতি পক্ষে একজন গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী বা সেনাপতি এই বিশেষ কর্ম্মটি নিদর্শন করিবেন। প্রথম দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া, চারজন সৈনিক সঙ্গে তিনি ঐ প্রাচীরের উপর প্রশস্ত পথে অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া প্রত্যেক দ্বার, প্রহরাসন প্রত্যেক ঘাঁটি-তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা লক্ষ্য করিয়া প্রধান সেনাপতির নিকট জানাইবেন। পর্য্যায়ক্রমে সেই কাজ আজ খণ্ডী বর্ম্মার। সারা দিনটাই ঐ কাজে তাঁহার কাটিবে;—সঙ্গে তাঁহার প্রয়োজনীয় যা কিছু লইয়া ভৃত্য ভট্টদাসও যাইতেছে। রথও প্রস্তুত, উত্তর প্রান্তে তাঁহাকে লইয়া যাইবে।

অদ্রীকে নিমন্ত্রণের কথাও ঐ সময়ে উঠিল। খণ্ডী বলিল,—দিবা তৃতীয় প্রহরের শেষে অথবা চতুর্থ প্রহরের মধ্যভাগেই আমার কাজ হইয়া যাইবে। তারপর শিবিরোদ্যানে যাইতে পারি,—বেশ ভালই হইবে, আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐখানেই কাটানো যাবে। যাই হোক, এখন উভয়কেই প্রণাম পূর্ব্বক খণ্ডী

চলিয়া গেল। রথে বসিয়াছে এমনই সময় গণপতের ভৃত্য আসিয়া তাহার হস্তে এক‘খানি লিপি সমর্পণ করিল। তৎক্ষণাৎ উহা পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া বোধ হয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার তাহাকে নামিতে হইল। প্রবীরের কাছে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই প্রশ্ন হইল,—আবার ফিরলে যে ?

গণপদ্দামোদর লিখেছে আমাকেও যুবরাজের সঙ্গে বোধ হয় একজন পার্শ্বচর হয়ে তক্ষশীলায় যেতে হবে। সে মহাবলাধিকৃত বলভদ্র নৃসিংহ দেবের কাছে

শুনেছে। আমি এখন যেতে চাই না; কোন রকমেই এ ব্যবস্থা রহিত করতেই হবে, তাই আপনার কাছেই এলাম।

প্রবীর বলিলেন, কার আদেশে এটা ঘটছে, নির্ব্বাচন করলেন কে? শুনিয়া খণ্ডী বলিল, ঠিক জানিনা, তবে মহাবলাধিকৃতই এই ব্যবস্থা করবেন বোধ হয়।

ঠিক জানতে হবে আদেশটা স্বয়ং মহারাজ দিয়েছেন অথবা মহামাত্যের বিধান?

খণ্ডী বলিল,—সেটি অনুসন্ধান করতে হবে। প্রবীর বলিল,—যদি আর্য্য মহামাত্য ব্যতীত অন্য কাহারও বিধান হয় তাহলে মনে হয় তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। যাই হোক এখনও সময় আছে।

বিদ্রা চিন্তিত মনে জিজ্ঞাসা করিল;—তোমায় আবার ওদিকে যেতে হবে না তো,—হুকুম হলেই হলো। প্রবীর বলিল,—আমার আপত্তি নেই, আমার বরং ভালই লাগবে। বিশেষতঃ তোমায় নিয়ে এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই যেতে পারি। তবে এটা জেনে রেখো, যে কয়জনকে এখান থেকে সরানো যাবে না তার মধ্যে আমি একজন। বিদ্রাঙ্গীর মনটা শান্ত হইল, খণ্ডীও চলিয়া গেল।

সারাদিন বিশাল নগর-প্রাচীরের উপরে কার্য্যকালটা অশ্বারোহণে কাটাইয়া খণ্ডী বর্ম্মা প্রায় চতুর্থ প্রহরের মাঝামাঝি তার কর্ম্ম শেষ করিল এবং প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্তে নামিয়া অশ্বারোহণেই শিবিরোদ্যানের পথে যাত্রা করিল। সেখানে পৌছিয়া দেখিল, দুই বন্ধু এইমাত্র ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন;—ভৃত্য শেখর, একজন অশ্বশালার বিচারকের হাতে খণ্ডীর ঘোড়া রাখিয়া খণ্ডীকে অদ্রীর কক্ষে লইয়া গেল। বিক্রমও সেইখানেই ছিল। তাহাদের মধ্যে সখ্যভাবের অভ্যর্থনা এবং কুশলবাক্য আদান-প্রদান হইয়া গেলে খণ্ডী, অতি আদরেই,—দুই বন্ধুর, বিদ্রার স্থানে নিমন্ত্রণের বার্ত্তা পৌছাইয়া দিল;—উহাতে আবার কিছুক্ষণ একটা আনন্দময় বাক্যপ্রবাহ চলিল। এই ভাবে যখন তাহার বার্ত্তাবহের কাজ শেষ হইল তখন খণ্ডী গাত্রোত্থান করিল। অদ্রী ও বিক্রম উভয়েই তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আসিয়া সোপান অবতরণের পর খণ্ডী বিদায় প্রার্থনা করিল,—বিক্রম লক্ষ্য করিল, খণ্ডী অদ্রীর দক্ষিণ করতল নিজ করলগ্ন করিয়া যেন একটু অন্তরাল খুঁজিতেছে বুঝিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এখন খণ্ডী অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাহার দক্ষিণ হাতখানি অদ্রীর কাঁধে রাখিয়া বলিল,—অদ্রী, এক বিষয়ে আমায় একটু সাহায্য করবে? সত্যই আজ আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

অদ্রী কৌতূহলী হইলেও সংযতবাক্ ;—একটু চিন্তিত ভাবেই বলিল,—একটু খুলেই বলুন, এমন করে এই ভাবে বললে ভয় হয় যে! খণ্ডী বলিল, শোনা গিয়েছে যে, যুবরাজের সঙ্গে সৈন্য বিভাগ থেকে যেসব ব্যক্তি তক্ষশীলা যাবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছে আমার নামটি নাকি সেই তালিকায় আছে। এখন এ বিধানটি কার, মহারাজের অথবা আর্য্য মহামাত্যদেবের। এই তথ্যটুকু নির্ণয়ের দায়িত্ব আমি তোমার ঘাড়েই চাপাতে চাই। তোমরা, বিশেষতঃ তুমি মহারাজের এবং মহামাত্যের বড়ই প্রিয় হয়েছ ; এ খবর এখন এ-রাজ্যে আর গোপন নেই।

অদ্রী একটু সঙ্কুচিতভাবেই বলিল,—আজ বৈকালে না হয় কাল বৈকালে একবার তাঁর কাছে যেতে হবে বোধ হয়,—কখন সাক্ষাৎ হবে এ-খবর তিনিই পাঠাবেন। আমি চেষ্টা করবো,—সেটা বেশী কথা নয়, তবে কিভাবে তাঁর কাছে ঐ প্রশ্নটি উপস্থিত করবো,—সেইটিই কথা। আপনার পক্ষ থেকেই আমি জানতে চাইছি এই রহস্যটি গোপন করতে হবে। আচ্ছা, ধরুন যদি এটা তাঁর বিধান না হয়? খণ্ডী বলিল, তাহলে আমি রক্ষা প্রদর্শন করতে পারবো।

পথে ফিরিতে খণ্ডী বর্ম্মার মধ্যে বিবেকের বাণী ফুটিয়া উঠিল। শুধু কুসুম-তোরণের অলোকার জন্য এবং ঐ আড্ডাধারী সঙ্গীগণের মোহ্ আমায় এই মহৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত করিতেছে,—না হইলে নিজ ভবিষ্যৎ অগ্রগতির এতটা প্রশস্ত পথ আর কোন সূত্রে কি খোলা পাইব?—এতদিনের সঙ্গ—এতদিনের প্রভাব,—আমার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, এ আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়। তবে, যদি কাটাইতে পারিতাম!

আর অদ্রী ভাবিতেছে, এখানে এমন কি মহার্ঘ্য বস্তু আছে যার জন্য খণ্ডী এতটা মহান সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিতেছে? তারপর ভাবিতেছে, এটি এই ভূমির দোষ—কেবল ভোগ-বিলাস আরামপ্রিয়তাই রাজ অনুগ্রহের মূল সূত্র। মহামাত্যদেব ঠিকই বলিয়াছিলেন, শান্তির সময়ই মানুষ স্থূল আরামপ্রিয় হইয়া পড়ে।

রাজদর্শনের পর প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। অদ্রীর অনুমান বৃথা হইল না। পরদিন আর্য্য চাণক্য দেবের সন্দেশবাহী আসিয়া জানাইয়া গেল যে, আগামীকল্য মহামাত্য তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

এবার মহামাত্য এই বান্ধবের সঙ্গে অতীব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৎ ব্যবহার করিলেন। প্রথমতঃ মহারাজের নির্দ্দেশে তাহারা যে কুমারের সহায় হইয়া তক্ষশীলা প্রান্তে

যাইতে স্বীকার করিয়াছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। কথা প্রসঙ্গে একটী কথা শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়াবিষ্ট হইল—মহামাত্য বলিলেন, তোমরা এ ভূমির নয়, তোমরা নিজ উদ্দেশ্যে দৃঢ় বলিয়াই এই সুযোগের মূল্য বুঝিয়াছ কিন্তু এই পাটলীপুত্র রাজধানীর সৈন্য বিভাগের কয়েকজনকে বিন্দুসারের সহকারী হইতে এবং উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া তক্ষশীলাপ্রান্তে যাইবার জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ মহৎ সুযোগ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কুসুম-তোরণের মোহ কাটাইতে চাহে না।

আশ্চর্য্য, ইনি কি ইতিমধ্যে খণ্ডীর অনিচ্ছার খবরও পাইয়াছেন নাকি? অদ্ভুত এ মানুষটি। এখন অদ্রী কি করিয়া খণ্ডীর প্রশ্ন উত্থাপন করিবে? বুঝা তো কঠিন নয়, এ নির্ব্বাচন তালিকা মহামাত্যেরই সৃষ্টি। হয়তো ঐ যুবক বীরগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তিনি উহাদের স্থানান্তরিত করিতে চাহেন। তাহারা ইহার মধ্যে কল্যাণের আভাস পাইতেছে না।

যাহা হউক, তিনি এখন এই নবীন কর্ম্মোৎসাহী যুবকদ্বয়কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে আনিয়া বিন্দুসারের স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন, মহারাজ স্বয়ং এবং রাজমাতা মুরা দেবীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কুমার বিবাহিত হয়েই সস্ত্রিক তক্ষশীলাপ্রান্তে যাবেন, বলতে কি আমারও এ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বিন্দুই এর প্রবল প্রতিবাদ করেছে। তবে ইতিমধ্যে মহারাজ বিশেষভাবেই চেষ্টা করছেন যাতে বিন্দুর উদ্বাহ সংস্কার এই ফাল্গুনের প্রথমে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। অসীম জেদের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কর্ম্মপ্রবৃত্তির পক্ষপাতি নই, সেই জন্য আমি ওটা পিতা ও পুত্রের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার অন্তরের কথা না জেনেই বিন্দু তার জেদ বজায় রাখতে আমারই সাহায্য চাইছে, আমার প্রভাবে তার জেদটা বজায় থাক, আমি কি করে তা সহ্য করব যদি তার মধ্যে কোনদিকেই কল্যাণ দেখতে না পাই। আচ্ছা অদ্রী, তুমি তো এখন বিন্দুর বান্ধবের মধ্যে গণ্য হয়েছো, তুমি কি করতে যদি বিন্দু তোমার সাহায্যে এই বিবাহের লগ্ন এক বৎসর দীর্ঘ করতে চাইত?

আমায় আপনি বিপন্ন করছেন, যথার্থ কল্যাণ কোন্ পথে তা আপনাপেক্ষা কে জানে—এ রাজ্যে আপনারই কর্ম্ম ভ্রমশূন্য, অন্ততঃ আমার এইটাই ধারণা।

মহামাত্য প্রসন্নমুখে বলিলেন,—তবে একটা গোপনীয় কথা বলি শুন,—বিন্দুর বিবাহ, তক্ষশীলাপ্রান্তে যাত্রার আগে, আর্য্যা মাতা মুরা দেবীও চান,—

বিন্দুর মাতা বিন্দুভদ্রা মহারাণীও চান, আমিও চাই, মহারাজও চান কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ সম্রাটের মন রাখতে কেউই সরল সত্য আশ্রয় করে স্পষ্ট কথাটি বলবেন না।

তা বলে আপনিও ঐ দলে পড়তে চান; আমার তা বিশ্বাস হয় না। আপনার অন্য কথা আছে যা আমাদের জানবার সাধ্য নাই; মহামাত্য অদ্রীর কথাটি শুনিয়া অতীব প্রসন্ন হইলেন,—বলিলেন, অদ্রী, তোমার কাছে আমি অনেক আশা করি,—আমি এমনই একটি অবস্থার আবির্ভাব আশা করছি যার চাপে বিন্দু নিজেই এই উদ্বাহ সংস্কারে সংস্কৃত না হয়ে তক্ষশীলা প্রান্তে যেতেই চাইবেন না—

অদ্রী বুঝিল, এ অবস্থার সৃষ্টিকর্ত্তা মহামাত্য স্বয়ং এবং তাহাদের যাত্রার পূর্ব্বে আরও কিছু গুরুতর ব্যাপার দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত। এখন মহামাত্যের কাছে আরও কিছু রাজধর্ম্ম সম্পর্কীয় কথা শুনিয়া উভয়েই প্রণত হইল এবং বিদায় গ্রহণ করিল।

আমাদের দুই বন্ধু, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিবার সময় লক্ষ্য করিল যে, প্রথম কক্ষের মধ্যে ক'জন অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা বাহির হইবামাত্রই একজন ক্ষিপ্রপদে চাণক্যদেবের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অদ্রী ও বিক্রম চত্তর হইতে নামিয়া পদব্রজেই ধীরে ধীরে উদ্যানপথ অতিক্রম করিতেছিল,—দু'জনে আজ বিন্দুসার সম্বন্ধে যাহা শুনিল,—সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়া চলিতেছিল,—উদ্দেশ্য তোরণ অতিক্রম করিয়া অশ্বারোহণ করিবে; কারণ, তাহাদের বাহন বাহিরেই রাখা ছিল।

রাজপুরী হইতে বাহির হইবার পথে যে মধ্যস্থ তোরণ সেথা যাত্রীদের রথ অশ্ব প্রভৃতি অপেক্ষায় থাকে। উভয়েই সেই তোরণদ্বারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেখিল,—এক অনিন্দ্যনীয়া সুন্দরী, ক্ষিপ্রভাবে রথ হইতে নামিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে দ্রুতপদে তাহাদের অতিক্রম করিয়া গেল। এই অপরূপা উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রাজধানীতে আসিয়া অবধি তাহারা মগধ সুন্দরী কম দেখে নাই, বহু চিত্তহরণকারিণী দেখিয়াছে, কিন্তু নারীরূপের মধ্যে এভাবের বিজলীপ্রভা আগে দেখে নাই;—বিশেষতঃ মেয়েটি, আমাদের সংযতচিত্ত কোশলবীর অদ্রী-হরিকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া গেল। নারীরূপের মধ্যে আকর্ষণ তাহার জীবনে এই প্রথম। যখন সেই বরবর্নিনী অদ্রীকে অতিক্রম করিল তাহার বোধ হইল যেন তাহার সমগ্র চেতনাকে সবলে একটা আঘাত করিয়া গেল। অথচ

সে একবার মাত্র সহজ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকেই দেখিয়া গেল। ইহার অধিক আর কিছুই হয় নাই। উভয়েই ফিরিয়া দেখিল, সে যেন এক নিঃশ্বাসে, অতি দ্রুত কয়েক ধাপ উঠিয়া আর্য্য মহামাত্যের গৃহচত্তরে পৌছিল। তাহাদের দিকে অর্থাৎ পশ্চাতে একবারও ফিরিয়া দেখিল না।

আর্য্য চাণক্য মহামাত্যের সঙ্গে এই ষোড়শীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এই চিন্তা উভয়ের মধ্যেই একবার উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। কেহ কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না, উভয়ের মনের কথা মনেই রহিল। তোরণে অশ্বরক্ষক অশ্ব লইয়া তাহাদের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অশ্বে আরূঢ় হইল এবং ধীরে ধীরে সিংদ্বার পার হইয়া পথে পড়িল। মনের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ঠিক বলা যায় না, তাহাদের অশ্ব সেই পথে চলিতে লাগিল যে পথে তাহাদের কোশলস্থ নকুল রট্টের গৃহ। ইহা লক্ষ্য করিয়া অদ্রী বলিল,—
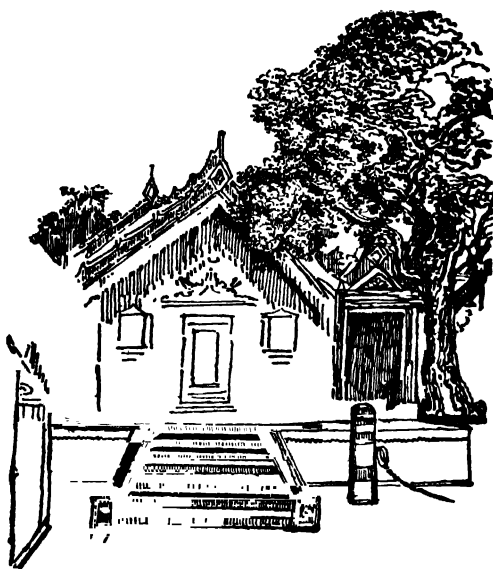
চল না বিক্রম, একবার রট্ট পরিবারের ওখানে ঘুরিয়া আসা যাক, আমরা প্রতিশ্রুত আছি। ও একটা দায় বিশেষ, মনে নেই ?

বিলক্ষণ মনে আছে, বিশেষতঃ ঐ যে তোমার অভিমানিনী ভামা গিন্নী আছেন, তাঁকে ভোলবার যো আছে কি ? চলো বন্ধু যাওয়া যাক। অদ্রী বলিল,—আমরা আজ রাজপুরীতে যে ভামাকে দেখে এলাম তারপর এই সত্যভামা আমাদের অদৃষ্টে কি ফল দেবেন কে জানে,—বিশেষতঃ নকুলের সঙ্গে তার যেন অহী সম্পর্ক,—আমাদের গ্রাহ্য করবে কিনা কে জানে !

কথায় কথায় তাহারা নকুলের সুন্দর গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই তাহারা দেখিল, প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে তাহাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত

সন্তান দুটি মনের আনন্দেই খেলা করিতেছে। তাহারা অবতরণ করিয়া এবার ছোট্ট তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, ভদ্র নকুল রট্ট। ঘরে আছ কি ?

তাহার সন্তান দুইজন বলিল, ঐ যে বাবা আসছে,—বলিয়া হাত দেখাইল। অবাক বিস্ময়ে দুই বন্ধু সেদিকে দেখিল। নকুল আসিতেছে, বটেই তো—রাজপথ অতিবাহন করিয়া আসিতেছে। কাঁধে বাঁক,—দুটি ঝাঁপা দুদিকে পরিষ্কার কদলী পত্র ঢাকা। শ্রমজলে মাথার পাগড়ির নীচের দিকটাও ভিজিয়া উঠিয়াছে। সে মাননীয় অতিথিদ্বয়কে তাহার গৃহে দেখিয়া দ্রুতপদে আসিয়া পৌছিল এবং গৃহ-চত্বরে তাহার বোঝা রাখিয়াই ঘর্ম্মস্নাত কলেবরেই দুইজনের পাদবন্দনা করিল।

অদ্রী তাহার কুশল প্রশ্ন করিবার পর বলিল, ব্যাপার কি রট্ট! তোমার ঝাঁপায় তো অনেক মাল দেখছি,—ভারীও কম নয়, কি আছে এর মধ্যে ?

রট্ট সবিনয়ে নিবেদন করিল, নগর প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একস্থানে তাহার একখণ্ড জমিতে, ফলমূল শাকসব্জী উৎপন্ন হয়। সেই বাগানখানিই তাহার প্রধান অবলম্বন। সেখানে তাহার দুইজন মালীও আছে। শুধু তাহাই নয় ; মহাকাল মন্দিরের পার্শ্বদিকে পথের উপর তাহার একখানি বেশ বড় ফুলের দোকানও আছে। তাহার বাগানে সব রকমের ফুলও হয়, কোন ঋতুতে তাহার ফুল বন্ধ যায় না। এই সকল বার্ত্তা স্বদেশীয় স্বামীগণের গোচর করিয়া শেষে বলিল ;—হাটবারের পূর্ব্বদিনে সেখানে সকালেই চলে যাই, সেইখানেই খাওয়া দাওয়া করি,—তারপর যা কিছু তৈরী থাকে ক্ষেত থেকে সেগুলি তোলা গোছানো শেষ করে সন্ধ্যার আগেই ঝাঁপায় ভরে নিয়ে আসি। কালকের সকালের হাটে এর আর

কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সবই শেষ হয়ে যাবে ;—অদল বদল করে ঘরে

ব্যবহারের অনেক কিছুই আসবে। ঘরের জন্যও কিছু কম থাকবে না।
এই ভাবে নকুল তাহার উপজীবিকার সকল খবরই প্রভুদের গোচর করিয়া

তাহার গৃহদ্বার পানে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর বেশ বড় গলায় আরম্ভ করিল,—

ওগো গিন্নী, ও ভামা, বলি ওগো ঠাকুরাণী,—ঘরে আছ নাকি ?—সাড়াই নেই যে,—বলি সাড়াই নেই যে। এতটা ভদ্র সম্ভাষণ সহ্য হলো না বুঝি,—প্রভুরা এসে দাঁড়িয়ে রইলেন যে—

উভয়েই বুঝিতে পারিল যে, রট্ট মহাজন গৃহমধ্যে ভামাকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভাষণেব প্রত্যেক শব্দের পর শব্দ তার অন্তরের উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া যেন পরদায় পরদায় চড়িতেছিল। ভামার কোন সাড়া না পাইয়া এবং এতটা ডাকাডাকিতেও যখন সাড়া দিল না তখন ঘরে না থাকাই সম্ভব, এই বুদ্ধি মাথায় আসিবার পর তখন বলিল, বোধ হয় ঘরে নেই, আমিতো ছিলাম না—নিশ্চিন্ত হয়েই পাড়ায় ভ্রমণে গিয়েছেন হতে পারে। একটু দাঁড়ান—দেখি। বলিয়া অলিন্দা হইতে নামিয়া পথের দিকে আসিতেই দেখা গেল ভামা হাতে এক পাত্র, মাথায় স্থালী, দ্রুতই আসিতেছে; পিছনে তাহার সন্তানটি, সে দ্রুত আসিতে পারিতেছে না দেখিয়া বাঁ হাতে তাহাকে কোলে লইয়া অতি সত্বর আসিয়া পৌছিল এবং প্রভুদ্বয়কে দেখিয়াই কিঞ্চিত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া বোঝা নামাইয়া নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। তারপর আর রাজ অতিথি-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইল না। নকুল এবং ভামার আতিথ্য পূর্ণপ্রাণেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের আয়োজন সরল হইলেও উপাদেয়, বাস্তবিক উপভোগ্য হইয়াছিল ভামার রন্ধন। পশুপক্ষী দুই মাংসই ছিল, বিশেষতঃ তাহাদের সম্পূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শিবিরোদ্যানে ফিরিতে রাত্র প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নকুল বরাবর নিজ স্থান হইতে তাহাদের পৌছাইয়া দিয়া গেল।
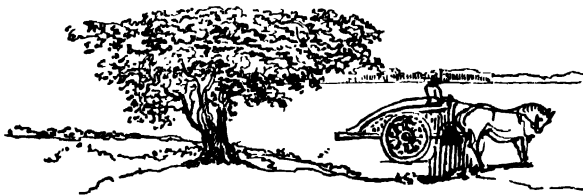
পঁচিশ

প্রতিষ্ঠানপুরের দুই বন্ধুকে চমকিত করিয়া যখন পুষ্পদত্তা আর্য্য মহামাত্যের আশ্রমে উঠিল তখন দিবা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। তাহার গতি দেখিয়া প্রহরী নিকটস্থ হইয়া জানাইল যে, তাহার প্রবেশ সম্ভব নয়। প্রধান কারণ, এখনই তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুষ্পদত্তা বলিল, আমারও আসবার কথা,—বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমায় বাধা দিতে পারো না—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। প্রহরী বলিল, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই আমি প্রবেশ করলাম, বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী, সোজা মহামাত্যের ঘরে প্রবেশ করিল, কোন বাধাই মানিল না। প্রহরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছিল, তারপর দ্বারপথে আসিয়া জানি না কি ভাবিয়া নিরস্ত হইল।

অতি দ্রুতই পুষ্পদত্তা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিল আর্য্য যাহার সহিত কথোপকথনে রত আছেন তাহাকে দেখিতে একজন বিশিষ্ট যুবা, বিদ্যার্থীর মতই। সে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া মহামাত্য

ব্যাপার বুঝিয়াই সেই যুবাকে বলিলেন,—ভদ্র বিরূঢ়, তুমি কিছুক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমি তোমায় স্মরণ করি।

তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ঐ যুবা যখন দ্বারপথে উপস্থিত হইল তখনই পুষ্পদত্তা তাহার দিকে আবার এমনই তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যাহাতে বিরূঢ় শর্ম্মার বুকটি কাঁপিয়া উঠিল। আর্য্য মহামাত্য বুঝিলেন যে, পুষ্পদত্তা তাঁহার এই গুপ্তচরটিকে ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিল। কিন্তু ঐ যুবার মনে সুন্দরীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি অন্যভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। সে বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ কুমারী মেয়েটি কে ?

এই যুবা, বিরূঢ় শর্ম্মার পরণে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয়, মাথায় উষ্ণিষ, পাদুকা পায়ে ছিল না, দেখিতে অনেকটা মিথিলার লোকের মতই। মুখে অল্প অল্প গোঁফদাড়ি, কপালে চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র, বুঝা যায়, সে ব্রাহ্মণ সন্তান। মুখ তাহার সুকুমার নহে। বিশৃঙ্খল ভ্রূ,—ক্ষুদ্র চক্ষু, তাহাতে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। দেহ মধ্যমাকার। হাতে রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত ডোর-বাঁধা পুঁথি কয়েকখান। তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমনই একটি বস্তু ছিল যাহাতে তাহাকে সরল সহজ মানুষ বলিয়াই মনে হয় না, বরং তাহার সঙ্গ পীড়াদায়ক, ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। বলিতে হইবে না যে, এ-ব্যক্তি মহামাত্যের গুপ্তচর। মহামাত্যের গুপ্তচরেরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে প্রথম হইল বিদ্যার্থী,—বিশেষ কর্ম্মে তাহাদের লাগানো হইত। দ্বিতীয় বণিক, তৃতীয় পরদেশীয় ভদ্র ব্যক্তি এবং চতুর্থ শ্রেণীর যারা তারা নারী। যুবতী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল বয়সের নারী, নানা অবস্থায় নানা ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিত।

এই যে বিরূঢ় শর্ম্মা ইহার পরিচয়, মৈথিলী বিদ্যার্থী,—

প্রহরী বলিল,—আপনার প্রশ্ন অসঙ্গত, আর্য্যদেব জানিতে পারিলেই আপনি দণ্ডার্হ হইবেন। যাহা হউক, আমি উহাকে চিনি না।

বিদ্যার্থী বলিল, তুমি চেনো নিশ্চয়ই, আমায় বলিতেছ না। ঠিক কিনা ? প্রহরী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার বিরূঢ় শর্ম্মার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তার পর বলিল,—আপনি কেমন কর্ম্মী, কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন জানেন না ? যেখানে কারো পরিচয় কাকেও জানাবার নিয়ম নাই।

সে যেন একজন বোকার মত পুনরায় বলিল,—তাহলে কেমন করে জানবো ?

এখানকার কারো কাছে সে উত্তর পাবেন না ; প্রহরী বলিল,—শুনিয়া সেই বিদ্যার্থী বলিল,—তাইতো, তুমি খুব বিচক্ষণ লোক তো, মনে হয় তুমি খুব

পুরানো কর্ম্মী? প্রহরী বলিল, এখানে বোকা লোকের স্থান কোথায় আর,—আপনিই কি এতটা বোকা, যতটা দেখাচ্ছেন,—বোধ হয় ঐ নারীরূপে মুগ্ধও হয়েছেন?

তা আমি অস্বীকার করতে পাবি না—

আপনি বিবাহিত,—আপনার পক্ষে এ অন্যায়—

হয়তো তাই,—কিন্তু ঐ রূপের আকর্ষণ উপেক্ষার বস্তু নয়।

এই জন্যই হয়তো আর আপনি আর্য্য মহামাত্যের বিশ্বাসের পাত্র থাকতে পারবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ত্যাগ করবেন।

তুমি কি তাঁকে কিছু বলবে আমার সম্বন্ধে?—

আমায় বলতে হবেনা, তিনি আপনিই তা বুঝতে পারবেন।

*   *   *   *

যেই মাত্র মহামাত্যের গুপ্তচর বাহির হইয়া গেল, পুষ্পদত্তা আর্য্য চাণক্যের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করজোড়ে দাঁড়াইলে চাণক্যদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠেই বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তুমি এখানকার রাজপুরীর নিয়ম ভঙ্গ করিলে কেন?

পুষ্পদত্তা নিঃসঙ্কোচেই বলিল, আমার ধৈর্য্য ছিল না, তা ছাড়া আমার তো এই সময়ে এখানে আসিতে আজ্ঞাই ছিল।

শোন পুষ্পদত্তা, তুমি এখন থেকেই আমার বিশ্বাস এবং এখানকার সকল কর্ম্ম-অধিকার হারিয়েছ। তোমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছ,—

—কেন? কিসে প্রভু?

—সম্রাটের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, একজন মহারথকে ঐ ভাবে বিপন্ন করবার চেষ্টা কি দণ্ডনীয় অপরাধ নয়?

—এক বৃদ্ধা জননী ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয় নাই, স্বজন নাই যে আমার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করবে, এ ক্ষেত্রে আমার কল্যাণ আমাকেই তো দেখতে হবে?

—একজন শক্তিমান রাজ কর্ম্মচারী, বিবাহিত, পত্নীপ্রেমে আবদ্ধ নিষ্ঠাবান পুরুষকে বারাঙ্গনার মত প্রলোভিত করবার চেষ্টা, বিচারে কত বড় দণ্ডনীয় অপরাধ, এটা কি তোমার জানা ছিল না?

—এতদিন যে পত্নীতে কোন ফল হলো না তখন কি তাঁর অপর পত্নী-গ্রহণের অধিকার নাই?

—সে বিচারের অধিকার তো সেই স্বামীর, যার পুত্রপিণ্ডের প্রয়োজন। তা ছাড়া দীর্ঘকাল পরে ফলবতী হয়, এমন নারীও ত আছে,—সুতরাং তাঁর স্ত্রী যে বন্ধ্যা, এখনও তো নিঃসংশয়ে সেটা প্রতিপন্ন হয় নি। তা ছাড়া—একটু থামিয়া মহামাত্য যেন বিশেষ একটু চিন্তিতভাবেই বলিলেন,—তা ছাড়া পুরুষও বন্ধ্যা হতে পারে!

এই কথাটি শুনিবামাত্র পুষ্পদত্তা আছাড় খাইয়া পড়িল মহামাত্যের পদতলে। তারপর আপনি উঠিয়া আর্য্যদেবের চরণযুগল ধাবণ করিতে গেল,—তিনি সঙ্কুচিত হইলেন। পুষ্পদত্তা বলিল,—সর্ব্বনাশ, আপনার এ যুক্তির কথা কি আর কেহ জানে? দোহাই আপনার—আমার—আমার অন্তরের এতটা কামনা ভঙ্গ করবেন না।

—আশার জাল বোনা তোমাদের স্বভাব কিন্তু সাফল্য বা বস্তুলাভ, সেটা প্রকৃতির নিজ অধিকারে—অনেক কিছু যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। তোমার ঐ সকল ষড়যন্ত্র কোন কাজেই আসবে না, আমি তোমায় সাবধান করছি, তুমি প্রবীর বর্ম্মাব উপর লোভ করো না।

—প্রভু, আমার হৃদয় যদি বুঝতেন প্রণয়াস্পদের আকর্ষণ কতটা অচ্ছেদ্য—

বাধা দিয়া—

—দেখ পুষ্পদত্তা! আমায় এ ভাবে বুঝিয়ে তোমার পক্ষ সমর্থনে প্ররোচিত করতে পারবে না। প্রণয় যথার্থ একপক্ষে হয় না; যার জন্য তুমি আজ এতটুকু উচ্ছৃঙ্খল, তার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠভাবে অন্তরের পরিচয় নেই;—আদৌ সে তোমায় চায় না। তুমিই তাব কর্ম্মজীবনের শত্রু, ক্ষিপ্ত কুকুরের মতই কলহনগড়ি পর্য্যন্ত ধাওয়া কবেছিলে কিন্তু তার তিলমাত্র স্নেহ আকর্ষণ করতে পারোনি। একে মোহ ছাড়া আর কি বলা যায়? —সেই সাধ্বী বিদ্রাদেবীর প্রতি তোমার একটা প্রবল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসায় প্রবৃত্ত কোরে তোমায় আজ মনুষ্যত্বের অধঃস্তরে নামিয়ে দিয়েছে—সদসৎ বিচার-শক্তিও তুমি হারিয়েছ। যাই হোক, এখন তুমি ঐপাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করো আমি একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় শেষ করে নি।

পুষ্পদত্তা বিষণ্ণ বদনে চলিয়া গেলে মহামাত্য সঙ্কেত করিলেন। তখনই তুইজন রাজপুরুষ এক ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি ভৈরবকে সঙ্গে লইয়া মহামাত্যের সমীপে উপস্থিত করিল। বলিল,—ইনি সেই ভৈরব, নগরপাল দশকর্ণদেবের আদেশে আর্য্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

ভৈরবের উগ্রদৃষ্টি মহামাত্যের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই আর উগ্র রহিল না, একেবারে নত হইয়া গেল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া মহামাত্য বলিলেন, ভদ্র, আপনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

আমার অপরাধ? মহামাত্য বলিলেন,—মহারথ প্রবীর বর্ম্মার সাধ্বী গুণবতী ধর্ম্মপত্নী বিদ্রাদেবীর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে আভিচারিক ক্রিয়ানুষ্ঠান।

ভৈরব অতীব সঙ্গত কণ্ঠে উত্তর করিল,—মিথ্যা সংবাদ, আর্য্য মহামাত্য! এ নগরে আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছে—উহা আমার ভালরূপই জানা আছে। বিশেষতঃ আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহারথের ধর্ম্মপত্নীর প্রাণনাশ করতে যাব! এ বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। মহামাত্য বলিলেন, আপনার সঙ্গে না থাকতে পারে কিন্তু যার সঙ্গে আছে, তিনিই আপনাকে এ কাজে নিয়োগ করেছেন, এ কথা অস্বীকার করবেন?

হে মহান, আমার সর্ব্বশক্তি দিয়েই আমি অস্বীকার করি। এ কাজে কেউ আমায় নিয়োগ করেনি: আমায় পরিত্যাগ করুন, অপরাহ্লের পূর্ব্বেই আমার ভজন পূজন আছে।

মহামাত্য এবার ডাকিলেন, কর্ণী। একবার এইখানে এসো তো।

পাশের ঘরে যেখানে পুষ্পদন্তা প্রবেশ করিয়াছিল, কর্ণী সেই ঘর হইতেই বাহির হইল।

বলিতে হইবে না, এই নারী মহামাত্যেরই একজন নারী গুপ্তচর। মধ্য বয়সী, কুটিনী কর্ণী বলিয়া তাহাকে সবাই জানে এবং ভয়ও করে। এখন আর্য্য চাণক্য লক্ষ্য করিলেন,—কর্ণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি তাহাকে বলিলেন,—আর্য্য প্রবীর বর্ম্মার পত্নী বিদ্রাদেবীর আভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণনাশ সম্পর্কে পুষ্পদত্তার সঙ্গে ইহার আলাপ ও ব্যবহার, যাহা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ প্রকাশ করো।

কর্ণী বলিল,—আমি ঐ নরপশুর ঘরেই ছিলাম যখন পুষ্পদত্তার সঙ্গে উহার কথা হয়। তাহা এই যে, সাতটি অহোরাত্রের মধ্যেই বিদ্রাঙ্গীর প্রাণান্ত হইলে ওই পিশাচ পুরস্কারের অধিকারী হইবে।

পুরস্কারের স্বরূপ বল ;—মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণী তৎক্ষণাৎ বলিল,—এক রাত্রের জন্য ঐ পাষণ্ডের বশবর্ত্তিনী হইযা, উহার সহিত চক্রে বসিতে হইবে।

ভৈরব প্রথমটা অধোবদনেই ছিল, এখন যেন জাগ্রত, উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আর্য্য মহামাত্য,—ঐ ভ্রষ্টাচারিণী কুটিনীর কথায় আপনি বিশ্বাস করছেন ? এক চরিত্রহীনা বৃদ্ধা বেশ্যার কথাব উপর নির্ভর করে একজন নিরপরাধ সাধু ধার্ম্মিক, শক্তি উপাসককে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিতে পারেন না। পুষ্পদত্তাকে আমি জানি না, চিনি না, তাহার সঙ্গে আমার কখনও দেখাও হয়নি।

এবার মহামাত্য ডাকিলেন, পুষ্পদত্তা !

পুষ্পদত্তার সেই চঞ্চলা মূর্ত্তি আর নাই, নিতান্ত স্থির শান্ত চরণে সুন্দরী আসিয়া নতমুখে মহামাত্যের নিকটে দাঁড়াইল। পুষ্পদত্তার মূর্ত্তি দেখিয়াই ভৈরব মাথা নত করিল,—তাহার মুখে প্রথমে বাক্য সরিল না,—মহামাত্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই এখন ভৈরব বলিল,—আমি অপরাধী,—দণ্ড বিধান করুন।

মহামাত্য বলিলেন, আজ এখনই আমি দণ্ড বিধান করব না, আগামী কাল প্রাড়বিবাক দশকর্ণদেব যথাযথ বিচার এবং দণ্ডবিধান করবেন।

পুষ্পদত্তার অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এখন পুষ্পদত্তা ব্যতীত সকলেই নিজ নিজ কাজে যেতে পারেন,—

সবাই চলিয়া গেলে—পুষ্পদত্তার চক্ষে জল দেখিয়া, চাণক্য বলিলেন, একি ? তোমার এ অস্বাভাবিক ভাবান্তর কেন ? শেষে অনুশোচনাই কি তোমার মধ্যে এই ভাবান্তর এনে দিয়েছে ?

পুষ্পদত্তা নিরুত্তর,—বস্ত্রাংশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দৃঢ় ধারণ করিয়া রহিল।

কৃতকর্ম্মের গুরুত্ব বুঝেছ—তাতো আমার বোধ হয় না।

ধীরে ধীরে ঐ সুন্দরী এবার বলিল,—আপনারা সবাই আমার শত্রু,—আমার সাথে বাদ সেধেছেন ;—যদি একজনও সহায় পেতাম—

—এই অবস্থাতেও তুমি বুঝতে পারনি যে, তোমার এই কর্ম্ম বিধাতার অনুমোদিত নয়? গোড়ায় গলদ যাকে বলে তোমার তাই হয়েছে যে!

—আমি ও কথা মানি না ; বিধাতার বিধান আবার কি? বুদ্ধি আর শক্তি থাকলেই এ-জগতে সব কিছু করাই সম্ভব মানুষের পক্ষে।

—ওটা দানবের কথা, এই সৃষ্টির মধ্যে যে কর্ম্মের চক্রাবর্ত্তন যারা তার গূঢ় তত্ত্বটি জানে না, তারাই ঐ কথা বলে। এর মধ্যে আসল কথা এই যে, মানুষ ইচ্ছা করতে পারে, নানা কল্পনা করতেও পারে,—কর্ম্মও করতে পারে, ঐ পর্য্যন্তই অধিকার ; কিন্তু মনোমত ফল লাভ করতে পারে না—

—কেন,—কামনা অনুসারে কর্ম্ম করতে পারে তো অভীষ্ট ফল পাবে না কেন?

—মানুষ-প্রচেষ্টার পিছনে আর একটি মহাশক্তি কাজ করছে বোলে। সেই শেষটুকুই প্রকৃতির নিজের কাজ। মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে তার ইচ্ছার মিলন হলে তবেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়,—না হলে নয়। তুমি তো তোমার যতটুকু বুদ্ধি আর শক্তি আছে তা সবটুকুই খরচ করেছিলে, তবে এটা তোমার অভীষ্ট ফল নিয়ে এলোনা কেন? বরং তোমার ঐ অপরিণত বুদ্ধির দোষে এমন ফল নিয়ে এলো যাতে তোমায় রাজদ্বারে চরম দণ্ডের অধিকারিণী হতে হয়েছে।

শুনিয়া পুষ্পদত্তার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। করুণায় মহামাত্য ক্ষণেকের জন্য যেন একটু বিচলিত হইলেন। তিনি দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় পুষ্পদত্তার অসহায়ভাব দেখিতে পাইলেন, তাই বলিলেন,—তুমি এখনও মনে ভাবছো যে তোমার কাজই ঠিক—বাকী সবার ভুল, সবাই তোমার প্রতি কেবল অন্যায় করছে?

পুষ্পদত্তা বলিল,—কেন বলুন তো, এক একবার যেন মনে হচ্ছে বটে আমারই ভুল হয়েছে, পরক্ষণেই আবার মনে হচ্ছে আমার ঠিকই হয়েছে।

মহামাত্য বলিলেন, আমি ধর্ম্মোপদেষ্টা নই, কেবল সামাজিক মানুষের নৈতিক শৃঙ্খলাটাই বুঝি আর তাই নিয়েই কাজ করছি। তবে তোমার প্রবৃত্তির

মধ্যে যে সত্যটুকু কাজ করেছে আমি কেবল সেইটুকুই বোলতে পারি; যদি বুদ্ধি থাকে বাকীটা বুঝতে কষ্ট হবে না;—

ঐ যে প্রথম দিনে তুমি প্রবীরকে ভালবেসেছিলে এইটুকুই সত্য এবং নির্ভুল, এই সত্য আছে বোলেই তোমার কিছুতেই এতগুলি অন্যায় চক্ষে পড়ছে না।

আমার অন্যায় কোনটা এইবার বলুন, পাক্ষীর পিছনে কলহনগড়ি ধাওয়া করাই অন্যায় হয়েছে?

—না, ধর্ম্মের বিচারে সেটা কখনই প্রবল অপরাধ-মূলক কর্ম্ম হয়নি।

—তবে? মহামাত্য বলিলেন,—বিদ্রাঙ্গীকে হত্যার চেষ্টাই তোমার সবার বড় অপরাধ, তোমার জীবনের দূরপনেয় কলঙ্ক। যদি তোমার জীবন-ধারার সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের একটা স্নেহ সম্বন্ধ না থাকতো, তাহলে সমাজের পক্ষে তোমার মৃত্যুই একমাত্র কাম্য। তুমি চরম দণ্ডভাগিনী হয়েছ,—অথচ তোমার মধ্যে তার ধারণাই নেই।

—আপনি আমায় কি দণ্ড দেবেন প্রভু?

—দণ্ডদাতাই তোমায় দণ্ড দেবেন—এ রাজ্যে বিচার ও দণ্ডদান আমার কর্ম্ম নয়।

—দণ্ডদাতা আমায় কি দণ্ড দেবেন?

আমি ঠিক জানিনা তবে বর্ত্তমান প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুসারে বোধ হয় তোমার কণ্টক শয্যা* দণ্ডই নিতে হবে। শুনিবামাত্র পুষ্পদত্তা শিহরিয়া উঠিল;—তাহার হৃদয় কাঁপিল। এ জীবনে যাহা কখনও করে নাই, পুষ্পদত্তা এখন সেই কর্ম্ম করিয়া বসিল। সে আছড়িয়া মহামাত্যের পায়ের উপর পড়িল;—আমায় রক্ষা করুন।

মহামাত্য সহজেই নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন তারপর বলিলেন,—যে অপরাধ আমার কাছে করেছ তার বিচার আমি সহজেই করতে পারবো। কিন্তু যাঁর কাছে তুমি যথার্থই অপরাধী তাঁর কাছেই তোমার বিচার। তারপর তো রাজার কাছে বিচার।

* এক বিঘৎ লম্বা অসংখ্য লোহার তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক সমাকীর্ণ, একজন সহজেই চিৎ হইয়া শুইতে পারে এমনই একটি লৌহময় ক্ষেত্র। অপরাধিনীকে তাহার উপর শোয়াইয়া বাঁধিয়া উপরে ঐ মাপের এবং ঐরূপ কণ্টকাকীর্ণ লৌহফলক চাপা দেওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর ভার চাপানো হইতে থাকে যতক্ষণ না উপর ও নীচের ফলক পরস্পর সংযুক্ত হয়। তখনকার ব্যভিচারিণী নারীগণের ঐই দণ্ড ছিল চরম।

এই কথা শুনিবা মাত্রই উন্মাদিনী তড়িৎ গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তেজপূর্ণ কণ্ঠে মহামাত্য আর্য্য চাণক্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—কি বলছেন আর্য্য, প্রভু, —কত জনের কাছে আমি অপরাধিনী ?

—শুনতে চাও ? শোনো তবে, আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা করতে পেরেছি তোমায় বলছি। প্রথম আর প্রধান অপরাধিনী তুমি তোমার আত্মার কাছে,—দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গুরুতর অপরাধিনী, যার প্রাণ হনন করে তুমি নিজের সুখ খুঁজতে গিয়েছিলে, তার কাছে। তৃতীয়তঃ তুমি অপরাধিনী হয়েছ সেই সমাজের কাছে, যে সমাজের সহজ শান্তি শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে গিয়েছিলে নিজ সুখ লক্ষ্য করে। চতুর্থ বারে অপরাধিনী হয়েছ তারই কাছে, ভালবাসা বা প্রেমের নামে তুমি যাকে বার বার ত্যক্ত বিরক্ত করে মেরেছ। তারপর শেষ বারে পঞ্চম পর্য্যায়ে মহাপরাধিনী হয়েছ এই জগৎস্রষ্টার কাছে,—যাঁর এই পবিত্র সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তুমি প্রেমের নামে এই কুৎসিৎ আচরণের আঘাতে এতগুলি মানুষের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছ।

পুষ্পদত্তা গম্ভীর, নিস্তব্ধ, নিশ্চল পাথরের মতই স্থির। দেখিয়া আর্য্য মহামাত্য বিচলিত হইলেন,—এই অপরিণত বয়স্কা কুমারীর এতটা সহ্য করিবার শক্তি আছে? তাহাকে আর কিছু বলিবেন, সান্ত্বনার কথা শুনাইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন,—এমনই সময় এক প্রবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুষ্পদত্তা উঠিয়া

দাঁড়াইল। তাহার সে মূর্ত্তি নাই, যে মূর্ত্তি লইয়া সে একটা ঝড়ের মত নীতি-বিরুদ্ধ ভাবে মহামাত্যের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন কাতর নয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হবে আমার ?

মহামাত্য বলিলেন, যাঁর কাছে সবার বড অপরাধিনী তিনি যদি সর্ব্বান্তঃ-করণে ক্ষমা করেন,—তারপর আমার কাছে এসো, আমি রাজদণ্ডের কথা বিচার করে দেখবো।

অন্তরে অবসন্ন, ভয়ে অনুশোচনায় কাতর হইয়া পুষ্পদত্তা মহামাত্যের আশ্রম হইতে বাহির হইয়া রথে উঠিল,—রথীকে বলিল গঙ্গাতীরে চল। রথ গঙ্গাতীরে বাঁধের নীচে আসিলে সারথী বলিল, আর্য্যে ! আমরা গঙ্গাতীরে এসেছি, অবতরণ করুন। পুষ্পদত্তা এতক্ষণ প্রায় সংজ্ঞারহিত অবস্থায় ছিল, অন্তরে তাহার যে ঝটিকা বহিতেছিল, তাহার সংবাদ সারথি কি জানিবে ! সুতরাং প্রথমে সে সারথির কথা না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি বলছ তুমি ? তারপর সম্মুখের দৃশ্য দেখিয়াই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, পুনরায় সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তুমি ক্ষত্রপল্লীতে আর্য্য পাঞ্চীর স্থানে চলো।

সে জানিত না, পাঞ্চীর ঘরে আজ ভোজন উৎসব। তাহার উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে এখন বিদ্রার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাহার মনে যুগপৎ একটা আতঙ্ক আর অনুশোচনা ক্রিয়া করিতেছিল। সে মনে মনে এক-একবার ভাবিতেছিল রাজবিচারে ঐ দণ্ড, যা ভাবিতেও আতঙ্ক আসে, এই বয়সে কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব। তাহাপেক্ষা যদি বিদ্রার কাছে সকল কথা বলিয়া তাহার ক্ষমা লইতে পারি, তাহা হইলে ঐ দণ্ডভয় এড়াইতে পারিব। আর্য্য চাণক্য কি তাহাকে সত্য সত্যই এভাবে দণ্ডভোগের পথেই ঠেলিয়া দিবেন ? এইভাবে প্রাণের মায়া তাহাকে আত্মহত্যা হইতে বাঁচাইল।

এই সকল ঝটিকার বেগ মনের মধ্যে লইয়া যখন পাঞ্চীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটা উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। আজ বিদ্রার গৃহে যে ভোজনোৎসবের আয়োজন তাহার কিছুই জানিত না ; সে নিজের মনোময় জগতে, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এখন সে এতটা আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতেই চাহিল না ;—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে ভাবিয়া সে যখন বহিরাঙ্গন পার হইতেছিল, আশ্চর্য্য যোগাযোগে পথেই বিদ্রার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আজ বিদ্রার ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাহাকে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—এসো পুষ্পদত্তা,

আজ যখন তুমি এসে পড়েছো তোমায় আমি ছাড়তে পারবো না ; আজ আমার তোমার মত একজনের বড়ই দরকার ; বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পুষ্পদত্তা বলিল, আমি আজ তোমার কাছে একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়েই—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল। কিন্তু বিদ্রা তাহার কথায় বড় মনযোগ করিতে চায় না, সে বলিল, সে সব পরে হতে পারবে, এখন তুমি আমার ঘরের একজন হয়ে লেগে যাও তো, যা বলি তাই করো। এখন এসো, বলিয়া তাহাকে লইয়া গেল। পুষ্পদত্তার মনে হইল যেন সে উপস্থিত বাঁচিয়া গেল।

কর্ম্মের মধ্যে মনোগত অশেষ বিক্ষোভ ভুলিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিদ্রার উপর প্রবল বিদ্বেষের বিষও যেন অনেক পরিমাণেই ক্ষীণ, নিস্তেজ এবং পরে যেন মিলাইয়া গেল। অবশ্য আর্য্য মহামাত্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তাহার অন্তরের আগাগোড়া চিন্তাধারার একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এখন সে আগাগোড়াই আপন কর্ম্মধারা, প্রথম হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সকল কিছুই, একজন দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে এবং বিচারেরও সুযোগ পাইয়াছিল। অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়াই এখন তাহার পক্ষে কিভাবে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব, তাহারই চিন্তায় সে মগ্ন ছিল।
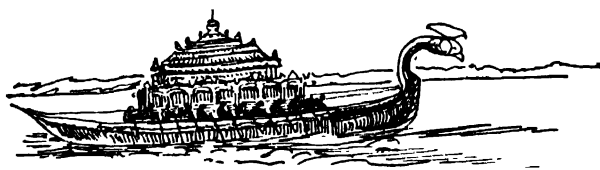
ছাব্বিশ

বিদ্রাঙ্গী তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, প্রবীর বর্ম্মা তাহার ভগিনীপতি—এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং আজিকার অদ্রীহরিকে আহ্বান লইয়া এই উৎসবের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ব্যাপার ছিল। অদ্রী ও বিক্রম সবার অগ্রেই আসিয়াছিল ;—তাহারও আগে খণ্ডী আসিয়াছিল ;—এখানে তাহার কর্ত্তৃত্বই প্রবল ; কারণ, সে প্রবীরের সম্পর্কে ভাই এবং তাহার অনুপস্থিতির কালে তাহার গৃহরক্ষক এবং বিদ্রার দেবর। কাজেই, তাহার অধিকার এখানে অসাধারণ বলিলে দোষ হইবে না। অদ্রী যখন অন্তঃপুরের দিকে গেল বিক্রম খণ্ডীকে পাইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। প্রাঙ্গণে প্রশস্ত এক পরিষ্কৃত ক্ষেত্রের উপর প্রায় বারোহাত লম্বা কাঠের দণ্ড, চারিধারে ঝালর,—সেখানে বৈকালে কয়েকটি ক্রীড়া এবং সন্ধ্যার পর নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর বসিবে, তাহার সুচারু ব্যবস্থা হইয়াছে।
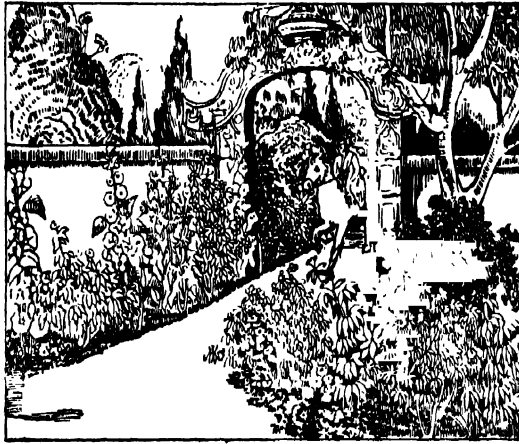
প্রবীর বর্ম্মার গৃহে বাহিরের যে কয়খানি বেশ বড় বড় ঘর, উহা তখনকার রুচিমত সুসজ্জিত। গৃহভিত্তি সুচিত্রিত। গৃহতলের সবটাই গালিচা পাতা, তাহার উপর আসন বিস্তৃত। চার খণ্ড আসন দীর্ঘ-প্রস্থে গৃহতল সম্পূর্ণ আবরিত। এই খানেই প্রথমে বিক্রমের সঙ্গে খণ্ডীর দেখা হইল। খণ্ডীকে যখন প্রশ্ন করা হইল, আজ কি এখানে আরও কেউ আসবেন? খণ্ডী বলিল,

এই আমাদেরই বান্ধবেরাই একদল আসবেন। এখন কথা কহিবার এমন

একজন পাইয়া খণ্ডী আরম্ভ করিল,—এই ধরুণ আমাদের কুমার বিন্দুসার আসবেন তার সহচর দুটিও আসবেন কথা আছে, তারপর আমাদের গণপদ্মামোদর আসবেন—এই সব নিয়ে দশ বারোজনের বেশী নয়। বেশী হলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে, সেটা জ্যেষ্ঠ প্রবীর ভাই চান না! হাঁ আর একটা কথা শুনেছেন, অবশ্য আজ যদি কুমার বিন্দুসার আসেন সব কিছু তাঁর মুখেই শুনতে পাওয়া যাবে। বোধ হয় এই ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহের শুভদিনেই কুমারের বিবাহ; বিদীশার রাজকুমারীর সঙ্গে। যেন শুনলাম, এটা হঠাৎ ঘটে যাচ্ছে। আগে কথা ছিল ওটা এক বৎসর পরেই হবে। যদি দুচার দিনের মধ্যে ঘোষণা হয় তো ভালই জানা যাবে।

এমনই সময় রাজপুরীর এক প্রহরী আসিয়া আর্য্য-রথীকে প্রণাম পূর্ব্বক এক সন্দেশলিপি প্রদান করিল। অবশ্য সেই প্রহরী যাহা বলিল, তাহা প্রবীরকেই বলিল, এদিকে যেখানে আমাদের বিক্রম ও খণ্ডীবর্ম্মা বসিয়াছিল, সেখান হইতে কিছুই শুনা গেল না। কেবল সে যখন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল তখনই প্রবীর বলিল,—

শুনেছ খণ্ডী! প্রস্তুত থাকো, যুবরাজ চারদণ্ড মধ্যেই আসছেন। ভাস্করকে নিয়েই তিনি আসবেন জানিয়েছেন। কোশল রাজকুমার এসেছেন কিনা, সে খবর নিতেই আদেশ করেছেন প্রহরীকে। আমি বোলে দিয়েছি, তাঁরা আগেই এসেছেন, একথা তাঁকে জানাতে।

যাহাই হউক, এখন বিক্রমের সঙ্গে খণ্ডী তাহাদের চলিত প্রসঙ্গ লইয়াই মাতিয়া উঠিল।

বিদ্রা একটি এমনই কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, অদ্রী ও বিক্রমের আগমন সংবাদ পাইয়াও ঝটিতি আসিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিক্রম খণ্ডী বর্ম্মার সঙ্গে আলাপ করিতে ব্যস্ত ছিল। তখন অদ্রী আগ্রহাতিশয্যে অন্তঃপুরে বিদ্রার সঙ্গে মিলিতে গেল।

আসিতে আসিতে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণের নিকট যাহা দেখিল, তাহা নাটকীয় যতটা না হোক তাহার কাছে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিল, অ-প্রত্যাশিত এই কাণ্ড। পথের ধারেই পুষ্পলতা সমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে অবতরণের

পাষাণময় সোপানের উপর বসিয়া সেই অনিন্দ্য সুন্দরী, যাহাকে কয়েকদিন পূর্ব্বে একবার চকিতে দেখিয়া অবধি অনুক্ষণ তাহার ধ্যানের বস্তু হইয়া আছে। আবার সেই বিস্ময় কৌতূহলে পরিণত হইল, এখন সে দেখিল তাহার চক্ষে জল, কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়াছে। একি ব্যাপার! অদ্রী দাঁড়াইয়া গেল।

তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সেও উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসু নয়নে অদ্রীর মুখের পানে চাহিয়াই মুখ নত করিল। তখন অদ্রী বলিল,—

আমার দিদি বিদ্রাঙ্গী, তাঁর কাছেই এসেছি। নিঃসঙ্কোচেই এই কয়টি শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল মাত্র। তারপর আর কথা চলিল না। কিন্তু ঐটুকু শুনিয়াই সেই সুন্দরী অঞ্চল প্রান্তে নয়ন মুছিয়া ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে চলিতে বলিল, আসুন, ভদ্র! আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি; তিনি ভিতরেই আছেন।

তাহার গতিপথে বাধা দিয়া অদ্রী বলিল,—ভদ্রে! আমি পথ চিনি এবং তাঁর কাছে সহজেই যেতে পারবো, সেজন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। এখন একটু দাঁড়ান,—দেবী, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

এবার পুষ্পদত্তার গতিরোধ হইল; মাথাটি নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—ভবান! আমি কুমারী, এ সংসারের কেহ নই, আপনার প্রশ্ন?

এই প্রাথমিক পরিচয়ের মধ্যে মেয়েটি জানাইয়া দিল, এখানকার সামাজিক নিয়মে অপরিচিত সম্প্রদায়ের কুমারীর সম্মতি না থাকিলে অপরিচিত একজনের

তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণের অধিকার নাই। অদ্রীও সেটা বুঝিল। তাহার যত সঙ্কোচ এইবার আসিয়া পুরুষ প্রবরের হৃদয় অধিকার করিল। অল্পক্ষণেই কতকটা সঙ্কোচ কাটাইয়া সে বলিল,—

আমিও কুমার,—আমিও এ সংসারের কেহ নহি;—তারপর নিজ বক্তব্য বলিতে গেল, ঠিক এমনই সময়ে বিদ্রাঙ্গী দ্রুতপদে ঐখানেই আসিয়া পৌঁছাইল। স্নেহের অদ্রীকে পুষ্পদত্তার সঙ্গে আলাপে নিযুক্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইল কিন্তু তাহার মুখের বাহ্যতঃ প্রসন্ন ও উৎসাহপূর্ণ ভাবটির কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না; তবে একটা বিস্ময়ের ভাব যেন তাহার উপরে স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

বিদ্রাকে দেখিয়া পুষ্পদত্তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, সে যেমন অপরিচিত ভাবে অদ্রীকে দেখিতেছিল, ঠিক সেই প্রকার ভাব লইয়াই দাঁড়াইয়া এখন বিদ্রার পানে চাহিয়া রহিল। অদ্রী কিন্তু অন্তরে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া,—তাহার ভগিনী কি মনে করিয়াছেন আমাদের পূর্ব্বে কোনসূত্রে পরিচয় ঘটিয়াছিল? এক্ষেত্রে এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়—ভাবিয়া সে একটু অগ্রসর হইয়া এক পা গেল বটে কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটি শব্দও বাহির হইল না।

এই পরিস্থিতিতে, তিনজনেরই তিনটি মন যেন নিঃশব্দে আলোড়িত হইতে লাগিল, তাহাতে আর যাহাই হোক না কেন কেবলমাত্র বিদ্রার চক্ষে এবং যেন মুখেও একটু বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। সেই ভাবটি যেন এইটুকুই বুঝাইতে চাহিল যে, এই ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত, ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। অদ্রীর ভাবটি দেখিয়া এখন বিদ্রা সহজ ভাবেই বলিল,—তোমাদের আসার খবর আমি পেয়েছি—একটু দেরী হয়ে গেল আসতে।

অদ্রী এখন সঙ্কোচ কাটাইয়া যথারীতি প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইল; এবার বিদ্রাঙ্গী পুষ্পদত্তার দিকে ফিরিয়া বলিল,—আমার একমাত্র ছোট ভাইটি—অদ্রীহরি। একে জানো?

না, এই মাত্র জানলাম। পুষ্পদত্তার এই উত্তরে এখন অদ্রীর দিকে চাহিয়া বিদ্রা বলিল,—তুমি কি আগে পুষ্পদত্তাকে দেখেছিলে অদ্রী?

চকিতের মত। দুই একদিন আগে আর্য্য মহামাত্য চাণক্যদেবের আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসবার পথেই দেখেছিলাম, তারপর আজ এই মাত্র দেখা। বলিয়া অদ্রী বেশ সপ্রতিভভাবেই পুষ্পদত্তার পানে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে বিদ্রার মন সহজ হইল। সে বলিল,—

যেন বিধাতার যোগাযোগেই, ও আজ সকালেই আমার এখানে এসেছে, আর এমনই অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছে, ঠিক যেন এই আনন্দের দিনে আমারই কাজের সহায় হবে বোলেই এসেছে, চমৎকার যোগাযোগ। শুনিয়া পুষ্পদত্তা বলিল,—

বিধাতার যোগাযোগে এমন সময়ে এখানে এসে পড়েছি এটি সত্য কিন্তু আজ তোমার কোন কাজে লাগবো, একথা মনে হয় না। আমার মন আজ এমনই অশান্ত, দেখ, তুমি যে কাজ আমায় দিয়েছিলে তার আমি কিছুই করতে পারিনি। বিদ্রা এবার তাহার মুখের উপর একটু তীক্ষ্ণ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার চক্ষে এখন অশ্রু নাই বটে তবে রক্ত আভা রহিয়াছে—তাহার মনে অনেক কথাই ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। সে গতিক বুঝিয়া,—আচ্ছা, এখন তোমরা একটু আলাপ করো, আমি কোশল রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করে আসি। কেমন ? বলিয়া অদ্রীর প্রসন্ন মুখের সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে সে বাইরের দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে অদ্রী খুসী হইল, কিন্তু পুষ্পদত্তার মনোভাব বুঝা গেল না।

এবার পুষ্পদত্তা অসঙ্কোচেই বলিল,—যদিও আমরা কুমার ও কুমারী কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কখনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হতে পারবে না—এটা নিশ্চিৎ জেনে রাখুন। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি,—

এই কথা অদ্রীকে অধিকতর কৌতূহলী করিয়া তুলিল,—সে বলিল,—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা থাক, বর্ত্তমানে আপনার যথার্থ পরিচয়টুকু পেলেই কৃতার্থ হব, আমার আর কোন কৌতূহল নেই।

আপনি বিদেশী, তাই আমার কথা হয়তো আপনার কানে পৌঁছায়নি, এখানে আমি সর্ব্বপরিচিত। কিন্তু আমার সে পরিচয়ে আপনার কোন ইষ্টানিষ্ট নেই,—আমি যা বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, আমার অবস্থার পরিচয়ও আপনার প্রীতির কারণ হবে না, বরং অপ্রীতির সম্ভাবনাই বেশী। তাই বলছি, আমার সম্বন্ধে আলোচনা নাইবা করলেন।

এখন অদ্রীর সাহস আসিয়াছে। নারীহৃদয়ের দুঃখ, চক্ষের জলে তাহার প্রকাশ কোন্ কুমার যুবা সহ্য করিতে পারে! কাজেই, তাহার মুখে যাহা বাহির হইল তাহা কয়েকদিন পূর্ব্বে বোধহয় তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে বলিল,—সম্ভাবনা যাইই থাক, তাতে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। আপনি আমার কৌতূহলকে এমন এক চরম অবস্থায় এনে ফেলেছেন যে, সে কথা না শুনলে আমার জীবনে যে শান্তি নষ্ট হবে, আর তার দায় থাকবে আপনার।

পুষ্পদত্তা বলিল,—কোন লাভই নাই আপনার, আমি জোর করে বলছি—বরং জানলে অশান্তি বেশী ভোগ করবেন, কৌতূহল দমন করলে সেটা অনায়াসেই এড়াতে পারতেন।

শুনুন, আর্য্য কন্যা! আপনার কথা আমার কাছে যতই অশান্তির কারণ হোক না কেন আমাদের কুলদেবতার নামেই শপথ করছি,—তারজন্য কখনই আপনাকে দায়ী কোরবো না। এখন নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারবেন আশা করতে পারি!

এবার পুষ্পদত্তা তাহাকে সত্য সত্যই স্তম্ভিত করিয়া দিল, বলিল,—তাহলে শুনুন, আমি রাজদ্বারে অভিযুক্ত, মহা অপরাধিনী, চরম দণ্ডের অপেক্ষায় রয়েছি। এইমাত্র জেনেই শান্ত হোন।

হায়! তাহা যদি এতই সহজ হইত! তাহার কথায় অদ্রীর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে কিছুক্ষণ গেল। এ যে বিস্ময়ের উপর বিস্ময়,—অদ্রী ভাবিল, একি অসম্ভব কথা, যে নারী রাজদ্বারে অভিযুক্ত এবং চরম দণ্ডভাগিনী, সে কি করিয়া এখানে সেখানে যাইতেছে,—আজ আবার এখানে উৎসবের ক্ষেত্রেও উপস্থিত? তার ভগিনীও কি জানেন না এই নারীর অপরাধের কথা? কিন্তু এ অবস্থায় ইহাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। সুতরাং, কৌতূহলের তরঙ্গই উত্তর উত্তর অদ্রীকে প্রবলবেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে একথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না যে, আপনার কথায় অবিশ্বাস করা আমার সাধ্য নয়, তবুও বলি, যদি এই অবস্থায় আপনার কোন উপকারে আসতে পারতাম,—অপরাধটা আপনার কাছে জানতে পারি?

আপনার সহোদরা বিদ্রাদেবীর কাছে; শুনেছি তিনিই পারেন আমায় মুক্ত করতে।

শুনিবামাত্র জয়োল্লাসেই যেন যন্ত্রবৎ অদ্রী বলিল,—আপনি নিশ্চয় জেনে রাখুন আপনি মুক্ত হবেন।

চকিতে হতাশার হাসি একটিবার খেলিয়া গেল ঐ নারীর মুখে, সে বলিল,—না না না, সে অপরাধের কথা তিনি জানেন না। আরও কথা যা আছে, তা শুনলে তিনি ক্ষমা করতে কখনই পারবেন না।

তিনি জানেন না, তাঁর কাছে অপরাধী,—এ আর এক হেঁয়ালী, এমন সময় বিদ্রাঙ্গী ত্বরিৎপদে আসিয়া উপস্থিত হইল,—বলিল, ব্যাপার কি পুষ্পদত্তা?

শুনিবা মাত্র অদ্রী—এইমাত্র যাহা শুনিয়াছিল, বলিল,—তুমি জানোনা

তোমার কাছেই ইনি অপরাধিনী। বিদ্রা বলিল,—বড়ই চমৎকার তো? রাখো তোমার অপরাধ, আজ আমি কোন অপরাধের কথাই কাণে তুলব না, আমার ভাই, একমাত্র ভাই এসেছে আজ—

বাধা দিয়া অদ্রী বিদ্রার হাত একখানি নিজ হাতে ধরিল,—দিদি! তুমি একটি কথা শোনো, আজ আমার অনুবোধটি রাখো;—তুমি শুনে নাও অপরাধের কথাটা, তারপর এঁকে ক্ষমা করো। আমি না হয় এখান থেকে যাই, বলিযা যাইতে উদ্যত হইল দেখিয়াই পুষ্পদত্তা বলিল, যাবেন না, যখন এতটা শুনেছেন সবটাই শুনে যান; আপনার সাক্ষাতে না বললে আমার অশান্তির উপর অশান্তি বাড়বে। অদ্রী দাঁড়াইল। পুষ্পদত্তা নিঃসঙ্কোচে বিদ্রার দিকে ফিরিয়াই বলিল,—আমি তোমাকেই হত্যার চেষ্টা করেছিলাম, সেই জন্য —বিদ্রা বলিল,—কবে, কখন, কিভাবে?

পুষ্প সেই ভাবেই বলিল, ভূষণ্ডী ভৈরবকে দিয়ে, মারণ মন্ত্রের অভিচারে।

বিদ্রা এবার সকল কথাই বুঝিল এবং কতক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—আমি ক্ষমা করলেই হবে—আর্য্য মহামাত্য কি এমন কিছু ভরসা দিয়েছেন?

তিনি বলেছেন,—আগে বিদ্রার ক্ষমা নিয়ে এসো, তারপর রাজদণ্ডের কথা বিচার করব। তাইতো আজ তোমার কাছেই এসেছি।

আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃ-করণেই ক্ষমা করবো কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমার একটা কথা রাখতে হবে। এই সর্ত্তেই আমি তোমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবো।

কণ্টকশয্যার কথা পুষ্পদত্তার মনে পড়িল। সত্য সত্যই সে এবার বড়

কাতর হইয়া বলিল,—দেবী বিদ্রা, আমি শপথ করেই বলছি, মার্ত্তণ্ড দেবই আমার সাক্ষী, তুমি যা বলবে আমি তাইই শুনবো।

আচ্ছা, তাহলে তুমি মনের সকল দুঃখ দূর কর, আজ আমার এই কাজে সহায় হও; আজ আমার ঘরে উৎসব, তোমাকে আমার বড়ই দরকার—ঘরে রাজ-অতিথি। পুষ্পদত্তার হাতখানি নিজ হাতে লইয়া বিদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল।

অদ্রীর সম্মুখেই যে ব্যাপার ঘটিল তাহাতে তাহার নির্ম্মল, প্রশস্ত, উদার অন্তরক্ষেত্র একেবারেই অন্ধকার হইয়া গেল। এই সর্ব্বনাশী রূপবতী পিশাচিনীকে আমি দেবী প্রতিমা ভাবিয়া হৃদয় দান করিতে বসিয়াছিলাম!

যতটা গভীরভাবে অদ্রী এই বিষয়টি লইয়াছিল, বিদ্রা সে ভাবে লয় নাই। তখনকার দিনে বাস্তবিকই এই ব্যাপার খুবই সাধারণ ছিল। তুকৃতাক এবং তন্ত্রমতে আভিচারিক ক্রিয়া অজস্র এবং যত্র-তত্র অনুষ্ঠিত হইত, যদিও কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ মৌয্যরাজ্যে ইহা রাজবিধি-বহির্ভূত এবং দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু গোপনে ইহার অনুষ্ঠান বন্ধ করা যাইত না। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইত না; কারণ, এসকল ফলপ্রদ হইত না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ফল—এক সহস্র কথার মধ্যে হয়ত একটি সফল হইত। অনেকটা জুয়া খেলার মতই ইহার ফল। কাজেই, উচ্চ সভ্য স্তরে উহা হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হইত, কেবল সমাজের মধ্য স্তরের মধ্যেই উহার চলন ছিল। কাজেই, বিদ্রার নিকট এসকল ব্যাপার উপেক্ষণীয় ছিল। বিদ্রার মনে কিন্তু অন্য একটা আতঙ্ক ছিল, যখন শেষদিকে পুষ্পদত্তা তাহার গৃহে আসা বন্ধ করিয়াছিল, অর্থাৎ বিদ্রাঙ্গী জীবিত থাকিতে তাহার সহিত প্রবীরের মিলনাশা নাই—একেবারেই নাই, এই ধারণা যখন তাহার দৃঢ় হইল, কলহনগড়ি হইতে আসিবার পর,—তাহার এই ভয় হইয়াছিল, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রবীরকে হত্যা না করিয়া বশে। অনেকটা পাগলের মতই পুষ্পদত্তার ব্যবহার, পল্লীর সবাই না হোক অনেকেই যাহারা লক্ষ্য করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে বিদ্রা একজন। এখন বিদ্রা বুঝিয়া লইল, মহামাত্য যখন ইহাতে হাত দিয়াছেন তখন এ জঞ্জাল আর থাকিবে না, পরিষ্কার হইয়া যাইবে এবং পুষ্পদত্তারও জীবনধারা ভিন্ন পথ ধরিবে। বিদ্রা সংকল্প করিল, আগামী কাল সে আর্য্য মহামাত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুষ্পদত্তা ও অদ্রীর সম্বন্ধের কথাটা তুলিবে।

সাদরে পুষ্পদত্তাকে হাতে ধরিয়া বিদ্রাঙ্গী তাহার কাজে অন্তঃপুরস্থ কর্ম্মক্ষেত্রে

চলিয়া গেল; অদ্রীহরি বাহিরে, বান্ধবগণের সাথে মিলিতে ফিরিল বটে—কিন্তু যথার্থ বাহিরে না আসিয়া, পথের মধ্যস্থলে এক নিভৃত স্থানে বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরের বেদনা এ-জগতের কোন বান্ধবকেই জানাইবার নয়, একান্তে বসিয়া ভোগ করিবার। সে তাহাই করিতে লাগিল, আর সর্ব্বান্তর্য্যামী একমাত্র সাক্ষীরূপেই সঙ্গে রহিলেন।

এদিকে দিবা প্রায় দ্বিপ্রহর ঘেসিয়াছে, এমনই সময়ে যুবা সেনাপতি গণপৎ দামোদর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অভিন্নহৃদয় বান্ধব জগদীশ, তারপর সহদেব, গর্গ, বিশ্বনাথ—এই চারিজনে আসিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিল। শেষে,—যখন অল্পক্ষণ পরেই ভাস্কর দামোদর-এর সঙ্গে মহারাজ কুমার বিন্দুসার গম্ভীর বদনে প্রবেশ করিল, তখনই যেন সভার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

আজিকার নিমন্ত্রিত সবাই আসিয়াছেন। বিন্দুই বোধহয় বয়ঃকনিষ্ঠ। এক্ষেত্রে সবার ছোট হইলে কি হয় তাহারই প্রভাব বেশী। যতক্ষণ বিন্দু গাম্ভীর্য্যরক্ষা করিয়াছিল ততক্ষণ গুমটের মতই একটা তাপ সবাই, এমন কি স্বয়ং বিন্দুসারও অনুভব করিতেছিল। এটা অসহ্য লাগিল সবারই, কাজেই শীঘ্র সে গুমট কাটিয়া

গেল। প্রথমটা খানিক কুশলবার্ত্তা আদানপ্রদান চলিল; সম্ভাষণের প্রাথমিক পালাটা শেষ হইলে বিন্দুসার বিক্রমকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল,—

আজ এই প্রথম দেখছি, আপনার দক্ষিণ দিকটা শূন্য, এমনটি তো পূর্ব্বে হয়নি। আজ কৌশলবীর অদ্রীহরি তাঁর সঙ্গদানে আমাদের বঞ্চিত করলেন কেন? তিনি এসেছেন, এ খবর তো পেয়েছি। উত্তরে বিক্রমজিৎ বলিল,—কিছুক্ষণ হ'ল সহোদরা সম্ভাষণে অন্তঃপুরে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেন নি; আমরাও তাঁকে—

দেখা গেল দ্বারপথে অদ্রীহরি প্রবেশ করিতেছে। বড়ই গম্ভীর মুখখানি; বোধ হইল, গাম্ভীর্য্যের আবরণেই অন্তরের দারুণ আঘাৎ সামলাইবার চেষ্টা। অদ্রী আসিয়া বিন্দুসারকে এবং যাহাদের সঙ্গে এইমাত্র সাক্ষাৎ হইল তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ এবং শিষ্টাচার পালনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলে সবাই এখন স্থির হইল।

অদ্রীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমেই এবার বিন্দুসার বলিল,—ভবান অদ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনাই করি,—তবে আজ এ ক্ষেত্রে একটি এমনই গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করছি যেটি কোশলবীর অদ্রীহরির প্রকৃতির ব্যতিক্রমই মনে হয়। কেন বলুন তো?

এই ভয়ানক প্রশ্নের উত্তরের দায় হইতে প্রবীর বর্ম্মাই অদ্রীকে বাঁচাইয়া দিল। তাহার কথা এই যে,—এখানে উপস্থিত আমরা প্রত্যেকেই যুবরাজ বিন্দুসার, আমাদের ভবিষ্যৎ মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনাই করি, কিন্তু এখন আমরাও নির্ভুলভাবেই লক্ষ্য করেছি অদ্রীহরির তুলনায় তাঁর মুখখানি তো কম গম্ভীর নয়। ঈষৎ হাস্যে—এই বলিয়া বিন্দুসারের পার্শ্বেই উপবিষ্ট যুবরাজের সহচর ভাস্কর দামোদরের দিকে চাহিয়া কি যেন ঈঙ্গিৎ করিল।

ভাস্কর যেন প্রস্তুত ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—তক্ষশীলা প্রান্তে যাবার পূর্ব্বেই বুঝিবা মহারাজ কুমারের বিবাহ লগ্ন ঘটে যায়, বোধহয়, সেই কারণেই যুবরাজকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। অবশ্য বয়স্য হিসাবে আমার এ অনুমান, হয়তো ঠিক না হতেও পারে; কিন্তু ক্ষেত্রে যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত, তিনিই আলোকপাত করবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি।

বিন্দুসার কৌতুকপূর্ণ নেত্রে ভাস্করের দিকে দেখিয়া তাহার আসনে একটু দৃঢ়ভাবেই বসিল, কিন্তু কথা বলিল না। এদিকে শ্রোতা বান্ধবগণ সবাই তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ভীড় করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া প্রবীর

বর্ম্মা বলিল,—আমরা বাইরে থেকে তো বিশেষ কিছু জানতে পারব না, যতক্ষণ না ঘোষণা হয়;—কিন্তু এ সংবাদ তো আমরা খুব ভাল বলেই উপভোগ করব যদি তাঁর তক্ষশীলা যাত্রার পূর্ব্বেই লগনটা ঘটে যায়; কারণ, শুভ যেটি সেটি শীঘ্রই তো কাম্য আমাদের সবারই।

এবার আর রক্ষা নাই বিন্দুসারকে কথা কহিতেই হইবে, সবাই উৎকর্ণ। আর গাম্ভীর্য্য নাই—এবার বিন্দুসার সহজ কণ্ঠেই বলিল,—

বাইরে থেকে না-জানার কথা যতটা বর্ণনা করলেন, মহারথ! এখানে যাঁরা উপস্থিত আমি সবাইকে, বিশেষ ভাবে আর্য্য মহারথীকেই জিজ্ঞাসা করছি, সত্যই কি এ সংবাদ জানবার জন্য রাজকীয় ঘোষণার অপেক্ষায় তাঁরা আছেন? তাই কি সম্ভব? উত্তরে প্রসন্ন বদনে মহারথ বলিলেন,—

যুবরাজ সত্যই বলেছেন, এ ধরণের সংবাদ রাজপুর থেকেই কিছু কিছু জানা হয়ে যায় বৈকি, তবে এক্ষেত্রে নায়ক স্বয়ং যখন উপস্থিত তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কিছু শুনবার লোভেই এখন আমাদের ভাষার প্রকারভেদ ঘটিয়েছে,—এটি সত্য।

মহারথের উত্তরের পর, এবার বিন্দুসারের কথা সরস হইয়াই বাহির হইল।

আমাদের এই মৌর্য্যরাজ্যের সবই আশ্চর্য্য; হয়তো দেখে থাকবেন,—যেন মন্ত্রবলে এক একটা বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হয়ে যায়। সবাই জানে যে, আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন আমি তক্ষশীলা প্রান্তে যাবো এবং তক্ষশীলা থেকে ফিরে এসে আগামী বৎসরে বিবাহিত হবো, আমার লগন তখনই ঠিক হবে। আমিও ঐ নির্দ্ধারণের উপর বিশ্বাস করেই বেশ আনন্দেই যাত্রার দিন গণনা করছিলাম। ইতিমধ্যে গতমাসে, প্রান্তপাল, দুর্গস্বামী স্বয়ং বনদীপ—যিনি তক্ষশীলা প্রান্তের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা, তিনি মহারাজের বন্ধুপুত্র, সম্প্রতি মহারাজের কাছে তাঁর এক প্রস্তাব নিবেদন করে একখানি পত্র উৎসর্গ করেছেন।

বড়ই সরস ঐ একখানি বিশিষ্ট লিপি,—অতীব প্রয়োজনীয় বার্ত্তা, অবশ্য তাঁর মধ্যে গোপনীয় কিছু হয়তো নিশ্চয় আছে। ইতিমধ্যে আজ প্রায় দুই মাসের উপর হল রাজধানী থেকে, বরাবর তক্ষশীলা প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদসমূহ এক অষ্টাহের মধ্যেই আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে এ সংবাদ এখনও হয়তো সাধারণে জানে না। এখন থেকে যে কোন রাজাজ্ঞা অষ্টাহেই তক্ষশীলায় পৌছাবে আবার সেখানকার বার্ত্তা অষ্টাহের মধ্যেই এখানে পাওয়া যাবে। সেইভাবেই এক অতীব প্রয়োজনীয় বার্ত্তা এসে পৌছেচে। তার সরলার্থ হলো

এই যে, যুবরাজ যদি উদ্বাহ সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে যুবরাণীকে সঙ্গে নিয়ে যুগলেই আসেন, তাহলে প্রজারা মহাসুখী হয়ে কৃতার্থ বোধ করবে। তার প্রত্যক্ষ লাভ এই হবে যে, রাজভক্ত প্রজারা রাজ ধর্ম্মানুরক্তির চরমে পৌঁছে যাবে। তাতে ফলরূপে যে কল্যাণের স্রোত বইবে, তাতে কুসুমপুর থেকে গান্ধার পর্য্যন্ত সকল প্রান্ত পরিপ্লাবিত হয়ে উঠবে। এই ভাবের মহাযুক্তি ও উপদেশপূর্ণ এই বার্ত্তা।

এখন বিন্দুসারের সরল মন ও সাময়িক স্ফূর্ত্তির সুযোগ নিয়ে মহারথ প্রবীর বর্ম্মা সোজা কথায় সুধাইলেন,—এটি তো হলো বার্ত্তালিপির সরলার্থ। গূঢ় অর্থ কিছু আছে নাকি ? কি মনে হয় যুবরাজের ?

বিন্দুসার বলিল, এবং তৎক্ষণাৎ বলিল,—আছে বৈকি, সেটি হলো যুবরাজকে তক্ষশীলা প্রান্তে দীর্ঘকাল রাখবার পাকা ব্যবস্থা। যাই হোক, এখন এই বার্ত্তালিপি ও মর্ম্মার্থ অবগতি মাত্রই , আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লিপিমধ্যস্থ ঐ প্রস্তাব এবং যুক্তিই একমাত্র কল্যাণেব আকর বোলে, মৌর্য্য রাজপরিবারের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়ে গেল। নিতান্তই ভালমানুষের মতই আর্য্য গুরুদেব প্রথমেই করলেন কি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারেই পিতামহী দেবীর গৃহে তাঁহাবই সকাশে উপস্থিত হলেন। পত্রের সর্ব্বাঙ্গীন মর্ম্ম তাঁর গোচরে আনবামাত্রই দেবী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন,—ঠিক কথাই তো, এতে তিলমাত্রই সংশয়ের কারণ নেই ,—তারপর আমায় আজ্ঞা করলেন, বিন্দু ! এতে আর দ্বিমত করো না, মৌর্য্যরাজ্যের কল্যাণ নিয়েই যখন কথা। তারপর পিতৃদেব যখন সব জানলেন এবং শুনলেন, তিনি বললেন,—এমন সুহৃদের কথা উপেক্ষার বস্তু নয়। ভাল মতেই এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে, বিন্দু ! তারপর দ্বিতীয় অমাত্য আর্য্য কাত্যায়নের গোচরে এলো সেই প্রস্তাবলিপি,—তিনি একেবারেই তটস্থ, তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন,—আমি তো প্রথম থেকেই বোলে আসছি যে যুবরাজ উদ্বাহ সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে ধর্ম্মপত্নীকে নিয়েই তক্ষশীলা প্রান্তে রাজ্যপাট আরম্ভ করবেন। তাতেই এইখান থেকে যাত্রাই হবে জয়যাত্রা।

তারপর জননীর গোচরে যখন এলো সেই প্রস্তাব, সংবাদ-উৎসাহ ও আনন্দে তিনি এমনই বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, কোন কথাই মুখে আর বলতে পারলেন না ;—ছোট রাণী মা, বিভ্‌ভলা দেবী, তিনি এখন সংস্কৃত এবং পালীতে পারদর্শিনী হয়েছেন—এ সংবাদ শুনে তিনিও পয্যন্ত আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ ছটফট করে তারপর ভাবাবেগ প্রশমিত হলে বলে উঠলেন,—

আমি নৃত্য করবো। কেবল এবিষয়ে এখনও কোন মতামত প্রকাশ করেননি স্বয়ং আর্য্যগুরু চাণক্যদেব। যথার্থই এ নাটের গুরু, চুপচাপ বসে বসে কেবলই আদেশ দিচ্ছেন। রাজধানী থেকে তক্ষশীলা প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক কেন্দ্রে সকল কেন্দ্রস্থ কর্ম্মনায়কগণের মাথা ঘুরতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আর সর্ব্বত্র তড়িংগতিতেই কর্ম্ম আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। তবে শুনলাম, তিনি কাত্যায়নের কাছে বলেছেন, এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতে হবে বলেই আমার প্রিয়তম শিষ্যের উপর আমি কখনই অনুরোধের ভার চাপাবোনা। কুমারের কল্যাণকামী, যথার্থই হিতাকাঙ্ক্ষী, স্বজন এবং পরিজন যখন সবাই এই শুভ, বিধাতার অভিপ্রেত শুভকর্ম্মের পক্ষে এক মতাবলম্বী, আমাকেও ঐ মতানুবর্ত্তী হতেই হবে ;—গড্ডালিকা স্রোত থেকে আমার পৃথক থাকা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

সর্ব্বক্ষেত্রেই ব্যবহার কুশল বিন্দুসারের মধ্যে সামাজিকতাও ছিল, ইহা তাহার বান্ধবেরাও জানিত। এখন তাহার এই সরল বিবৃতি, সবার প্রাণে উপভোগ্য সরস মিলনের গাঢ় আনন্দ আনিয়া দিল। এখন ক্ষণেকের জন্য অদ্রীহরির মধ্যেও ভাবান্তর আনিয়া দিল। যাহা হউক, এই সূত্রে এখন প্রবীর বর্ম্মা আর একটি বড় চমৎকার প্রশ্নের মধ্য দিয়াই রহস্যের অবতারণা করিল,—আচ্ছা, এর মধ্যে মহামাত্যের কোন হাত আছে কি ? যুবরাজের কি মনে হয় ?

তবে আর কার হাত থাকবে ? আমায় কিছু দীর্ঘকাল তক্ষশীলা প্রান্তে রাখবার ব্যবস্থা এ রাজ্যের মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তির উদ্ভাবনা হতে পারে? আমার বিশ্বাস যেটা বললাম,—তিনি ছাড়া এই সর্ব্বাংশেই যুক্তিযুক্ত, সকল দিকেই রাজ্যের পক্ষে কল্যাণপ্রদ এক একটি উপায় উদ্ভাবনা আর কে করবে ? এ রাজ্যে তো আর কাকেও দেখিনা।

আশ্চর্য্য এই যে, উনি জাল ফেলে যাকে ইচ্ছা জড়িয়ে ঠিক তুলবেন, কিন্তু ওঁকে কেউ জড়াতেই পারবে না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, ধরুন, আমার এই বিবাহের বিষয়ে, আমি দৃঢ়ই ছিলাম যে, এখন কিছুতেই বিবাহ করে তক্ষশীলা যাবো না। পর বৎসরে বা দুই বৎসরে ইচ্ছামত এসে বিবাহ করবো। উনি তখন যেন এটা অনুমোদনও করেছিলেন। আমায় দেখালেন যেন, ও-সম্বন্ধে আমায় তিনি কোন উপরোধ বা অনুরোধ বা আদেশ করবেন না, বা অপর কারও দ্বারাও করাবেন না ; কিন্তু দেখুন, ঠিক সময় থাকতে এই এই বিষয়টি এমনি রূপান্তর গ্রহণ করলে যে, আমায় বিবাহ করে সস্ত্রীক

সেখানে যেতেই হবে, আর ঐ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনই হবে। যাত্রাদিনের কোন অদলবদল হবে না। অথচ উনি নিজের হাতে যে এর মধ্যে কিছু করেছেন, তার কোন দিকে কোন প্রমাণই নেই। তাঁর কাজের ধরণই আলাদা, এক-মেবাদ্বিতীয়ম,—তাঁতেই খাটে।

বিন্দু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া প্রসন্ন বদনে একবার চারি ধার—সবার পানেই দেখিলেন তারপর বলিলেন, আরও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার,—কাত্যায়নকে পিতৃদেব, মৌর্য্যরাজ-শক্তির অন্তর্গত বিধান-চক্রের মধ্যে কখনই স্থান দিতেন না, দীর্ঘ-কালের আক্রোশ,—কিন্তু দেখুন, এখন তিনি পিতৃদেবের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন—মহা-মাত্য চাণক্যের সঙ্গে একাসনে বসবার অধি-কার,—সভায় এখন ওঁরই প্রতিপত্তি চলছে, সকল কাজে সকল ব্যবস্থায়। আমাকেও বেশ ধীরে ধীরে তাঁর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তবে এটা বুঝেছি কাত্যায়নের মনে আর কোন সংশয় নেই। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। আমরা দেখি, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা আমাদের নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ, অথবা নিজ প্রিয়-জনের কল্যাণ, স্বখসাচ্ছন্দ্য দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু তিনি দেখেন রাজ্যের কল্যাণ কিসে হয়; দেশের বা সমাজের কল্যাণটাই ওঁর লক্ষ্য। সাধারণের সঙ্গে ওঁর এইখানেই প্রভেদ। কোন ব্যক্তিগত বিষয়ের বিচারে এই জন্যই তিনি এতটা নির্ম্মম। এতটা কঠিন।

বিন্দুসার কথাগুলি বলিয়া যেন সবার মুখের দিকে তাহার কথাগুলির প্রভাব লক্ষ্য করিল। তারপর প্রবীরের মুখে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে প্রবীর বর্ম্মা বলিল,—

তাহলে এখন মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় আমাদের থাকা—

বিন্দু বলিল,—কাল শুনেছি, বিদীশা রাজকে সসম্মানে আহ্বান করে, রাজকুমারী ও স্বজনবর্গ—তারপর মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতি সবাইকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে অমাত্য বিল্বহরি এবং সেনাপতি কলহন একটি সময়োচিত বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছেন। এদিকে শিবিরোদ্যানের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল নিয়ে বেশ তৎপরতার সঙ্গে শতাধিক বেশ বড় বড় আরামপ্রদ গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা আজ প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হতে আরম্ভ হয়েছে, আমরা অতটা লক্ষ্য করিনি, এখন শুনে বুঝতে পারছি, এই সকল ব্যবস্থাই কর্ত্তার মনে ছিল। কত আগেই তাঁর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

প্রবীর বলিল,—তাহলে যুবরাজের উদ্বাহ এখন বাদানুবাদের অতীত বিষয় হয়ে গিয়েছে?

বিন্দু বলিল,—তা ছাড়া আর কি,—শুনিয়া প্রবীর বলিল, এখনও কিন্তু ঘোষণা হলোনা।

বিন্দু তাহাতে বলিল,—একটু বিচার করলেই তো বুঝতে পারবেন, রাজধানীতে ঘোষণার অর্থ কি। তাহলে নিত্য নব নব উৎসব, বাইরে থেকে প্রজাসাধারণের আমদানী, রাজপথে দিবা রাত্র কি কাণ্ড ঘটবে,—মাদকের ব্যবহার অসাধারণ বেড়ে যাবে, সকল দিকেই রাজপুরুষদের কর্ম্মও বেড়ে যাবে। তারপর ওদিকে দেখুন, আড়াই থেকে তিন মাসের বেশী সময় নেই; এরই মধ্যে করণীয় সকল কিছু রচনার তালিকা আয়োজনের পর্য্যায়ক্রম সম্পূর্ণ হতেই পারেনি এখনও। তবে দুই এক দিনের মধ্যেই বোধ হয় ভিতরকার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে প্রায় সহস্র লোক কাজে লেগেছে।

প্রবীর বলিল,—এসব কাজ ত সর্ব্বাধ্যক্ষের, আর সমাহর্ত্তারই; অবশ্য অন্যান্য সকল বিভাগের সহযোগিতাও আছে তার সঙ্গে,—

বিন্দু বলিল,—সেটা বাস্তব কর্ম্মের বেলায়, বোধ হয় এখন থেকেই তার কাজ আরম্ভও হোল। আপনি শুধু কর্ম্মের কথাই ভাবছেন, কিন্তু এটা যে এক প্রকার রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার করে তুলতে চান এঁরা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত সকল সামন্ত রাজ্য এ গ্রামে আনতে হবে না!

তাঁদের উপহার সব, রাজপরিবারের একটা অস্বস্তির কারণ করে তুলতে হবেনা ! এ-সবটার পরিধি লক্ষ্য করেছেন ? যুবরাজের উদ্বাহ সংস্কার,—এতটা দ্রুত সম্পন্ন হবার নয়, মহারথ !

মহারথ ভাবিয়া দেখিলেন,—মহারাজের এই যে আনুগত্য,—মহামাত্য আর্য্য চাণক্যদেবের সর্ব্বাবিনায়কত্বে বিশ্বাস, অসাধারণ আস্থা, ইহার সঙ্গত কারণ আছে। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া বিন্দু বলিল,—

এ দিকে আর্য্য গুরুদেবকে আপনি স্বীকার করাতেই পারবেন না যে, তিনিই সব করছেন। এক দিন ভাস্করকে কি বলেছিলেন যদি শোনেন বুঝতে পারবেন তাঁর ভাবটা। ভাস্কর ! বলোনা সেদিন তিনি তোমার কি কথার উত্তরে কি বলেছিলেন।

ভাস্কর বলিল,—সেদিন বিন্দুর বিষয়েই কিছু জানতে বা দেখতে তিনি যুবরাজের নূতন গৃহে এসে উপস্থিত, তখন তিনি ছিলেন না, পিতামহী দেবীর কাছে গিয়েছিলেন তাঁরই আহ্বানে। আমি একলাই ছিলাম। দেখে একটু বসলেন—কয়েকটা বিষয়ে খোঁজ নিলেন,—তারপর কথা প্রসঙ্গে আমি বলে ফেললাম যে, আপনার মত সব দিকেই সুন্দর, অভ্রান্ত, কর্ম্মপন্থা কারো নয়, ও কাজ কেউ করতে পারবে না ; এরাজ্যে আপনার কাজের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। তাতে তিনি বললেন, তুমি দেখেছি বিদূষক শ্রেণীর একজন, দুর্ব্বল বুদ্ধি,—নেহাৎ সেকেলে লোক তো বাছা ! আমি বললাম,—একথা সবাই বলে তাই আমি বলেছি। তাতে বললেন, সবাই যা বলে তুমি তা বলবে কেন ? একটু ভেবে দেখবে না, আমি কি করি ? আমি কিছুই করিনা, কাজ তো আপনি হয়ে যায়। নিয়ম ঠিক থাকলে কাজ তো আপনিই কল্যাণপ্রসূদ হয়। এই দেখোনা, সৃষ্টি থেকে এই বিশ্বজগতের কাজ চলেছে, কেউ কি নিজের হাতে একটি একটি করে করছে,—সৃষ্টির নিয়মেই প্রজা জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, একটা বৃত্তি গ্রহণ করে উন্নত হচ্ছে, আত্মরক্ষা করছে,—আবার সেও প্রজা উৎপন্ন করছে,—এ সব কি কেউ করিয়ে দিচ্ছে, সেই রকমেই একটা রাজ্যের কাজ চলে। হাঁ, বলতে পারো, এখানকার নিয়মগুলি ভালো। তাতে শুধু আমার গুণই বুঝায় না। প্রথমে রাজা সেই নিয়মগুলির উপযোগিতা বুঝেছেন, মন্ত্রিমণ্ডল আস্থাবান বলে সেগুলি কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন, তারপর কর্ম্মচারিবর্গ সেগুলি পরিপাটি রূপে ব্যবহার করছেন তবেই না প্রজাবর্গ সচ্ছন্দগতিতে চলতে পারছে ? একজনের গুণে রাজ্য চলে নাকি ?—এই সব বলে আমায় বোবা করে ছাড়লেন। শেষে হেসে

পিট চাপড়ে বললেন,—একজনের উপর অশেষ গুণের অরোপ করে দেখা, নিজের উচ্চ আদর্শের দিক দিয়ে ভালো,—কিন্তু আলোচনার বিষয় নয়, পাঁচ জনের কাছে সেটা আলোচনায় নিজের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া কারো গুণের কথা, মাত্রা ছাড়ালেই তোষামোদের পর্য্যায়ে পড়ে,—অবশ্য তুমি বিন্দুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাই তোমায় এতটা বলতে পারলাম,—জানি, তুমি ঠিক বুঝবে। বলে—হেসেই আকুল।

মহারথ এইবার সত্য বুঝিলেন, বিন্দুসার মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাটের উপযুক্ত ভাবেই প্রস্তুত এবং রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল দিকেই তার এই বয়সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবেই আছে। আর্য্য মহামাত্যের হাতে-গড়া মানুষ একটি। যাহা হউক, আজ বিন্দুর আবির্ভাবে এই নিমন্ত্রণ-সভা বহুক্ষণ জাগ্রত এবং বিন্দুর ব্যক্তিত্ব সবারই অনুভবের বস্তু হইয়াছিল। তিন চার দণ্ড ছিল বিন্দুসার। যথাকালে সময় বুঝিয়াই ভোজনের পূর্ব্বেই বিন্দুসার উঠিয়া প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণের পর ভাস্করকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তার পরে চারিদিকে, রথ-পার্শ্বে বিন্দুসারকে দেখিতে বহু নরনারী, বালক-বালিকার সমাবেশ হইয়াছিল। বোধ হয় প্রত্যেকেই তাহার প্রসন্ন এবং উজ্জল সস্মিত বদনের ইঙ্গিৎ, রত্নমণ্ডিত শিরোদেশে উষ্ণিষের উর্দ্ধ অধঃ সঞ্চালন্ সূত্রে তাহার হৃদ্যতা লাভ করিয়া রাজ-দর্শনের ফললাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

বিন্দুসার কোথাও ভোজনে যাইতেন না; রাজপুরীর মধ্যে রাজ অরালিকের রন্ধন ব্যতীত অপর কোথাও ভোজন গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা সবারই জানা কথা; তাই কেহ তাহাকে ভোজনে অনুরোধ করেন নাই। এখানে এখন, বিন্দুসার প্রস্থান করিলে সকলকার জন্য, ভোজনের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন উদ্দেশ্যে বিবিধ পাত্রে নির্ম্মল জল আনীত হইলে পাদমুখ ধৌতির পর ভোজনস্থানে নীত হইল।

দুইসার আসন পড়িয়াছে। প্রত্যেক সারে ছয়টি সুন্দর, এক বুরুল স্থূল গালিচার চতুষ্কোণ আসন, তার সম্মুখে একখানি এক বিঘৎ উচ্চ কাঠের নানাবর্ণের আলিম্পন অলঙ্কৃত চৌকীর উপর, রজত পাত্রে ভোজ্য, কাটোরাতে উপকরণাদি, ঐরূপ রজত পাত্রে পানীয় রাখা ছিল। সবাই গিয়া বসিলে ভোজন আরম্ভ হইল। বিদ্রা এবং পুষ্পদত্তা দুইজনে পরিবেশন করিল। যে সারে প্রবীর বসিয়াছিল, পুষ্পদত্তা সেই সারে জোগাইতেছিল আর অদ্রীহরি যে সারে ছিল, বিদ্রাঙ্গী সেই সারেই পরিবেশন করিতেছিল।

গাম্ভীর্য্যের আড়ালে সকল বেদনা লুকাইয়া ফেলিলেও অদ্রীর উৎসাহহীনতা এখন সবারই লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। তবে কেবল বিক্রমই মর্ম্মে মর্ম্মে এটা অনুভব করিতেছিল। এখন পরিপাটি প্রস্তুত নানা প্রকার মাংস পিষ্টকাদি—প্রত্যেক পদটি উপাদেয়, বিদ্রার নিজ হস্তে সযত্নে প্রস্তুত,—বোধ হয় প্রত্যেকেই উপভোগ করিতেছিল। একমাত্র খণ্ডী প্রবীরের পার্শ্বে বসিয়া রসিকতায় সবাইকে হাসাইতেছে ; বিশেষতঃ যখন পুষ্পদত্তা কোন একটি খাদ্য প্রবীর বর্ম্মার পাতে অর্পণ করিতেছিল তখন, দেখো পুষ্পদত্তা, এখানে এখন পক্ষপাত দেখানো তোমার উচিত হচ্ছে না, আমরা এতগুলি এখানে অনেক কিছুই আশা করছি। এই সব বলিয়া পুষ্পদত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল। এই ভোজনের মধ্যে আজ খণ্ডী না থাকিলে আজিকার ভোজন এতটা তৃপ্তিকর হইত না।

বৈকালে খেলা ছিল, প্রথম লক্ষ্য পরীক্ষা, তীর-ধনু লইয়া অপূর্ব্ব কৌশলে বাণ-নিক্ষেপ—নানা প্রকারে, গভীর অধ্যবসায়ের ফলে অসাধারণ অসুবিধার মধ্যে অস্ত্রচালনা করিয়া লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত। শেষে শব্দভেদি বাণের প্রয়োগ। শব্দ লক্ষ্য করিয়া একস্থান হইতে বাণক্ষেপ, ঠিক সেই শব্দের উৎপত্তিস্থলে বাণ গিয়া শব্দকারী বস্তুকে বিদ্ধ করিল। এই সকলের মধ্যে অদ্রী, অন্য স্বাভাবিক মনের শান্ত অবস্থায় যতটা আনন্দ পাইত, তাহা না পাইলেও অন্তরক্ষেত্র তাহার অনেকটাই সহজ হইয়া গেল। সব শেষে গান, পল্লীগীতি,—তখন-কার বহু প্রচলিত, রামায়ণ মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া গান।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের দুই বন্ধু, বিদ্রা এবং প্রবীরের নিকট বিদায় লইয়া শিবিরোদ্যানে যাত্রা করিল।

ইতিমধ্যে সেই অন্তঃপুরের মধ্যে আসিয়া এমন কি ঘটিল যাহাতে অদ্রীর এই ভাবান্তর, তাহাকে এতটা বিষণ্ণ এবং এতটা ম্রিয়মান, স্ফূর্ত্তিহীন নিরানন্দময় করিয়া তুলিল! তাহার ভগিনীই এ বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিবেন ভাবিয়া প্রবীর তখনকার মত আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তখন নীরব রহিল। এখন বৈকালে একটি উৎসব ছিল ; উহা তীর-ধনুর প্রতিযোগিতা। সে যদিও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল কিন্তু বোধ হয় আমাদের অদ্রীহরির মনের এই অশান্তিকর অবস্থার প্রভাবে সকলগুলিই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সবাই যে যাহার নিজ স্থানে চলিয়া গেল। তবে সবাই জানিয়া গেল বিন্দুসারের

লগন-কাল আসিয়া পড়িতেছে। একটি বিশেষ উৎসব-আনন্দের ব্যবস্থা অতি সত্বরই আরম্ভ হইবে।

পরদিন বিদ্রা সোজা মহামাত্য চাণক্যদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইল। তিনি দর্শনার্থী দূত এবং আর আর সকলকে রাখিয়াই বিদ্রাঙ্গীকে আসিবার অধিকার দিলেন। বিদ্রা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, পুষ্পদত্তার বিবরণ তো সবই শুনেছ, ক্ষমাও করেছ কিন্তু আমার অনুরোধ, ওর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ যেন রেখ না; অদ্রীহরির সম্বন্ধে যা মনে করেছ সেটাও কদাচ যেন আর মনে স্থান দিও না। এই বলিয়া বিস্ময়াবিষ্ট বিদ্রার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন।

এখন বিদ্রা, কতকটা বিস্ময় কাটাইয়া সসঙ্কোচেই বলিল, দেব! বোধ হয় অদ্রী ওকে গ্রহণ করতে পারে, এমনই একটু যেন আশা হয়।

ভুলেও ও আশা স্থান দিও না। মহামাত্য বলিলেন, সে কি পুষ্পদত্তার সব কথাই শুনেছে?

আভিচারিক মারণক্রিয়ার সাহায্যে আমায় হত্যার প্রচেষ্টা পর্য্যন্ত শুনেছে ওর মুখেই। কি জন্য যে এই হত্যার চেষ্টা, সেটা শোনেনি।

দেখো, তুমি নারী, সহজেই তোমার স্বজাতি-বিমুখতা যতটা, আবার স্বজাতির প্রতি সহজ আনুরক্তিও অতটাই। একটি অমন সুন্দরী নবীনা এত অল্প বয়সেই তার জীবন এভাবে একেবারেই নষ্ট হবে, তাই নিজ সহোদরের সঙ্গে মিলিয়েও তাকে সুখী করতে চেয়েছিলে। অদ্রীকে পেলে যদি ও সুখী হয়, ওর জীবন সুখে কাটে, এই মনে করেই একটু পক্ষপাতিনী হয়েছ। কিন্তু তুমি ওর প্রকৃতি জানো না। ও শুধু রাজদণ্ডের ভয়ঙ্কর পীড়নের মূর্ত্তি দেখে কেবল প্রাণভয়েই এতটা নরম হয়েছে। প্রবীরকে না পেয়ে ও নিরস্ত হবে মনে করো না। কারণ ওর ভ্রম কোথায় আর ওর অধিকারই বা কতটা ওর এখনও ধারণাতেই আসেনি। এমন কি তোমায় হত্যা-চেষ্টার জন্য ও মোটেই অনুতপ্ত নয়। ওর দৃষ্টিভঙ্গীটাও বিজাতীয়। এইটি আমায় সবার বড় আশ্চর্য্য লাগে। আমি দীর্ঘকাল নারী প্রকৃতি অনুধাবন করতে কাটিয়েছি, এ প্রকার অদ্ভুত মনোভাব কোন নারীর দেখিনি। এ পর্য্যন্ত তাই আমিও ওর পরিণাম দেখতে বদ্ধ-পরিকর। ওর ধারণা, এ ব্যাপার জানাজানি না হলে ওর উদ্দেশ্য সফল হতো আর তাই ঠিক হতো এবং তাতেও যদি প্রবীরকে ও না পেতো তা হলে ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে হয়তো প্রবীরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

কারণ ওর সুখের হন্তা সে হয়েছে। ওর ধারণা, ওর জীবনের সুখ যেমন করেই হোক অর্জ্জন করাই ওর ধর্ম্ম। তাই বলছিলাম, ওর ভাবটা বিজাতীয়, এ ভূমির ধারা অনুসারী নয়। তুমি অদ্রীর ভাব কি বুঝেছ ?

আমার মনে হয়েছিল, প্রথম দর্শনেই অদ্রী ওর রূপে মুগ্ধ আর ওর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। তবে ওর দুঃখ দূর করতেই, ওর মুক্তির জন্য অদ্রীই আমায় ওকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করেছিল, তখন সে মনে করেছিল অপরাধের ধরণটা ভিন্ন প্রকৃতির ; কিন্তু যখনই ওর মুখেই আমায় হত্যার ষড়যন্ত্রের নায়িকা বোলে স্বীকৃতি শুনতে পেলে তখনই দেখলাম ওর মুখে আর সে প্রফুল্লতা নেই। সেটার মূলে কি ভাব ছিল, তা আমি এখনও জানি না।

চাণক্য বলিলেন,—আমার একটা ভয় আছে পাছে অদ্রীর মনের উদারতা ওর ক্ষমাপ্রীতি নিয়ে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে নিয়ে এ জগতে এক প্রবীর ব্যতীত অপর কারো সুখী হবার সম্ভাবনা নেই। এই শ্রেণীর জীবের ভাবই আলাদা। জানিনা ওর পরিণাম কি হবে!

সত্য কথা ওর মুখে আটকায় না তা যতই ভীষণ হোক। বিদ্রা বলিল,—কোন সঙ্কোচ নেই ওর মধ্যে—এমনটি আমার জীবনে আর কাকেও দেখিনি। ওর মা, সব কথা শুনে বলে আমি আত্মহত্যা করবো।

চাণক্য বলিলেন,—ঐ স্নেহের পুতুলটিকে রেখে তার মরা হবে না—নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু আমার একটি আশা আছে, যদি তা ঘটে ঐ পথেই ওর জীবন পরিবর্ত্তিত হতে পারে। যদি কোন সুযোগে ওর অধ্যাত্ম ধর্ম্ম-বুদ্ধি আসে তা হলে ও অতীব উচ্চস্তরের জীব হয়ে যাবে। কিন্তু ওকে যে টানতে পারবে সে কোথা ?

আমার আর কোন কর্ত্তব্যই রইলো না তা হলে!

নিশ্চয়ই নয়। এখন আর তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখা উচিত নয়। ওর প্রতি স্নেহবশতঃ অজ্ঞান এবং প্রেমান্ধ বালিকা বলে রাজদণ্ড থেকে ওর প্রাণ রক্ষা হলো ঐ পর্য্যন্তই। অতঃপর কোথাও কারো সহানুভূতি পাবে না। ভাগ্যক্রমে যদি কখনও ওর মতিগতির পরিবর্ত্তন হয় তবেই ওর রক্ষা, না হলে ওর পরিণাম ভয়াবহই মনে করি। এখন আমার ওর গতির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

তবে দশকর্ণ প্রাড়বিবাকের কাছে ওর এবং ঐ ভৈরবের রাজবিধি অনুসারে বিচার হবে; সুতরাং, ওর সকল প্রচেষ্টার কথা আগাগোড়াই প্রচারিত হয়ে যাবে। এতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

বিদ্রা বলিল, যদি তাঁর (প্রবীর বর্ম্মার) আপত্তি না থাকে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে এটী পুষ্পদত্তার ভবিষ্যৎ জীবনে, সামাজিক ব্যবহারের দিক দিয়ে ক্ষতিকর হবে নাকি ?

হাসিয়া মহামাত্য বলিলেন,—যদি ঐ আভিচারিক ক্রিয়ার ফলে তোমার মৃত্যু ঘটাতে পারতো তা হলে কি ওর কণ্টকশয্যা থেকে তুমি ওকে বাঁচাতে পারতে ? এ কলঙ্ক ওকে নিতেই হবে—সমাজ একটি জাগ্রত প্রতিষ্ঠান,—মানুষ দুর্ব্বল হতে পারে—ক্ষমা করতে পাবে,—সমাজদেবতা ক্ষমা করবেন না। বড় জীবন্ত বড় ভীষণ অকরুণ দেবতা, তুমি একে চেনো না। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা।

বিদ্রাঙ্গী প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, ঐ ভৈরবের কি দণ্ড হবে ? আচার্য্য বলিলেন,—ওর প্রাণবধ করা হবেনা, ও ব্রাহ্মণ, ওকে দেশান্তরী করা হবে,—তবে অপমানিত হয়েই এ ভূমি ত্যাগ করতে হবে।

*　　　*　　　*

বিন্দুসার প্রবীর বর্ম্মার গৃহে যাহা বলিয়াছিল, ঠিক ঠিক তাহাই ঘটিয়া গেল। দুইএক দিনের মধ্যে ঘোষণা হইল, আগামী ফাল্গুনের দ্বিতীয় দিবসে বিন্দুসারের শুভ পরিণয় উৎসব সম্পন্ন হইবে, বিদীশা রাজকুমারীর সহিত পরিণয়ের পরেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তক্ষশীলা যাত্রা করিবেন।

অবশ্য এই বিরাট উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন বর্ণনা তো দূরের কথা, আংশিক বর্ণনাও সম্ভব নয়। উহা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের ব্যাপার। যথার্থ সেই ভাবের উৎসবের ধারণা এখনকার দিনে কাহারও নাই; কাজেই, তাহার প্রয়োজনও নাই। বিন্দুসার যে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার বলিয়াছিল, এ প্রায় তাইই। পূর্ণ মাঘ মাসটি এবং ফাল্গুনের এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাজধানীতে এমনই উৎসব চলিয়াছিল, যাহা বহুকাল মগধের নগরবাসিগণের ভাগ্যে ঘটে নাই। বাহিরের লোক এত আসিয়াছিল যে, নগরের মধ্যে স্থানাভাব তো হওয়াই স্বাভাবিক; নগরের প্রান্তে এবং প্রাচীরের বাহিরে, তার পর গঙ্গার তীরে তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বহু সহস্র নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। বিদীশার লোকেরা এ নগর পূর্ব্বে দেখে নাই; তাহারা যতদিন বাস করিয়াছিল—তাহাদের উন্মত্ত ভাব নগরবাসীর পক্ষে এক বিশেষ হাস্য-পরিহাসের খোরাক যোগাইয়াছিল। সেই জন্য রাজা তাহাদের শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক সঙ্গে এত উৎসবের বাহুল্য শতাব্দীর মধ্যে কচিৎ ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ মদ্য মাংস মৎস্য

দধি দুগ্ধ ঘৃত শর্করা শাক-সবজি সংগ্রহের কোন হিসাব নিকাশ ছিল না ; কারণ, তখনকার দিনে উহা সহজেই পাওয়া যাইত এবং উৎসবের কালে প্রজাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যোগান দিত। রাজভাণ্ডার একদিকে খালি হইয়াছিল বিবিধ প্রকার দানে এবং বহুবিধ প্রার্থীর বহু প্রকারের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে। সুতরাং, প্রাপ্তির কথায় কাজ নাই ; কারণ, এক সপ্তাহের উপর নাগরিকগণের প্রত্যেক গৃহের অশন-বসনের প্রশ্ন ছিল না। অবশ্য নানাবিধ ব্যয়ের জন্য রাজকোষের শূন্যতা অন্যভাবে পূর্ণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবে গান্ধার প্রান্তপাল যযাত বনদীপ আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আসা সম্ভব ছিল না ; কারণ, যুবরাজের তক্ষশীলায় যাত্রা এবং অবস্থিতির সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজনের ভার তাঁহারই উপর ; সেই কারণেই প্রান্তপাল উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া পুত্রস্থানীয় এক আত্মীয় রুদ্রনারায়ণ তাহার নাম,—আসিয়াছিল এবং কথা ছিল, যুবরাজের সহিত সে ফিরিবে, যেহেতু পথে অনেক প্রকারেই সাহায্য করিতে পারিবে। বিবাহের পর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনের তো আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না। শিবিরোত্থানেই রুদ্রনারায়ণের স্থান হইয়াছিল, সুতরাং বিক্রমজিৎ ও অদ্রীর সঙ্গে ঐখানেই তাহার মিলন বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই ঘটিযাছিল। যেন এই যুবকটি—রুদ্রনারায়ণ তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়ভাবেই মিলিয়া গেল। প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর তাহার, অসাধারণ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ বলিয়াই তাহার খ্যাতি। অদ্রীর সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব হইল বড়ই ঘনিষ্ঠভাবে। সত্য বলিতে কি, অদ্রীর, ইহাকে পাইয়াই তাহার অপাত্রে প্রথম পবিত্র প্রেমার্পণের যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিয়া গেল। অদ্রী সেইজন্য এই রুদ্রনারায়ণকে ভগবৎ প্রেরিত মনে করিয়াছিল।

এই শুভ যোগাযোগের মধ্যে বিন্দুসারের অভাবনীয় মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল—আর সেটি প্রথমেই লক্ষ্য করিল ভাস্কর দামোদর, তাহার অভিন্নহৃদয় সখা এবং সহচর। বিদীশা রাজকুমারী বধূরূপে যখন মৌর্য্য রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সেইদিন হইতে বিন্দুসারের শয়নকক্ষও অন্তঃপুরেই নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথম সাক্ষাৎ ভাস্কর এইভাবেই পাইল। যদিও তাহাদের অর্থাৎ ভাস্কর ও গন্ধর্ব্ব, উভয়ের স্থান ঠিকই রহিল, সেদিকে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না কিন্তু কি জানি, মনের মধ্যে একটা এই ভাবের দুঃখ আসিয়া এই বলিয়া তাহাকে বেদনা দিতে লাগিল যে, আজ হইতে বিন্দুসার তাহার পর হইয়া গেল ; তাহার সঙ্গে আর অন্তরের কোন সম্বন্ধই রহিল না। শুধু এইটুকুই নয়, একটি বালিকার কথাও তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল, এতটা গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমের অধিকারিণী

বলিয়া বিন্দু তাহাকে পাটরাণী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সেই অভাগিনীর কি গতি হইবে! সে-ও তাহার মতই বিন্দুসারের অন্তরস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে ;—এখন আর বিন্দুসারের সঙ্গে যেন তাহার সে কথা উত্থাপন করিবারও সাহস নাই। হায় হায় করিয়া উঠিল তাহার কোমল প্রাণ,—তাহার সমবেদনা-পীড়িত মনে কোন সান্ত্বনা-বাক্যই আসিল না, এমন কোন কথা মনেই আসিল না, যে কথাটী তাহার কাছে পৌছাইয়া সে একটু নিজের দায় হাল্‌কা করিতে পারে। এ যেন চির আচরিত একটা প্রথাব মত, একটি মানবের সঙ্গে আর এক মানবীর ব্যবহার ক্রম অনুসারে ঘটিয়া গেল। ইহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে দোষী করা চলে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পীড়িত অন্তরেই ভাস্কর বুঝিল, এই রাজপুরীর বায়ুমণ্ডলে ইহাই স্বাভাবিক,—রাজবংশীয়গণকে সেই ধারাতেই ভাবাইতেছে, বাহিরের সঙ্গে শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। যে সূত্রে সে বিন্দুকে বুঝাইতে গিয়াছিল যে, তুমি উচ্চ রাজকুলোদ্ভব ভবিষ্যৎ সম্রাট, তোমার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের তুলনা হইতে পারে না ;—এখন বুঝিল, সেই ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার এই অভাগিনীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—এখন কেহ আর সে কথা উঠাইল না। পিতামহী যিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি বিদীশা রাজকুমারীকে কোলের কাছে লইয়া আনন্দে ব্যস্ত—বিন্দুও আর কোন কথা ঐ অভাগিনীর সম্বন্ধে তাঁহার কাছে উত্থাপন করিতে ভরসাই পাইতেছে না ;—কি অদ্ভুত ব্যাপাব বিন্দু আর সেই বালিকার সঙ্গে ঘটিয়া গেল যে, তাহার একমাত্র আশার দীপ বিন্দুসারের জীবনেতিহাসে তার কোন চিহ্নই থাকিবে না, রাজকুমারী চম্পাবতীই এখনকার যুবরাজের একমাত্র সহযোগিনী, সোহাগিনী—ভবিষ্যৎ রাজমহিষীই রহিয়া গেল। চমৎকার এই জগৎ, আরও চমৎকার রাজকুমারগণের যথাবিধি শাস্ত্রসম্মত বিবাহের পূর্ব্বাবস্থার প্রণয়-লীলা।

পুষ্পদত্তার কথা অদ্রী মন হইতে একেবারে দূর করিতে পারে নাই। এতটা অল্পকালের পরিচয়ের মধ্যে তাহার অন্তরক্ষেত্রে প্রেমের জন্ম ও মৃত্যু—দুই অবস্থাই ঘটিয়া গেল। একটা কথা তাহাকে বারবার বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে—কি একটা ব্যাপার সেদিন হঠাৎ ঘটিয়া গেল, বিদ্রার বাড়িতে। কে যেন তাহার সরল, অন্তরতম হৃদয়ে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া স্নেহপূর্ণ দিব্যভাবে আলোকিত করিয়া পরক্ষণে হৃদয়াকাশ অন্ধকারে আবৃত করিয়া অন্তর্হিত হইল। কি যে

হইয়া গেল, সে কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিল না ; কে যেন তাহার হৃদয়মন লইয়া খেলা করিতেছে ;—সে অদৃশ্য শক্তি তাহার কল্পনার অতীত। .

তা বলিয়া সে পুষ্পদত্তাকে কোন মতেই অপরাধী করিতে পারিতেছে না।

একদিন বিন্দুসারের বিবাহ উৎসব শেষ হইবার পর বিদ্রার আহ্বানে সে যাইতেছিল। তাহাদের তক্ষশীলা যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে তাই দেখা-শুনা করিতেই এই আহ্বান। মধ্যপথে বিঘ্নেশ গণপতি মন্দির অতিক্রম করিবার সময় দেখিল, মন্দিরের এক সোপান উর্দ্ধে এক স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পুষ্পদত্তা অধোবদনে, গালে হাত, নিম্নদৃষ্টি, উপবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্রই এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য তাহার প্রাণে সঞ্চার করিল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সে যন্ত্রচালিত একজনের মত পুষ্পদত্তার নিকটে উপস্থিত হইল, কিন্তু পুষ্পদত্তার ধ্যান ভাঙ্গিল না বা দৃষ্টি নড়িল না দেখিয়া সে মৃদুস্বরে ডাকিল, পুষ্পদত্তা ! এবার সে চমকিত হইয়া দেখিল।

আপনি আমাকে—আশ্চর্য্য, বলিয়া পুষ্পদত্তা অদ্রীর ঘোড়ার দিকে দেখিল। তারপর বলিল, ভগিনীর গৃহে যাচ্ছেন বুঝি ?

তাই বটে, আমি তোমায় এখানে দেখে সম্ভাষণ না করে থাকতে পারলাম না ; যদিও জানি, তোমার সঙ্গে আমার কোন কালেই গভীর সম্পর্ক ঘটবে না। তবে একটা কথার উত্তর পাবার জন্যই ছটফট করছি।

কি কথা এমন যার জন্য আপনার এতটা আগ্রহ, বলিযা বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষে সে অদ্রীর দিকে চাহিয়া অপেক্ষায় রহিল। অদ্ভুত এই নারী,—তাহার কথা বলার ভঙ্গীও অদ্ভুত, তাহার চাহনিটাও অদ্ভুত।

তুমি এত সুন্দর, এতটা বিস্ময়কর বিধাতার সৃষ্টি,—তোমার মধ্যে এই হলাহল প্রবেশ করলো কি করে, কেন তুমি নিরীহ বিদ্রার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলে ? বলিয়া, অদ্রী চিন্তিতভাবে পুষ্পদত্তার দিকেই দেখিতে লাগিল।

ও, তা বুঝি জানেন না,—সেদিন সবটা শোনা হয়নি, আজ যখন দেখা হলো সব কথা শুনে যান। একমাস আগে এক রথচালনার দিন, প্রবীর বর্ম্মা বিজয়ী হয়ে এসে ধ্বজদণ্ড মূলে দাঁড়ালো,—তার গলায় জয়মাল্য দিয়েছিলাম আমি আর সেই সঙ্গেই আমার সব কিছুই তুলে দিয়েছিলাম তার হাতে। তখন এতটা বুঝতে পারিনি, তারপর অল্পদিনেই বুঝলাম, আমার মনপ্রাণ আমার বশে নেই, সবই দেওয়া হয়ে গিয়েছে দেহ-মনপ্রাণ—সবকিছুই উৎসর্গ করা হলো, কিন্তু সে এমন পত্নী-প্রেমে অনুরাগী, কোন মতেই আমার এ উৎসর্গ দেখতে পেলে না।

তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারিনি। তার সতীত্বেরও কোন গৌরব নেই, কারণ সে অন্ধ। সেই স্ত্রী থাকতে—সেই বাঁজা পুতুলটি থাকতে তাকে পাবার আর কোন আশা নেই,—যখন এটা স্থির বুঝলাম, তখনই তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাই করলাম। স্ত্রীকে সরিয়ে দিলেই তাকে পাবো, আমার প্রতি তার দৃষ্টি পড়বে, এই জন্যই সে চেষ্টা, বুঝেছেন? আসল কথাটা শুনলেন তো এখন।

একটু থামিয়া,—একটু ব্যাঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, হাসি পায়,—এর পর তোমার কথা ভেবে। তুমি এখনও কুমার,—সরল প্রাণেই, আমার উপর কৃপা দেখাতে তুমি এগিয়ে এলে আমাকে উদ্ধার করতে। কোশলের বীর নাকি তুমি, শুনেছি! আমার তো আর তোমায় দেবার কিছুই নেই; স্পষ্ট কথাই বলছি,—আমার প্রাণ নিয়ে একজন ভাঁটা খেলছে, আমি তারই ধাক্কা সামলাচ্ছি। প্রাড়বিবাকের বিচারে এত কাণ্ড হয়ে গেল, আমি ছাড়া আর কেউ রক্ষা পেল না,—শুনেছ তো? এখন আবার কি করতে বলো আমায়?

এখন অদ্রীর জানিতে ইচ্ছা হইল,—এখন সে কি করিবে। বলিতেও চাহিল ঐ কথাটা, তুমি কি করিবে? প্রশ্নটা কিন্তু হঠাৎ স্বতঃ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল অন্য ভাবেই, তোমার কি গতি হইবে? উত্তরে পুষ্পদত্তা বলিল,—এই দেখ, তুমি কেমন অবুঝ গো; নারী-হৃদয় বুঝ না, একজনের স্নেহ পেলাম না বোলে আর একজনকে ধরতে যাবো,—বাজারে মাল কিনতে এসে একটা মনোমত পেলাম না তাই আর একটা কিনবো? সে মেয়ে আমি নই;—কাউকে চাই না, আমি একলাই ছিলাম, একলাই থাকবো।

এইবার অদ্রীর অন্তরের সবকিছু গ্লানি দূর হইয়া সহজ স্বচ্ছ হইয়া গেল। এই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণ অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে সরল প্রাণে দুইহাত জোড় করিয়া বলিল,—তুমি আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ, এখন আমার মধ্যে আর কোন গ্লানি নেই। মহাবীর তোমার কল্যাণ করুন,—বলিয়া অশ্বারোহণ করিয়া অদ্রী গন্তব্যপথেই যাত্রা করিল। তাহার মনের মধ্যে কেবল এই কথাটাই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—তুমি কেমন মানুষ গো, এ কি বাজারে মাল কিনতে আসা, একটা মনোমত পেলেম না তাই আর একটা কিনবো?

পুষ্পদত্তা যেভাবে ছিল সেই ভাবেই রহিল, অদ্রীর পানে লক্ষ্যই করিল না। এত রূপ,—তার এ কি পরিণাম! জগদীশ্বরের সৃষ্টিই বিচিত্র!

শেষ
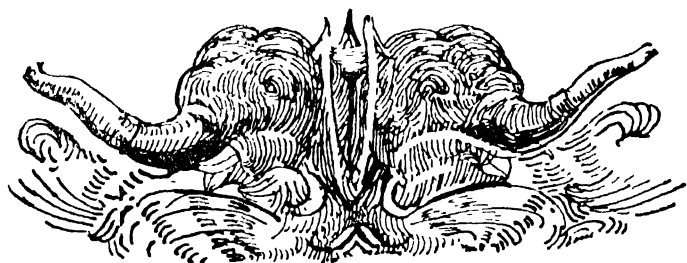
ফাল্গুনী পূর্ণিমা,—আজ কুসুমপুরে উৎসবের সীমা নাই।

যুবরাজ বিন্দুসার—গান্ধার শাসনভার লইয়া আজ তক্ষশীলা উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিতেছেন। গঙ্গাতীর ধরিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত,—বিশেষতঃ রাজপুরীর ঘাট হইতে দুই দিকেই প্রায় অর্দ্ধক্রোশ জুড়িয়া নৌকার সারি। নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নানাপ্রকার জলযান, তাহাদের আকারও ভিন্ন ভিন্ন, আজ কয়দিন হইতে ক্রমে ক্রমে আহরিত হইয়া, নানা উদ্দেশ্যে নানা দ্রব্যে পূর্ণ হইতে ছিল, আজ তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল নৌকার মধ্যে বহুতর দীর্ঘ পথ ও যাত্রিবাহী নৌকা, তাহার সঙ্গে মালবাহী নৌকাও অনেক ছিল। তা ছাড়া সৈন্যবাহী বড় বড় নৌকা—প্রায় জাহাজের মতই তাহাদের আয়তন,—তবে নৌকায় যে সৈন্যদল যাইবে, তাহা শরীর রক্ষী সৈন্য সংখ্যায় পাঁচশত মাত্র, তাহারা যুবরাজের অগ্র ও পশ্চাৎ যাইবে ,—অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতি দুই সহস্র স্থলপথেই যাইবে। যুবরাজের নিজ ব্যবহারের নৌকায় তিনি যাইতেছেন সঙ্গে সহচর ও শরীররক্ষী বাহিনী হইতে নির্ব্বাচিত চারিজন পার্শ্বরক্ষক এবং দুই সহচর ভাস্কর ও গন্ধর্ব্বনল, আর আমাদের দুই কোশলাগত বন্ধুকে লইয়া কয়েক জন রাজনৌকার সঙ্গেই থাকিবে; তাহার মধ্যে পুরোহিত এবং লেখক দুইজন ভৃত্য লইয়া কয়েকজন ঐ নৌকায় যাইতেছে। তাহার পরেই বিদীশা রাজকুমারী এবং তাহার চারজন সহচরী,—তাহার সঙ্গে মহারাজের নারী রক্ষীদল হইতে মহারাজের আদেশ-ক্রমে চারিজন যুবরাণীর রক্ষক হইয়া ঐ নৌকায় যাইতেছে, তক্ষশীলায় তাহারা রাণীর সঙ্গেই থাকিবে। তাহার পর কয়েকটি মালবাহী নৌকার সঙ্গে একটি সৈন্যবাহী বৃহৎ নৌকা। এই ভাবেই যাত্রার আয়োজন। রাঘব বৈশালা সচিব ও পিঙ্কড় বিশ্বামিত্র কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া সকল তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত সহায়রূপে সঙ্গে চলিয়াছে।

এই বাহিনী লইয়া যুবরাজের তক্ষশীলা যাত্রাপথ প্রথমে নৌকায় কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জলপথে; অতঃপর স্থলপথে গান্ধার পর্য্যন্ত। নির্দ্ধারিত পথে, প্রায় অষ্টবিংশ দিনে পৌছিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, পাটলীপুত্র হইতে দ্বিতীয় দিনে বারাণসী ধামে। কাশী ধামে দুই দিন ও ত্রিরাত্র বাস করিয়া প্রয়াগে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানপুরে যাত্রা। মহারাজের আদেশে বিক্রম পিতৃদেবের

অনুমতি গ্রহণ করিবেন। তিনি অনুমতি দিলে বিক্রম যাইবেন,—অবশ্য মহারাজ শত্রুজিতের অনুমতি, কুসুমপুরে যখনই বিক্রম ও অদ্রীর বিন্দুসারের সহচর উপদেষ্টা হইয়া যাইবার প্রস্তাব হয় তখনই স্বীকৃত হইয়াছিল,—এখন যাত্রাপথে পিতৃচরণে প্রণাম এবং যথারীতি অনুমতি লওয়া নিয়ম রক্ষা মাত্র। ইচ্ছা করিলে, বিক্রমের সস্ত্রীক যাইবার অনুরোধও ছিল কিন্তু বিক্রমের স্ত্রী কোশলের যুবরাণী এখন সন্তানসম্ভবা, তাই এ যাত্রায় তাঁহার যাওয়া ঘটিল না, পরে যথাকালে রাজকুমার বিক্রম ইচ্ছামত লইয়া যাইবেন। যাহা হউক, প্রয়াগে পৌছিয়া ত্রিরাত্র বাস করিয়া তাঁহারা যাত্রা করিবেন,—বিন্দুসার এ যাত্রায় প্রতিষ্ঠানে দুর্গমধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সকল কিছু দেখিয়া শুনিয়া, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য জানিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়াগ তীর্থের অভাব আক্ষেপ মিটাইয়া লইবেন। প্রয়াগ হইতে পুনরায় নৌকাপথে কান্যকুব্জ উদ্দেশ্যে যাত্রা,—তৃতীয় দিনে কান্যকুব্জ অবতরণ। এখান হইতেই স্থলপথ, তাহাতে যাত্রার ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছে। রথ ও অশ্ব এবং রাজপুরবাসিনীগণের জন্য শিবিকা প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল।

বিন্দুসার, অদ্রী, বিক্রম—সকলেই অশ্বারোহণেই যাইবেন। কাজেই, একদল—বেশ বড়ই একদল অশ্ববাহনে, একদল রথে—অপর ঐ সকল মালবাহী শকটের সঙ্গে পদব্রজে যাইবে। রাজকুমারীরও সহচরী, দাসী প্রভৃতি যাইবার—ঐস্থান হইতে তক্ষশীলা পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিবার যথাবিহিত ব্যবস্থা হইয়াছে। কান্যকুব্জ হইতে মৌনপুরীতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাত্রি যাপন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কোথাও একাধিক রাত্র বাস কদাচ না হয়। মৌনপুরী হইতে অগ্রসর হইয়া মথুরায় ত্রিরাত্র বাস করিবার উপদেশ ছিল। মথুরা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ হইয়া পঞ্চম দিনে বাহিনী পঞ্চনদে প্রবেশ করিবে। অম্বালা হইয়া স্থানীশ্বরে, কুরুক্ষেত্র হইয়া জলন্ধর। জলন্ধর শিবিরে রাত্রবাসের পর বর্ত্তমান লাহোরের দক্ষিণাংশে তরণতারণ অভিমুখে যাত্রা। তখনকার দিনে পঞ্চনদ প্রদেশে উহা এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল ; সেখান হইতে মদ্রদেশে প্রবেশ। মদ্ররাজের আতিথ্য মাত্র একদিন ও একরাত্র। অতঃপর বিপাশা প্রদেশে, বিয়াস নদী অতিক্রম করিয়া মৌর্য্য রাজবাহিনী কেকয় রাজ্যে প্রবেশ করিবে। তারপর তৃতীয় দিনে তক্ষশীলা প্রান্তে পদার্পণ, চতুর্থ দিনে মহানগরে পদার্পণ। মহানগরে প্রবেশের নির্দ্ধারিত কাল—উহা পুরোহিত স্থির করিবেন এবং সেই ক্ষণেই যুবরাজ তক্ষশীলায় পদার্পণ করিবেন। এইরূপই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশীলা মহানগরে উপস্থিতি প্রায় অষ্টত্রিংশ দিনের

প্রত্যেক শিবির হইতে পাটলীপুত্রে সংবাদ বহনের সুচারু ব্যবস্থা ছিল ; কাজেই, মহারাজ মহামাত্য প্রভৃতি রাজপুরীর সবাই প্রতিদিনের সংবাদ পাইতে পারিবেন। সুতরাং কোন ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

প্রভাতে, সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পরে যাত্রারম্ভ। কুসুমপুরবাসিগণ তাই আজ যেন গঙ্গাতীরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মহারাজ, মহামাত্য তরণীর নিকটে সৈকতে আসিয়া বিন্দুসারের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। বিন্দুর মুখে আত্মপ্রসাদের লাবণ্য, বিক্রম, অদ্রী, বিদ্রা এবং প্রবীর বর্ম্মা, ভাস্কর, গন্ধর্ব্ব সবাই চারিদিকে তাহাকে বেষ্টন করিযাই দাঁড়াইয়া ছিল। প্রথমে মহারাজ বিন্দুকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ তারপর মহামাত্য সস্নেহে আলিঙ্গন এবং মস্তকাঘ্রান করিলেন। অদ্রী প্রণাম কবিলে বিদ্রা আশীর্ব্বাদ করিল। তারপর যথাকালে গুরুজন সবাই আদেশ দিলে বিন্দুসার এবং সহচর প্রভৃতি নৌকায় আরোহণ কবিল। এবার শঙ্খধ্বনিতে যেন বায়ুমণ্ডল আলোড়িত হইতে লাগিল। যথাক্ষণে নৌকা খুলিল, —ধীরে ধীরে নৌকা যাইতেছে,—অদ্রী দেখিল, পুষ্পদত্তা সৈকতে দাঁড়াইয়া, হাতে তাহার শঙ্খ।